সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	মুক্তির পথে আহ্বান	১
দ্বিতীয়	স্বাধীনতা ও আমি	১০
তৃতীয়	আমার স্বাধীনতা ও সমাজ	২৫
চতুর্থ	স্বাধীনতায় বেড়ে ওঠা	৩৭
পঞ্চম	স্বাধীনতা ও বাধ্যতা	৪৬
ষষ্ঠ	বিশ্বস্ত বন্ধু	৫৫
সপ্তম	পুরুষ ও নারী	৬৫
অষ্টম	স্বাধীনতা ও জীবনাহ্বান	৭৩
নবম	পিতার সম্মুখে	৮৩
দশম	অসুস্থ বিশ্বের নিরাময়	৯২
একাদশ	বিবেকের নীরব কণ্ঠস্বর	১০০
দ্বাদশ	হৃদয়ের তীব্র যন্ত্রণা	১১১
ত্রয়োদশ	সহিংসতা ও শান্তি	১১৯
চর্তুদশ	পরিবর্তিত বিশ্ব চাই	১২৭
পঞ্চদশ	আমাদের মুক্তির পথ	১৩৫

প্রথম অধ্যায়
মুক্তির পথে আহ্বান

ঈশ্বরের অসীম ভলোবাসার প্রকাশ হলো মানুষ। মানুষকে তিনি শ্রেষ্ঠ করেই সৃষ্টি করেছেন। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান হলো স্বাধীনতা। মানুষ কিন্তু তার স্বাধীনতার অপব্যবহার করে ঈশ্বরের অবাধ্য হলো ও পাপ করল। সে পাপের দাস হয়ে উঠল। পাপের কারণে সে পরাধীন হয়ে পড়ল। তারপরও ঈশ্বরের কাছ থেকে মানুষ যে প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস লাভ করেছিল তা হলো মুক্তি বা পরিত্রাণ। ঈশ্বর চেয়েছেন মানুষ তাঁর একমাত্র পুত্র যীশুকে মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করে ও তার নিজের স্বাধীনতা ব্যবহার করে মুক্তিলাভ করুক। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই মুক্তিলাভের একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা রয়েছে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- মুক্তির সাধারণ ধারণা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব;
- মুক্ত মানুষ হওয়ার উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারব;
- মুক্তি সম্পর্কে খ্রীষ্টের শিক্ষাসমূহ বিশ্লেষণ করে নিজেকে মূল্যায়ন ও নিজের কর্তব্য বর্ণনা করতে পারব;
- আদর্শ খ্রীষ্টভক্তের মুক্ত জীবনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব এবং
- মুক্ত-স্বাধীন জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ হবো।

মুক্তির সাধারণ ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

মুক্ত থাকা বা স্বাধীন থাকা মানুষের সহজাত প্রবণতা। সবাই স্বাধীন থাকতে ভালোবাসে। ইতিহাসে আমরা দেখেছি, একসময় আমাদের দেশ পরাধীন ছিল, আমরা দীর্ঘদিন ব্রিটিশ ও পরে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অধীন ছিলাম। কিন্তু আমাদের দেশের মুক্তিকামী মানুষ দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ৩০ লক্ষ শহিদের বিনিময়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছে। আমাদের স্বাধীনতা দিবস হলো ২৬শে মার্চ। এই দিনটিকে আমরা জাতীয় দিবস হিসেবে পালন করি। পবিত্র বাইবেল থেকে আমরা জেনেছি যে, ইস্রায়েল জাতি মিশরে বন্দি ছিল। মোশীর মাধ্যমে ঈশ্বর তাদের উদ্ধার করেছেন। মোশীর নেতৃত্বে ইস্রায়েল জাতি প্রতিশ্রুত কানান দেশে গিয়েছে। এই ধারণা থেকে আমরা খানিকটা বুঝতে পারি যে স্বাধীনতার অর্থ হলো পরের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে নিজের অধীন থাকা। কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ কেবলমাত্র ভৌগোলিকভাবে অন্যের অধীনতা থেকে মুক্ত থাকাই যথেষ্ট নয়। স্বাধীনতার অর্থ আরও গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে ব্যক্তির বাহ্যিক, আধ্যাত্মিক, জাগতিক ও পারলৌকিক সব ধরনের মুক্তির কথাই বলা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাসের জীবনে স্বাধীনতা বা মুক্তি বলতে আমরা বুঝি সত্যের সাধনায় সফল হওয়া, পাপকে জয় করে ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবাসার শক্তি অর্জন করা।

আমাদের খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের জীবনে আমরা প্রথম থেকেই জেনে এসেছি যে, আদি পিতামাতা আদম ও হবার পাপের ফলে আমরা পাপের অধীন হয়েছিলাম। তখন থেকেই আমরা মুক্তিলাভের অভয়বাণী শুনেছি। ঈশ্বর আমাদের অভয় দিয়েছিলেন একজন মুক্তিদাতাকে পাঠিয়ে তিনি আমাদের পাপমুক্ত করবেন। যীশু এই পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্ম নিলেন। আমাদের পাপের জন্য অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করে

ক্রুশীয় মৃত্যুকে বরণ করলেন ও তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হয়ে আমাদের মুক্ত করলেন। তিনি আমাদের বলেছেন, "তাহলেই তো সত্যকে তোমরা জানতে পারবে আর সত্য তখন তোমাদের স্বাধীন করে দেবে" (যোহন: ৮:৩২)।

অনেক সময় আমরা মনে করতে পারি বা করেও থাকি যে স্বাধীনতা বা মুক্তির অর্থ হচ্ছে, আমার যা-খুশি তাই করতে পারা, কিংবা যেকোন ধরনের স্বেচ্ছাচারী আচরণ করতে পারা। প্রকৃত স্বাধীনতা কিন্তু কখনো তা নয়। বাংলা ভাষায় স্বাধীনতা শব্দটির মধ্যেই কিন্তু এর অর্থ নিহিত আছে। স্বাধীনতা মানে হলো স্ব-অধীনতা বা নিজের অধীনতা। নিজের অধীনতা বলতে আমরা বুঝি নিজেকে দমন করার ক্ষমতা। অর্থাৎ যা-কিছু মন্দ বা খারাপ এবং যা-কিছু অন্যের জন্য কোনোরকম কল্যাণ বয়ে আনে না, তা কখনো স্বাধীনতা হতে পারে না। নিচে স্বাধীনতার বিষয়ে আরও গভীরভাবে আলোচনা করা হলো:

১. কোনো কিছু থেকে স্বাধীনতা: যা কিছু একজন ব্যক্তিকে বাধ্য করে তা থেকে স্বাধীনতা বা মুক্তি। প্রথমে দেখা যাক কোনো কিছু থেকে স্বাধীনতার অর্থ কী। মানুষকে অনেক কিছুই তার অগ্রযাত্রার পথে বাধাগ্রস্ত করে। এর মধ্যে থাকে তার অভ্যন্তরীণ বাধা এবং বাহ্যিক বাধা। অভ্যন্তরীণ দুইটি বাধা হলো (ক) তার অজ্ঞতা এবং (খ) বিশৃঙ্খল আবেগানুভূতি। বাহ্যিক বাধাগুলো হলো (ক) দৈহিক এবং (খ) সামাজিক বাধা।

অভ্যন্তরীণ বাধাগুলো

ক. অজ্ঞতা: যেকোনো বিষয়ে যথাযথ বুদ্ধিগত জ্ঞান না থাকাটাই হলো অজ্ঞতা। কোনো কোনো জ্ঞান আছে যেগুলো আমাদের না থাকলেও চলে আবার কোনো কোনো জ্ঞান আছে, যেগুলো না থাকলে আমাদের সমস্যায় পড়তে হয়।

খ. বিশৃঙ্খল আবেগানুভূতি: যেমন ভয়-ভীতি, খারাপ অভ্যাস, রাগ, অহংকার, হিংসা ইত্যাদি।

অভ্যন্তরীণ বাধাগুলো থেকে মুক্তিলাভ দরকার হয় সবার আগে। তা না হলে অন্যান্য স্বাধীনতা উপভোগ করা যায় না।

বাহ্যিক বাধাগুলো

আগেই আমরা দেখেছি যে বাহ্যিক বাধাগুলো হচ্ছে (ক) দৈহিক এবং (খ) সামাজিক বাধা।

(ক) দৈহিক বাধা হলো দৈহিক নানা রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি বা খুঁত। দৈহিক বাধা মানুষ কখনো কখনো বংশগতভাবে লাভ করে অর্থাৎ শারীরিক প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, মানসিক প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মগ্রহণ করে। আবার কখনো কখনো জন্মের পরে, অসুস্থতার কারণে বা দুর্ঘটনায় এসব ঘটে থাকে।

(খ) সামাজিক বাধাগুলো হলো দারিদ্র্য, সামাজিক নিয়মকানুন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ইত্যাদি।

২. ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার জন্য স্বাধীনতা: ব্যক্তি হিসেবে পূর্ণভাবে বিকশিত হওয়া অর্থাৎ ঈশ্বরের দেওয়া সম্ভাবনাগুলোকে বাড়িয়ে তোলা এবং ঈশ্বরের সন্তান হওয়া।

৩. ঐশসন্তানের স্বাধীনতা: দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়েছি। পাপের দাসত্ব ত্যাগ করে আমরা স্বাধীন মানুষ হয়েছি।

মুক্তি/স্বাধীনতার বৈশিষ্ট্য

ক. স্বাধীনতা সব সময় কোনো কিছুর সাথে সম্পর্কযুক্ত। স্বাধীনতার অর্থ যা-খুশি তা-ই করা যায় না। এমন আচরণ করতে হবে যা দিয়ে অন্যের ক্ষতি সাধিত না হয়।

খ. স্বাধীনতা একজন পূর্ণ ব্যক্তি হওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে আমরা সৃষ্ট। সেই কথা মনে রেখে ঈশ্বর যেরকম ব্যক্তি হতে আমাদের আহ্বান করছেন, সেরকম ব্যক্তি হওয়া।

গ. স্বাধীনতা খাঁটি ব্যক্তি হওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত। ঈশ্বর যেরকম খাঁটি ও পবিত্র, সেরকম হওয়া।

ঘ. স্বাধীনতা আমাদের মুক্তির পথে পরিচালিত করে।

ঙ. স্বাধীনতা একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া অনুসারে আমাদের কাজ করে যেতে হবে।

চ. স্বাধীনতার লক্ষ্য সব সময় মূল্যবোধের দিকে। কল্যাণসাধন করা হলো স্বাধীনতার লক্ষ্য।

ছ. স্বাধীনতার পথে কোনো বাধা থাকতে পারে না, সব বাধা অতিক্রম করে সে এগিয়ে চলে।

জ. স্বাধীনতা পবিত্র আত্মার দান। আমরা শুধু নিজের শক্তিতে বা ইচ্ছায় স্বাধীন হয়ে উঠতে পারি না। এটি পবিত্র আত্মার কাজ ও দান। তিনিই আমাদের স্বাধীন করে তোলেন।

ঝ. স্বাধীনতা সর্বজনীন। স্বাধীনতা কোনো শ্রেণি বা গোষ্ঠীর ক্ষুদ্র গণ্ডির উর্ধ্বে। তাকে কেউ নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখতে পারে না। স্বাধীনতা ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির মৌলিক অধিকার। সমস্ত স্বার্থ ও সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে মুক্তি বা স্বাধীনতা।

একক কাজ: মুক্ত মানুষের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো।

মুক্ত মানুষ হওয়ার উপায়

সৃষ্টির শুরুতে ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীন করেই সৃষ্টি করেছিলেন। তাকে তিনি দিয়েছিলেন স্বাধীন ইচ্ছা। কিন্তু মানুষ তার স্বাধীনতার অপব্যবহার করে ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছে ও পাপ করেছে। সে হয়ে গেছে পরাধীন কারণ সে হয়েছে পাপের অধীন। কিন্তু তারপরও সে স্বাধীন হয়ে ওঠার জন্য সর্বদা চেষ্টা করছে। মানুষ কী করে স্বাধীন হতে পারে সে বিষয়ে আমরা এখন আলোচনা করব।

১. আত্মজ্ঞান : আত্মজ্ঞান বলতে আমরা বুঝি নিজের সম্পর্কে জানা। প্রত্যেক মানুষ এককে জন একক বা অনন্য ব্যক্তি। পৃথিবীতে কেউ কারো মতো নয়। শুধুমাত্র চেহারা বা বাহ্যিক দিকেই এই ভিন্নতা নয় বরং তার আচার-ব্যবহার বা ব্যক্তিত্বে সবকিছুর মধ্যেই এই ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়াও আমরা প্রত্যেকেই দোষগুণ মিলিয়েই মানুষ। আমরা যখন নিজেদের এসব বিষয় ভালোভাবে জানতে ও বুঝতে পারি তখন আমরা অনেকটা মুক্ত মানুষ হই। দোষগুলোকে কমানোর ও গুণগুলোকে বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করতে করতে আমরা যা আছি তা-ই হয়ে উঠি। এভাবে আমরা যা আছি তাই হয়ে উঠতে পারলে ক্রমান্বয়ে স্বাধীন মানুষ হয়ে উঠি।

গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস বলেছিলেন, 'নিজেকে জানো'। নিজেকে জানতে পারলে আমাদের মুখোশ খুলে যায়, এতে আমাদের আসল রূপ প্রকাশ পায়। আমরা তখন নিজের সম্বন্ধে একটা সত্যকে গ্রহণ করি। এভাবে মানুষ হিসেবে আমরা স্বাধীন হয়ে উঠি। যীশু বলেছেন, সত্যই তোমাকে স্বাধীন করে তুলবে।

২. ভয়মুক্ত বা নির্ভয় হওয়া: স্বাধীনতার প্রধান বাধা হলো ভয়। ভয়ের কারণে মানুষ মিথ্যা বলে বা নিজের আসল আমি কে প্রকাশ করতে পারে না। এতে সে স্বাধীন হতে পারে না– মিথ্যার কাছে পরাধীন হয়ে থাকে। মিথ্যা ও পাপ থেকে মানুষের ভয় জন্মে। আমরা দেখেছি এদেন বাগানে আদম ও হবা পাপ করার পর ঈশ্বরকে দেখে ভয় পেয়েছেন, কারণ তাঁরা শয়তানের অধীনস্থ হয়ে নিজের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। কাজেই স্বাধীন হবার জন্য আমাদের হতে হবে নির্ভীক ও পবিত্র। কারণ পাপের পথে বিচরণ করে মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। পবিত্র বাইবেলে আমরা অনেক জায়গায় দেখতে পাই ঈশ্বর বলেছেন: "ভয় কোরো না"। ভয় থেকে পুরোপুরি মুক্ত করার জন্য ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পাঠালেন। পুত্র ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে, পবিত্র আত্মার সহায়তায় আমরা ভয়মুক্ত হলাম।

৩. ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখা: ঈশ্বর নিজেই আমাদের স্বাধীনতা দান করেছেন। এটি পবিত্র আত্মার একটি অনুগ্রহ দান। অনেক সময় আমরা চেষ্টা করেও স্বাধীন হতে পারি না। কিন্তু ঈশ্বর নিজেই তা আমাদের দান করেন। তাই তাঁর উপর আমাদের আস্থা রাখতে হয়। আমাদের জীবনে ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকলে আমরা অনেক স্বাধীন হয়ে উঠি। পবিত্র আত্মা আমাদের স্বাধীন করে তোলেন।

৪. মানুষ ও সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ: ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলো মানুষ। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের জন্য করেছেন বিচিত্র সৃষ্টি। চারিদিকে তাকালে আমরা এই অপূর্ব সৃষ্টি দেখতে পাই। মানুষ ও বিশ্ব সৃষ্টিকে ভালোবেসে আমরা ধীরে ধীরে স্বাধীন হতে থাকি। কারণ মানুষকে ভালোবাসলে আমরা কখনো কারো অকল্যাণ কামনা করতে পারি না। সৃষ্টিকে ভালোবাসলে আমরা সৃষ্টির সুন্দর দিকটি উপলব্ধি করতে পারি। মানুষ ও সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমরা যখন সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের সাধনা করি, আমরা তখন নিজের অজান্তেই স্বাধীন বা মুক্ত হই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন: 'যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে মুক্ত কর হে বন্ধ।' সবার সাথে যুক্ত হয়েই আমরা মুক্ত হয়ে উঠি।

৫. দায়িত্বশীলতা ও পরিপক্বতা: দায়িত্বশীল ও পরিপক্ব আচরণ মানুষকে স্বাধীন করে তোলে। আমরা আমাদের প্রত্যেকটি আচরণের জন্য দায়বদ্ধ। আমাদের প্রতিটি হ্যাঁ বা না হলো দায়িত্বশীল হ্যাঁ বা না। সঠিক সিদ্ধান্ত ও আচরণের মধ্য দিয়ে আমরা মুক্ত মানুষ হয়ে উঠি। দায়িত্বশীল ও পরিপক্ব মানুষ নিজের ভুলত্রুটিগুলোও সহজেই স্বীকার ও গ্রহণ করতে পারে বা এগুলোকে জীবনের অংশ বলে মনে করতে পারে। ভুল করতে পারাটাও স্বাধীনতার অংশ। কারণ ভুল করে এবং ভুল সংশোধন করে মানুষ শুদ্ধি লাভের সুযোগ পায়। এভাবে সে দিনে দিনে স্বাধীন হয়ে ওঠে।

৬. আত্মবিশ্বাস: আত্মবিশ্বাস থেকে স্বাধীনতা জন্ম নেয়। আত্মবিশ্বাসী মানুষ জানে কোন পথে সে অগ্রসর হচ্ছে। তার কৃতকর্ম সম্পর্কেও সে সর্বদা সচেতন থাকে। তার আত্মচেতনা তাকে সঠিক পথে পরিচালনা করে। তার মধ্যে সত্যবোধও জাগ্রত থাকে। এই সত্যই তাকে মুক্ত করে।

২০২৫

৭. ভালো-মন্দের বিচারবোধ: ভালোমন্দ বিচারবোধকে ঘিরে তৈরি হয় মানুষের বিবেক। সঠিক বিবেকবোধ দ্বারা পরিচালিত মানুষ হলো পবিত্র মানুষ। পবিত্র আত্মা গড়ে তোলে প্রকৃত বিবেক। পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত মানুষই সত্যিকারভাবে স্বাধীন বা মুক্ত মানুষ।

> কাজ: ১. স্বাধীন বা মুক্ত মানুষ হয়ে ওঠার জন্য তোমার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাগুলো খুঁজে বের কর ও দলে সহভাগিতা করো।
>
> কাজ: ২. দলীয় : 'ঈশ্বর মানুষের মুক্ত স্বাধীন জীবন চান' উক্তিটির পক্ষে যুক্তি দিয়ে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করো।

খ্রীষ্ট ও মুক্তি

পাপে পরিপূর্ণ জগৎ ও মানুষের জীবন দেখে মানুষের জন্য ঈশ্বর চিন্তিত হলেন। এদেন বাগানে মানুষ ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে পাপ করার পর তিনি মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি একজন মুক্তিদাতাকে পাঠিয়ে মানুষকে মুক্ত করবেন। তিনি মানুষকে দিতে চাইলেন পরিপুর্ণ মুক্ত ও আনন্দময় জীবন। তাই তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে এই পৃথিবীতে পাঠালেন। তিনি হলেন আমাদের মুক্তিদাতা বা পরিত্রাতা। মানবজাতির ইতিহাসে যীশু হলেন মুক্তির প্রতীক। মানুষ হিসেবে তিনি তেত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন। তাঁর জীবনকালে তাঁর বিভিন্ন কথা, কাজ ও ঘটনার মধ্যে আমরা তাঁর স্বাধীন ও মুক্ত জীবনের পরিচয় পাই।

- **যীশুর কথা ও কাজ:** যীশু যা-কিছু করেছেন ও বলেছেন তার মধ্যে ছিল অধিকার ও স্বাধীনতা। তিনি রোগীদের রোগ নিরাময় করেছেন, অপদূত দূর করেছেন, ফরিসি ও বিধান পণ্ডিতদের তিরস্কার করেছেন। যে নিয়ম দ্বারা মানুষের কোনো কল্যাণ সাধিত হয় না তিনি নির্দ্বিধায় সেই নিয়মকে উপেক্ষা করেছেন। বিশ্রামবারের প্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘন করে তিনি রোগীদের সুস্থ করেছেন।
- **যীশুর বিচার ও মৃত্যুদণ্ড:** সত্যের পক্ষে সাক্ষী দিতে যীশু এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। ভণ্ড ধর্মীয় নেতা ও রাষ্ট্রনেতাদের সামনে তিনি কখনো ভয় পাননি। বরং তাদের ভণ্ডামিগুলো তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। এই কারণে তারা তাঁকে ঈশ্বরনিন্দুক বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁকে বিচারে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। মৃত্যুদণ্ড ছিল তাঁর জন্য অবধারিত শাস্তি। সত্যের জন্য তিনি মৃত্যুকেও মেনে নিয়েছেন। সত্য তাঁকে স্বাধীন করে তুলল। স্বাধীনভাবেই তিনি মেনে নিলেন প্রহসনের মতো বিচার ও মৃত্যুদণ্ড।
- **প্রাণ বিসর্জন:** যীশুর স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো ক্রুশমৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া। মৃত্যুই তাঁকে মহিমান্বিত করে তুলল। তিনি নিজেই বলেছেন, বন্ধুর জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার মতো বড় ভালোবাসা আর নেই।
- **পুনরুত্থান:** যীশু স্বাধীনভাবে পিতার ইচ্ছাকে গ্রহণ করে যন্ত্রণাময় মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিলেন বলে পিতা তাঁকে পুনরুত্থিত করলেন। মৃত্যুকে জয় করে তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হয়ে যীশু তাঁর স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ দিলেন। মৃত্যুকে জয় করার মধ্য দিয়ে তিনি সমস্ত সীমা অতিক্রম করলেন।

- **সর্বজনীন হয়ে ওঠা:** যীশু এই পৃথিবীতে এসেছিলেন সব মানুষের জন্য। ধর্ম, বর্ণ, ধনী, গরিব, পাপী, সাধু, নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, ইহুদি ও বিজাতি নির্বিশেষে সবাইকে তিনি ভালোবেসেছেন। তিনি নিজে ইহুদি হয়েও সবার সাথে অবাধে মেলামেশা করেছেন। নিজের প্রচলিত প্রথা ও গণ্ডি অতিক্রম করেছেন। এটা তাঁর স্বাধীন জীবনেরই বহিঃপ্রকাশ।

- **ভালোবাসা ও সেবার নিয়ম প্রচলন:** মানুষের মুক্তির জন্য যীশুর সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো পরস্পরকে ভালোবাসা ও সেবা করা। শেষ ভোজের সময় শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়ে তিনি এই শিক্ষা আমাদের সবার জন্য রেখে গেছেন। ভালোবেসে ও সেবা করে তিনি নিজেও স্বাধীনতা প্রকাশ করেছেন এবং আমাদের স্বাধীনতার পথনির্দেশ দিয়েছেন।

- **ঈশ্বরের প্রথম স্বাধীন সন্তান হলেন যীশু:** যীশুর সবচেয়ে বড় স্বাধীনতা হলো ঈশ্বর হয়েও মানুষ হওয়া। যীশু হলেন ঈশ্বরের একমাত্র স্বাধীন সন্তান, যিনি পিতার ভালোবাসা নিজ জীবনে বুঝেছিলেন এবং সবাইকে ঐশ সন্তান হয়ে ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকতে শিখিয়েছেন। এই স্বাধীনতা যীশু ছাড়া আর কারো নেই।

যুগ যুগ ধরে মানব ইতিহাসে যীশুর পরিচয় হলো মুক্তিদাতা যীশু। যীশুকে গ্রহণ করে আমরা মুক্ত মানুষ হয়ে উঠি। যীশু হলেন আমাদের জীবনাদর্শ ও গুরু।

কাজ: যীশুর শিক্ষার কোন বিষয়গুলো তোমাকে মুক্ত মানুষ হতে অনুপ্রাণিত করে, তা দলে সহভাগিতা করো।

খ্রীষ্টভক্ত ও মুক্তি

খ্রীষ্টীয় জীবনের প্রথম আহ্বান হলো মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভ করা। তাই আমরা খ্রীষ্টভক্তের জীবনে মুক্তির অর্থ গভীরভাবে বুঝতে চাই। খ্রীষ্টভক্তের কাছে মুক্তির প্রথম অর্থ হলো যীশু খ্রীষ্টকে মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করা, বিশ্বাস করা, তাঁর শিক্ষা অনুসারে জীবনযাপন করা। ব্যক্তিগত জীবনে যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার করা। খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করে আমরা হয়ে উঠি খ্রীষ্টভক্ত এবং খ্রীষ্টের নির্দেশিত পথে চলে আমরা লাভ করি মুক্তি। খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করে আমরা সব ধরনের মুক্তি লাভ করি। তিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন যেন আমরা জীবন পাই এবং তা পরিপূর্ণভাবেই পাই। তাঁর প্রচার জীবনের শুরুতে আমরা তাঁর কণ্ঠে শুনতে পাই:

> "প্রভুর আত্মিক প্রেরণা আমার ওপর নিত্য অধিষ্ঠিত
>
> কারণ প্রভু আমাকে অভিষিক্ত করেছেন।
>
> তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীন দরিদ্রের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার করতে,
>
> বন্দীর কাছে মুক্তি আর অন্ধের কাছে নবদৃষ্টি লাভের কথা ঘোষণা করতে,
>
> পদদলিত মানুষকে মুক্ত করে দিতে
>
> এবং প্রভুর অনুগ্রহের বর্ষকাল ঘোষণা করতে" (লুক ৪:১৮-১৯)।

এই বাণী থেকেই আমরা যীশুর মুক্তিকাজের এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাই, তিনি কীভাবে মানুষকে সব ধরনের দুর্দশা থেকে মুক্ত করতে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। নিচে খ্রীষ্টভক্তদের জীবনের সার্বিক মুক্তি সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

১. শারীরিক মুক্তি বা নিরাময়তাঃ যীশু এই পৃথিবীতে এসেছিলেন মানুষকে জীবন দিতে, শারীরিক রোগ-যন্ত্রণা বা দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত করতে। তিনি পিতার ভালোবাসা সবার কাছে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তিনি তাঁর মুখের কথায় মানুষকে নানারকম রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি পঙ্গুকে হাঁটার ক্ষমতা, দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণ ও বাক্প্রতিবন্ধীকে বাক্ ও শ্রবণশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তিনি মানুষকে নানা রোগ থেকে নিরাময় করে শারীরিক মুক্তি দিয়েছেন। সমাজে উপেক্ষিত ও অবহেলিত কুষ্ঠরোগীকে তিনি নিরাময় করে সুস্থ ও সুন্দর জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন। তারা লাভ করেছে মুক্তি। নিরাময়তা ও মুক্তিলাভের পর তারা হয়ে উঠেছে খ্রিষ্টবিশ্বাসী।

২. আবেগিক মুক্তিঃ মানুষ নানারকম আত্মদ্বন্দ্ব, ভয়, হিংসা, অহংকার, স্বার্থপরতার বেড়াজালে আটকে গিয়েছিল। মানুষের মনের দ্বন্দ্ব নিরসন করে, তার মনের ভয়ভীতি, হিংসা, অহংকার, লোভলালসা ও স্বার্থপরতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে তিনি মানুষকে স্বাধীন ও আনন্দময় জীবন দান করতে চেয়েছেন। মানুষের মন থেকে পাপকালিমা মুছে দিতে চেয়েছেন। যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তারা সেই স্বাধীন ও আনন্দময় জীবন লাভ করে।

৩. মানসিক মুক্তি : খ্রীষ্ট নিজেই মুক্ত চিন্তার মানুষ ছিলেন। তিনি স্বাধীনভাবে তাঁর চিন্তা, ধারণা, মতামত প্রকাশ করেছেন। আমরা বলতে পারি এর জন্য ইহুদিরা তাঁকে হত্যা করেছিল। কারণ তিনি যা সত্য বলে জানতেন ও বিশ্বাস করতেন তাই প্রকাশ্যে বলতেন। গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসও তাঁর স্বাধীন চিন্তার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। তারপরও তিনি সত্যভ্রষ্ট হননি। যীশু চান আমরাও যেন মুক্তচিন্তার মানুষ হয়ে উঠি। চিন্তা-চেতনার মধ্যে সেই মুক্ত মানুষের রূপ প্রতিফলিত করি। আমাদের দেশেও ভাষা রক্ষার ক্ষেত্রে অনেক বুদ্ধিজীবী মুক্তবুদ্ধির চর্চার কারণে প্রাণ দিয়েছিলেন।

৪. আধ্যাত্মিক মুক্তিঃ মানুষের অন্তর বা আত্মা হলো মুক্তির ভিত্তি। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভ করলে মানুষ লাভ করে প্রশান্তি। খ্রীষ্ট নিজেই আমাদের এই প্রশান্তি ও মুক্তির জন্য আহ্বান করেন। তিনি বলেন, "ওহে পরিশ্রান্ত, ওহে ভারাক্রান্ত, আমার কাছে এসো, আমি তোমাকে দিব প্রাণের আরাম।"

৫. সামাজিক মুক্তিঃ একজন খ্রীষ্টভক্ত সামাজিক মুক্তি কামনা করে। যীশু এসেছিলেন পদদলিত মানুষকে উন্নীত করতে, সামজিকভাবে যারা উপেক্ষিত, নিগৃহীত তাদের উপরে তুলে ধরতে অর্থাৎ মর্যাদার স্থানে উন্নীত করতে। তিনি এসেছিলেন সমাজের বঞ্চিত, শোষিত, অত্যাচারিত, নির্যাতিতদের পক্ষ নিতে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এবং সামাজিক ন্যায্যতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। একজন খ্রীষ্টভক্ত সামাজিক ন্যায্যতার মাধ্যমে মুক্তি ও স্বাধীনতা লাভ করে।

৬. অর্থনৈতিক মুক্তিঃ যীশু এই পৃথিবীতে এসেছিলেন দীন দরিদ্রদের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার করতে। দরিদ্র ও ক্ষমতাহীনদের পক্ষ নিয়ে তিনি কাজ করেছেন। ক্ষমতা ও অর্থলোভী মানুষদের তিনি ধিক্কার দিয়ে কথা বলেছেন। ধনী লোক ও গরিব লাজারের গল্প বলে মানুষের জীবনের মুক্তির প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছেন। বর্তমানেও খ্রিষ্টভক্তরা অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করে, দারিদ্র্য বিমোচন করে, সমাজের দরিদ্র মানুষের মুক্তি আনয়ন ও স্বাধীন জীবন কামনা করে।

সার্বিক মুক্তিলাভের মধ্য দিয়ে একজন খ্রীষ্টভক্ত ঈশ্বরকে লাভ করার বিষয়টিকে পরম প্রাপ্তি বলে স্বীকার করে। সে লাভ করতে চায় অনন্ত জীবন এবং ঐশরাজ্য। ধনী যুবক যীশুকে প্রশ্ন করেছিল: "সদগুরু, অনন্ত জীবন পেতে হলে আমাকে কী করতে হবে?" যীশু তাকে উত্তর দিয়েছিলেন, তোমার যা কিছু আছে তা বিক্রি করে গরিবদের কাছে বিলিয়ে দাও আর আমাকে অনুসরণ কর। ঐশরাজ্যকে তিনি মূল্যবান মুক্তার সাথে তুলনা করেছেন। এটির সন্ধান পাবার পর এক ধনীলোক তার সব বিক্রি করে সেই জমিটা কিনে নিলেন যেখানে সেই মূল্যবান মুক্তাটা ছিল। খ্রীষ্টীয় স্বাধীনতা হলো ঈশ্বরকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে জাগতিকভাবে নিরাসক্ত জীবনযাপন করা। সত্য তাকে স্বাধীন করে তোলে। একজন খ্রীষ্টভক্ত যখন এই পর্যায়ের স্বাধীনতা অর্জন করে তখন সে তার নিজের জীবনের সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে অন্যের সেবা করে। মুক্ত মানুষ অন্যের জন্য জীবন বিলিয়ে দিয়ে আনন্দ লাভ করে। তখনই তাঁর জীবন পূর্ণ হয়ে ওঠে।

একক কাজ: একজন খ্রীষ্টভক্ত হিসেবে কোন কোন দিকে তুমি মুক্ত হতে চাও? এই মুক্ত জীবন কীভাবে সম্ভব তা ব্যক্তিগতভাবে লেখ ও দলে সহভাগিতা করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অভ্যন্তরীণ বাধা কয়টি?

ক. দুইটি খ. তিনটি

গ. চারটি ঘ. পাঁচটি

২. যীশু পৃথিবীতে এসেছিলেন কেন?

ক. যেন আমরা খাদ্য পাই খ. যেন জীবন পাই

গ. নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য ঘ. সেবা দেওয়ার জন্য

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

একদিন গির্জায় প্রার্থনা চলাকালীন দুষ্কৃতিকারীরা এসে প্রত্যেককে বলে যীশুকে অস্বীকার করতে। অনেকেই প্রাণের ভয়ে অস্বীকার করলেও ছোট্ট প্রবাল চিৎকার করে বলল, 'আমি যীশুকে ভালোবাসি।'

৩. প্রবালের মধ্যে খ্রিষ্ট ভক্তের মুক্ত জীবনের কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে?

ক. শারীরিক মুক্তি খ. আবেগিক মুক্তি

গ. মানসিক মুক্তি ঘ. আধ্যাত্মিক মুক্তি

৪. প্রবালের মতো বিশ্বাস প্রকাশের ফলে সকলেই মানুষের কাছে হয়ে উঠতে পারে–

i. মুক্ত মানুষ ii. স্মরণীয় মানুষ

iii. ক্ষমতাবান মানুষ

২০২৫

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. i ও ii
গ. iii
ঘ. i ও iii

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মুক্তি বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা দাও।
২. মুক্তি বা স্বাধীনতার ৪টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।
৩. মুক্ত মানুষ হওয়ার উপায়সমূহ সংক্ষেপে লেখ।
৪. খ্রীষ্টভক্তদের জীবনের সার্বিক মুক্তির দুইটি দিক সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. হৃদয় প্রতিষ্ঠিত একজন যুবক। নিজের গ্রামের উন্নয়নের জন্য নৈশ বিদ্যালয়, রাস্তা সংস্কার, সেবা কেন্দ্র ইত্যাদি কল্যাণমূলক কাজ করেছেন। গ্রামের ধর্ম, বর্ণ, ধনী, গরিব, পাপী, সাধু, নারী-পুরুষ প্রত্যেকের সঙ্গেই তিনি সদ্ভাব বজায় রেখেছেন। তাই সকলেই তাকে খুব পছন্দ করে।

ক. ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কী?
খ. স্বাধীনতা বা মুক্তি বলতে কী বোঝায়?
গ. মুক্তি সম্পর্কে যীশুর কোন শিক্ষাটি হৃদয়ের মধ্যে ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. স্বাধীন বা মুক্ত হওয়ার জন্য হৃদয়ের কাজের এই একটি দিক কি যথেষ্ট? তোমার মতামত দাও।

২. ওসান একজন ধনী যুবক। সে একদিন রাস্তায় বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাচ্ছিল। হঠাৎ সুমন নামে একজন রিকশাচালক তার গাড়ির সামনে পড়ল এবং সুমনের রিকশাটি উল্টে পড়ে গেল। ওসান গাড়ি থেকে নেমে এসে চোখ রাঙিয়ে সুমনকে বলল, 'তোর দুই টাকার রিকশা আমার লক্ষ টাকার গাড়িতে ধাক্কা লাগিয়েছিস? তোর ক্ষমা নেই, এই বলে সুমনের গালে আঘাত করল। ওসানের বান্ধবী জুলি বলল, 'তুমি ওকে মারলে কেন? তোমারই তো দোষ। তুমি তোমার ভুল স্বীকার কর। নত ও সরল হও এবং যীশুকে বিশ্বাস কর।'

ক. বাহ্যিক বাধা কয়টি?
খ. ভালো মন্দের বিচারবোধ বলতে কী বোঝায়?
গ. জুলি ওসানকে কোন ধরনের মুক্তির পরামর্শ দিয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. 'জুলির পরামর্শ ওসানকে সার্বিকভাবে মুক্তি দিতে পারে'– উক্তিটি মূল্যায়ন করো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা ও আমি

বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টিই একক ও অনন্য সৌন্দর্যে মহিমান্বিত। প্রতিটি সৃষ্টিই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ সৌন্দর্য বিলিয়ে দিতে দিতে নিজেরা ধন্য হচ্ছে এবং বিশ্বের সেবা করে চলছে। মানুষ সকল সৃষ্টির মধ্যে আরো বেশি একক ও অনন্য। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা কোটি কোটি। কিন্তু একজন মানুষ অন্য আর একজন মানুষের মতো নয়, সম্পূর্ণ আলাদা। এটি মানুষের অনন্য বৈশিষ্ট্য যা তাকে দান করে আলাদা গৌরব ও মর্যাদা। একক ও অনন্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে মানুষ যদি বৃদ্ধিলাভ করতে পারে তবেই সে হয়ে ওঠে স্বাধীন। মানুষ তার অনন্য বৈশিষ্ট্য ও স্বাধীনতার কারণে নিজেকে আবিষ্কার করতে চায় বা নিজেকে সে আরো গভীরভাবে জানতে চায়। নিজেকে জানার মধ্য দিয়ে সে নিজের শক্তির সীমাবদ্ধতা, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আরো বেশি সচেতন হয়। এতে সে তার নিজের জীবন অর্থপূর্ণভাবে যাপন করতে পারে এবং অন্যের সাথেও তার সুসম্পর্ক বজায় থাকে। এভাবেই মানুষ পরিপূর্ণ আত্মদান করে তার মানবজীবন সার্থক করে তোলে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- নিজেকে জানার উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারব;
- প্রতিটি ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের কারণ উপমার সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারব;
- অন্যদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- আমাদের জন্য খ্রিষ্টের আত্মদানের অর্থ বিশ্লেষণ করতে পারব এবং
- সমাজ সেবায় উদ্বুদ্ধ হবো।

নিজেকে জানা

আত্মজ্ঞান বা নিজেকে জানা হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান। আমরা আগেই জ্ঞানী দার্শনিক সক্রেটিসের বিষয়ে জেনেছি, তিনি বলেছেন, 'নিজেকে জানো।' যীশু বলেছেন, "সারা জগৎকে পেয়ে কেউ যদি তার ফলে নিজেরই সর্বনাশ ঘটিয়ে ফেলে, তাতে তার কীই-বা লাভ হতে পারে? মানুষ তখন কোনো মূল্যেই বা নিজেকে আবার ফিরে পেতে পারে?" (মথি ১৬:২৬)। নিজেকে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর সব জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান মানুষেরা আত্মজ্ঞান সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। অর্থাৎ জ্ঞানীরা নিজের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। আমরা পূর্বেই জেনেছি যে, প্রত্যেক মানুষ একজন থেকে আর একজন আলাদা বা ভিন্ন, একক ও অনন্য। প্রত্যেক মানুষের রয়েছে তার নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রকাশভঙ্গি, ধরন ও মূল্যবোধ। সে তার নিজস্ব ধারায় আচরণ করে, কিংবা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করে। তার রয়েছে একান্ত নিজস্ব গুণ, প্রতিভা, দক্ষতা, ক্ষমতা ও শক্তি এবং সীমাবদ্ধতা। বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন অবস্থায় আমরা কীরূপ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করি সে বিষয়ে ধারণা থাকা নিজেকে জানার একটি অংশ। নিজেকে জানার বিষয়টি একটি প্রক্রিয়া। এটি আজীবনের জন্য একটি চলমান প্রক্রিয়া।

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই জানার সমাপ্তি ঘটে। নিজেকে জানার বেশ কিছু উপায় রয়েছে। এখানে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

নিজেকে জানার উপায়

১. আত্মসচেতনতা : নিজেকে জানার প্রথম ধাপটি হলো নিজের সম্পর্কে সচেতন হওয়া। নিজের আচার-আচরণ, কথাবার্তা, শক্তি ও সীমাবদ্ধতা, দোষ-গুণ ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন হলে নিজের সম্পর্কে একটি ধারণা জন্মে। তাছাড়াও বিভিন্ন অবস্থা, পরিবেশে নিজের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন থাকলেও নিজের সম্পর্কে জানা যায়।

২. প্রার্থনা এবং ধ্যান: মনোবিজ্ঞানী যোসেফ এবং হ্যারী নিজেকে জানার বিষয়ে চার ভাগে বিভক্ত একটি জানালার কথা বলেছেন। আবিষ্কারক হিসেবে তাদের নামানুসারে এটিকে বলা হয় যো-হ্যারী উইনডো। এই জানালায় চারটি ভাগ রয়েছে।

১. আমার সম্পর্কিত কিছু কিছু বিষয় আমি জানি। যা অন্য কেউ জানে না। তবে ঈশ্বর জানেন।	২. আমার সম্পর্কিত কিছু কিছু বিষয় অন্যেরা জানে যা আমি জানি না। তবে ঈশ্বর জানেন।
৩. আমার কিছু কিছু বিষয় যা আমি জানি, অন্যেরা সবাই জানে। ঈশ্বরও জানেন।	৪. আমার কিছু কিছু বিষয় আমি বা অন্যেরা কেউ জানে না। এ বিষয় শুধু ঈশ্বর জানেন।

এখান থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, নিজেকে জানার জন্য ঈশ্বরের সহায়তা ও ধ্যান প্রার্থনা বিশেষভাবে সহায়তা করে। ঈশ্বর আমাকে সবচেয়ে ভালোভাবে জানেন। এ বিষয়ে সাম ১৩৯: ১এর মধ্যে দেখতে পাই:

তুমি তো আমায় জানো, ওগো ঈশ্বর;

তলিয়ে দেখেছ তুমি আমার অন্তর।

৩. গঠনমূলক সমালোচনা : নিজেকে জানার জন্য অন্যদের গঠনমূলক সমালোচনা খুবই সহায়ক। কারণ এর মাধ্যমে আমরা নিজের ভালো-মন্দ দিকগুলো আরও সুস্পষ্টভাবে দেখতে পারি। অনেক সময় কারো সমালোচনা বা দোষ দেখিয়ে দেওয়াটা গ্রহণ করতে আমাদের খুব কষ্ট হয়। কিন্তু এর মধ্য দিয়েও আমরা নিজের সম্পর্কে অনেকটা জানতে পারি। সমালোচক বা নিন্দুক অনেক সময় সত্য কথাটি আমাদের সামনে তুলে ধরে। নিরপেক্ষভাবে ও আত্মগঠনের মনোভাব নিয়ে তা গ্রহণ করলে আমরা অনেক উপকৃত হতে পারি।

৪. মূল্যায়ন : যেকোনো কাজ করার পর বা যেকোনো কথা শোনা বা বলা বা কোন বিশেষ বিষয়ে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করার পর যখন আমরা আত্মমূল্যায়ন করতে পারি বা অন্যকে মুল্যায়নের সুযোগ দিই, তখন

আমরা সে বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করি। এতে করে নিজের সম্পর্কে আমরা আরো ভালো করে জানতে পারি। লোকেরা যখন ব্যভিচারে লিপ্ত মারীয়া মাগ্দালিনীকে যীশুর কাছে ধরে এনেছিল তখন তারা তাকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করেছিল। তখন যীশু উপস্থিত জনতাকে বলেছিলেন তোমাদের মধ্যে যার কোনো পাপ নেই, সেই আগে পাথর ছুড়ুক। তখন সেখান থেকে একে একে সবাই সরে পড়েছিল। যীশু তখন তাদের আত্মমূল্যায়নের সুযোগ দিয়েছিলেন।

৫. বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষা: বর্তমানে বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষা বা অনুশীলনীর মাধ্যমেও আমরা নিজের সম্পর্কে অনেক ধারণা পেতে পারি। এ ধরনের পরীক্ষায় বিভিন্নরকম প্রশ্নের উত্তর দানের মাধ্যমে মানুষের স্বভাব ও ব্যক্তিত্বের নানা দিক যাচাই করা হয়।

৬. বিভিন্ন ঘটনা: বাস্তব জীবনের নানা ঘটনা আত্মজ্ঞানের সহায়ক। বিভিন্ন ঘটনার আলোকে আমরা নিজেদের অবস্থান পর্যালোচনা করতে পারি। যেমন কোনো চ্যালেঞ্জিং বা ঝুঁকিপূর্ণ ঘটনায় আমরা কিরূপ আচরণ করি তা থেকে নিজের সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। শুধুমাত্র ঘটনা নয়, জীবনের নানারকম চাপের সময় আমি কীভাবে তা নিয়ন্ত্রণ করি তা থেকেও আমার আত্মজ্ঞান হয়।

এ প্রসঙ্গে একটা ছোট গল্প আমাদের সাহায্য করতে পারে। একজন মায়ের তিনজন ছেলেমেয়ে ছিল। সেই মা তার সন্তানদের নানা বিষয়ে সাহায্য করতেন। জীবনের নানা চাপে পড়ে তারা খুব অভিযোগ করছিল। তাই একদিন ঐ মা তার সন্তানদেরকে রান্নাঘরে নিয়ে গেলেন। তিনটি চুলার উপরে তিনটি পাত্রে পানি ফুটছিল। মা ফুটন্ত পানির একটি পাত্রে একটি ডিম, একটিতে গাজর এবং শেষটিতে কিছু কফি দিলেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল ডিমটি শক্ত হয়ে গেছে, গাজরটি নরম হয়ে গেছে এবং কফি পানির সাথে মিশে সুগন্ধি ছড়াচ্ছে ও অপূর্ব এক পানীয়তে পরিণত হয়েছে। মা তখন তার সন্তানদের বুঝিয়ে বললেন: একই পরিমাণ তাপে তিনিটি জিনিস তিন রকম হয়ে গেল। তাই আমাদেরও দেখতে হয় জীবনের চাপে আমাদের অবস্থা কী হয়। তবে ডিমের মতো শক্ত বা গাজরের মতো নরম হয়ে গেলে চলবে না। কফির মতো ঘটনার মোকাবেলা করতে হবে এবং ঘটনার সাথে একাত্ম হয়ে চলতে শিখতে হবে।

৭. শিক্ষা: শিক্ষা মানুষের আচরণকে বদলে দেয়। শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের আত্মজ্ঞান অনেক বেড়ে যায়। তাই নিজেকে জানার জন্য শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। প্রকৃত শিক্ষা জীবনের দর্পণস্বরূপ। শিক্ষার মাধ্যমে আমরা সচেতন হই। সচেতনতা নিজেকে জানার প্রথম ধাপ। তবে শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা নয়; বরং জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা আত্মজ্ঞানের সহায়ক।

৮. গঠন প্রশিক্ষণ: শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক ও পাঠ্যক্রমের শিক্ষাই নয়; নিজেকে জানার প্রয়োজনে বিশেষ ধরনের গঠন প্রশিক্ষণও গ্রহণ করতে হয়। আজকাল এ ধরনের গঠন প্রশিক্ষণের নানা সুযোগ-সুবিধা, সেমিনার এবং কর্মশালারও ব্যবস্থা রয়েছে। তাই উপযুক্ত গঠন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমরা সহজেই নিজেকে আরো গভীরভাবে জানতে ও চিনতে পারি। আমরা নিজেকে যত গভীর ও ভালোভাবে চিনব আমরা তত পরিপক্ক মানুষ হতে পারব।

৯. জীবন পর্যালোচনা: জীবন পর্যালোচনা বলতে আমরা বুঝি মূল্যবোধের আলোকে নিজ জীবন ব্যাখ্যা করা। জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনার ভালোমন্দ বুঝতে শেখা। ভালোমন্দের পর্যালোচনা করে পরবর্তী দিনগুলোর জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

১০. ডায়েরি বা জার্নাল লেখা : অনেকের একটি ভালো অভ্যাস রয়েছে দিনশেষে বা সময় বুঝে নিজ জীবনের কথা লিখে রাখা। এটি একটি সহায়ক পন্থা, যার মধ্য দিয়ে বিগত দিনের লেখা পড়ে অতীত ও বর্তমানের আমিকে আমরা দেখতে পারি। এভাবেও আমরা নিজেদেরকে জানতে পারি।

১১. নিজের দোষ গুণের তালিকা করা: নিজের ও অন্যদের সহায়তায় নিজের দোষ-গুণের একটি তালিকা করতে পারলে নিজের সম্পর্কে বেশ ভালো একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

কাজ: একটি কাগজের একদিকে তোমার পাঁচটি বিশেষ গুণ বা প্রতিভা লেখ এবং অন্যদিকে তিনটি দুর্বল দিক লেখ। এবার তা তোমার পাশের বন্ধুর সাথে সহভাগিতা করো। তোমার সম্পর্কে তার মন্তব্য শোনো।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলতে আমরা বুঝি, ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির ভিন্নতা। সাধারণভাবে পৃথিবীর সব মানুষ একই রকম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে গঠিত হলেও প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্ব আলাদা বা ভিন্ন। মানুষের এই ভিন্নতা তার চেহারা, আকৃতি, আচার-আচরণ, ব্যবহার, চিন্তাধারা, ধ্যান-ধারণা, গুণ, প্রতিভা, বুদ্ধিশক্তি, প্রকাশভঙ্গি, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদির মধ্যে প্রকাশ পায়। একজন মানুষ থেকে আরেকজন মানুষের এই মৌলিক পার্থক্যগুলোকেই আমরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলে থাকি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কারণেই মানুষ হয়ে ওঠে একক ও অনন্য। মানুষ তার এই অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণেই হয়ে উঠেছে শ্রেষ্ঠ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য না থাকলে পৃথিবীর সব মানুষ কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের মতো হয়ে উঠত। আমরা ঈশ্বরের একক ও অনন্য সৃষ্টি; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমেই তা প্রমাণিত হয়। বিষয়টি সম্পর্কে আমরা আরো বিস্তারিতভাবে জানব।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্য

শারীরিক গঠন ও আকৃতিগত পার্থক্য: পৃথিবীর একটি বিস্ময়কর বিষয় হলো মানুষের মধ্যে কেউ কারো মতো নয়। একই মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া এমনকি জমজ ভাইবোন হলেও একজন অন্য আরেকজনের মতো নয়। দেখতে প্রায় একইরকম হলেও কিংবা উচ্চতার মিল থাকলেও কোনো না কোনো দিকে কিছুটা ভিন্নতা থাকে। মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রথম বৈশিষ্ট্যই হলো শারীরিক গঠন ও আকৃতিগত দিক থেকে।

আত্মপরিচয়: প্রত্যেক মানুষের রয়েছে তার নিজস্ব আত্মপরিচয়। তার নিজের নাম, ঠিকানা, পেশা, পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন ও বংশ পরিচয়। এগুলোর মধ্য দিয়েও তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিক প্রকাশিত হয়। অনেক সময় একই প্রতিষ্ঠানে দুইজন শিক্ষার্থীর একই নাম হলেও তাদের রোল নম্বর দিয়ে তাদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়। তবে যে করেই হোক আত্মপরিচয়ের মাধ্যমে মানুষ কোনো না কোনোভাবে তার আলাদা অস্তিত্ব প্রকাশ করে থাকে।

২০২৫

ভিন্ন ব্যক্তিত্ব: ব্যক্তিত্বের দিক থেকেও মানুষে মানুষে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। মনোবিজ্ঞানীগণ মানুষের কতগুলো মৌলিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের শ্রেণিবিভাগ করলেও সত্যিকারে পৃথিবীতে যত মানুষ আছে, তত রকম ব্যক্তিত্বও আছে। তার নিজস্ব পরিবেশ, পটভূমি ও জীবন অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করেই তার ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়। স্বভাবগুণে মানুষের কিছুটা মিল থাকলেও মূলত একজন মানুষ আরেকজন মানুষ থেকে আলাদা।

নিজস্ব গুণাবলি: প্রত্যেক মানুষ আলাদা আলাদা মানবিক গুণ, বুদ্ধি, প্রতিভা ও দক্ষতার অধিকারী। কতগুলো সাধারণ প্রতিভা অনেকের মধ্যে থাকলেও প্রত্যেক মানুষের মানবিক গুণ আলাদা। যেমন: একটা শ্রেণিকক্ষে পাঁচজন মেয়ে গান করতে পারে, দশজন ছেলে ভালো ক্রিকেট খেলতে পারে, কিন্তু তাদের মানবিক গুণগুলো আলাদা। দেখা যাবে পাঁচজন মেয়ের মধ্যে একজন দয়ালু, অন্যজন উদার কিংবা একজন ছেলে সৎ অন্যজন খুব সহানুভূতিশীল। অর্থাৎ কোনো না কোনো দিকে ভিন্নতা অবশ্যই থাকছে। মানুষ তার নিজের গুণাবলির জন্য অনন্য হয়ে উঠেছে।

ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ ও রুচিবোধ: মানুষে মানুষে পছন্দ, অপছন্দ ও রুচিবোধের মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে। এর কারণেও মানুষ আলাদা। নানা বিষয়ে এই ভিন্নতা লক্ষণীয়। যেমন: পোশাক-পরিচ্ছদ, খাবার-দাবার, জীবনসঙ্গী বা বন্ধু নির্বাচন, পরিবেশ, রং ইত্যাদি। বিষয় নির্বাচনেও মানুষের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

মূল্যবোধের পার্থক্য: মূল্যবোধের পার্থক্যের কারণে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্যে অনেক বড় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক মানুষের রয়েছে নিজস্ব মূল্যবোধ বা বিশ্বাসের ধারা, যে অনুসারে সে আচরণ করে। এর ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তার স্বাধীন ব্যক্তিত্ব। যীশুখ্রীষ্ট, মহাত্মা গান্ধী, মাদার তেরেসা, আর্চবিশপ গঙ্গুলী, এককথায় পৃথিবীর সব মহামানবেরা নিজ নিজ পৃথক মূল্যবোধের কারণেই হয়ে উঠেছেন একক ও অনন্য।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা: মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে প্রত্যেক মানুষ তার সত্তা নিয়ে এক স্বাধীন মানুষ হয়ে ওঠে। মায়ের কাছ থেকে আলাদা হয়ে সে হয় একক। তখন থেকেই তার মধ্যে গড়ে ওঠে আলাদা ভাব। ঈশ্বর প্রতিটি মানুষকে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপহার স্বাধীনতা দিয়েই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এই স্বাধীনতাই মানুষকে অনন্য করে তোলে। স্বাধীনতা ব্যবহার করেই মানুষ নিজ নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ভালোমন্দ কাজ করে থাকে।

একান্ত নিজস্ব অবদান : পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষ একটি বিশেষ অবদান রাখার জন্য জন্মগ্রহণ করেছে। এটি প্রত্যেক মানুষের একক অবদান। এক ব্যক্তির অবদান অন্য কোন ব্যক্তিই রাখতে পারে না। নিজের অবদান মানুষ শুধু নিজেই রাখতে পারে–হোক সে ছোট কিংবা বড়–আমার অবদান আমারই। ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা তাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবদান রেখে অনেক

বড় সাধ্বী হয়েছেন। আবার মাদার তেরেসা জগৎ-জোড়া সেবা করে বিখ্যাত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সৃষ্টিশীল কর্মের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। আমরাও কিন্তু এই বিশেষ অবদান রাখতে আহুত এবং এর মধ্য দিয়েই আমরা হয়ে উঠব অনন্য। সাধারণ থেকে আমরা হয়ে উঠব অসাধারণ।

পেশা নির্বাচন: জীবন ও জীবিকা নির্বাচনের জন্য আমাদের প্রত্যেককে কোনো না কোনো পেশা বেছে নিতে হয়। পেশা নির্বাচন ও পেশাগত জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে আমরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ প্রকাশ করে থাকি। শ্রমিক, কৃষক, গাড়িচালক, ডাক্তার, নার্স, চিত্রশিল্পী, অভিনেতা, নেতা, পরিচালক, শিক্ষক সবাই তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে আলাদা ব্যক্তিত্বের মানুষ হয়ে ওঠে।

ধর্মীয় বিশ্বাস: ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণেও আমরা একক ও অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী হই। প্রত্যেক ধর্মেই কোনো না কোনো মহামানব আছেন, যাঁরা তাঁদের আপন বিশ্বাসের জন্য তাঁদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমরা প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী মানুষ এই সকল মহামানবদের অনুসরণ করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করে থাকি। তবে একথা আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কারণেই মানবজীবনের এতো সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য। মানুষে মানুষে যদি এই ভিন্নতা না থাকত অর্থাৎ আমরা যদি সবাই একরকম হতে যেতাম, তাহলে পৃথিবীটা কেমন হতো! ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের কারণেই আমরা পরস্পরের কাছে এতটা আকর্ষণীয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ফলাফল

ব্যক্তিত্বের ভিন্নতা যেমন মানব জীবনকে দিয়েছে বৈচিত্র্য তেমনি এটি আমাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জও বটে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ইতিবাচক ও নেতিবাচক–দুই ধরনের ফলাফলও রয়েছে।

ইতিবাচক ফলাফল	নেতিবাচক ফলাফল
• ভিন্নতার কারণে পৃথিবীতে বৈচিত্র্য এসেছে। মানুষের ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্যের দিকটিও প্রকাশিত হয় এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমে। • বৈচিত্র্য ও ভিন্নতার কারণে চাহিদার পরিপূরণ হয়েছে। পেশাগত ও কর্মজীবনে বৈচিত্র্য আছে বলেই আমরা একে অপরের কাছ থেকে সব ধরনের সেবা পাচ্ছি। • আমরা যে পরস্পরের পরিপূরক সে উপলব্ধি হয়েছে। যেমন, আমি একা সব পারি না বা আমার সবকিছু করার ক্ষমতাও নেই। এই বৈচিত্র্যের মাধ্যমেই আমরা সমাজে পরস্পরের কাছে প্রয়োজনীয় ও পরিপূরক হয়ে উঠি। • ভিন্নতায় ঐক্য আসে এবং আমরা সমৃদ্ধ হই। তাতে সমন্বয় সাধনের সুযোগ থাকে।	• অনেক সময় মানুষের ভিন্নতা গ্রহণ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। • বৈচিত্র্য ও ভিন্নতার কারণে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ সৃষ্টি হয়। • ভিন্নতার কারণে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে। • ভিন্নতা স্বীকার না করে নিজের চিন্তার আলোকে অন্যকে বিচার করে অনেক বেশি আশা বা প্রত্যাশা করি। এতে হতাশা বাড়ে। অনেক সময় আমাদের আশা ভঙ্গ হতে পারে। • সচেতনতা নিয়ে ভিন্নতাগুলোকে সমন্বয় করতে না পারলে বিচ্ছিন্নতা আসতে পারে। • ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে ঠিকভাবে শনাক্ত করতে না পারলে আমরা ব্যক্তিকে অবমূল্যায়নও করতে পারি।

মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সৌন্দর্যকে সবচেয়ে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা যায় রঙধনুর মাধ্যমে। রঙধনুর সাতটি রঙের মধ্যে কোনো মিল নেই। কিন্তু রঙধনু তৈরি করতে গেলে অবশ্যই সাতটি রঙই প্রয়োজন। একটি রং দিয়ে কখনো রঙধনু হবে না। আমাদের সমাজ প্রগতিশীল ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে যখন সেই সমাজে নানা ধরনের মানুষ থাকবে। বর্তমান বিশ্বে যে মানুষের এই মৌলিক পার্থক্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে শুধু তা-ই নয় বরং জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম ও বর্ণ বৈচিত্র্যকেও প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। পৃথিবী এখন গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে, বৈচিত্র্যের মাঝেই রয়েছে ঐক্য। তাই মানুষের এই স্বাতন্ত্র্যকে আমরা শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করব। স্বাতন্ত্র্যের দিকটিকে সীমাবদ্ধতা বা দুর্বলতা হিসেবে দেখব না বরং শক্তি হিসেবেই দেখব। তাহলেই জগৎজুড়ে আমরা হয়ে উঠব বর্ণে, গন্ধে ও বিচিত্র ফুলের সমারোহে অপরূপ সুন্দর এক ফুলের বাগান।

কাজ : কোন কোন বিষয়ে তুমি নিজেকে অন্যদের থেকে আলাদা মনে করো। কেন? দলে সহভাগিতা করো।

সমাজের মানুষের সাথে সম্পর্ক

একক ও অনন্য হলেও আমরা কিন্তু একাকী বাস করি না—বাস করি পরিবারে ও সমাজে। অনেক মানুষের সাথে মিলে মিশেই আমরা বাস করি। মানুষের সাথে আমাদের ভাবের—আদান প্রদান হয়, আমরা সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করি এবং পরস্পরের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলি। সমাজের মানুষদের সাথে মিলেমিশে আনন্দ উৎসব করি। বিপদে—আপদে আমরা একে অন্যের পাশে দাঁড়াই। সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের এই তাগিদ ও প্রবণতা লক্ষণীয়। তবে সমাজের মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রথম ধারণাই এসেছে ঈশ্বরের কাছ থেকে। আমাদের বিশ্বাসের জীবনে আমরা দেখি পবিত্র ত্রিত্বের উপস্থিতি। এক ঈশ্বরের মধ্যে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা—এই তিন ব্যক্তির সমাজ রয়েছে। এই তিন ব্যক্তি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ত্রিব্যক্তির এই আদর্শ অনুসরণ করেই আমরা সমাজে মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলি। খ্রীষ্টমণ্ডলীও হলো ভক্তজনের সমাজ। মানুষের এই সমাজবদ্ধতায় খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের একটি বিশেষ দিক প্রকাশ পায়।

মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনীয়তা

ক. সমাজের মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখা একটি মৌলিক প্রয়োজন। কারণ আমরা কোনোভাবেই একাকী বাস করতে পারি না। আমাদের জীবন পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। আমি একা কখনো পূর্ণ নই। আমার পূর্ণতার জন্য সমাজের মানুষের দরকার। আবার আমিও সমাজের অন্যদের জীবন পূর্ণ করি।

খ. আমাদের জীবন আবর্তিত হয় সমাজকে কেন্দ্র করে। আমরা আমাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-উৎসব সমাজের মানুষের সাথে সহভাগিতা করি। আমাদের যেকোনো দুঃখ-শোক ও বিপদ-আপদে সমাজের মানুষই আমাদের পাশে দাঁড়ায়।

গ. সমাজেকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সামাজিক প্রতিষ্ঠান। যেমন: হাসপাতাল, ব্যাংক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাজার ইত্যাদি। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা সেবা পেয়ে থাকি। সমাজের মানুষের সুসম্পর্কের কারণেই এসব প্রতিষ্ঠান কার্যকরী হয়। আমরা সুন্দরভাবে সমাজে বাস করতে পারি। আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে পারি।

ঘ. আমাদের ব্যক্তিগত জীবন, গুণ, প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় সমাজকে ঘিরে। আমরা আমাদের গুণ, যোগ্যতা, দক্ষতা, শিক্ষা অর্জিত সবকিছু দিয়েই সমাজের সকল স্তরের মানুষের সেবা করি এবং সেবা গ্রহণ করি। তাই সামাজিক সম্পর্ক অপরিহার্য।

ঙ. সুসম্পর্ক বজায় রেখে বাস করার মধ্য দিয়ে আমাদের ব্যক্তিত্বের পরিপক্বতা প্রকাশ পায়। সত্যিকার অর্থে আমাদের অর্জিত শিক্ষাদীক্ষা ও দক্ষতার সার্থকতা প্রকাশ পায় সমাজের মানুষের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা ও সমঝোতাপূর্ণ জীবনযাপন করার মধ্যে।

চ. খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের জীবনে সমাজ তথা খ্রীষ্টমণ্ডলী খ্রীষ্টের উপস্থিতির প্রতীক। খ্রীষ্ট নিজেই সেই সমাজের মস্তক বা প্রধান। তাই এই সমাজের সাথে আমাদের যুক্ত থাকতেই হবে। সমাজের সাথে সম্পর্কিত থাকা মানে আমরা খ্রিষ্টেরই সাথে যুক্ত আছি। তাতে আমরা জীবন্ত থাকি ও ফলশালী হই।

সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার কারণ

আমরা সবাই সম্পর্ক গড়তে চাই ও রক্ষা করতে চাই। কিন্তু অনেক সময় নানা কারণে আমাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়। কী কারণে আমাদের সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে আমরা সে বিষয়গুলো দেখব:

ক. ভুল বোঝাবুঝি;

খ. সামাজিক চাপ ও অন্যায়;

গ. দলাদলি ও কোন্দল;

ঘ. মুল্যবোধের অবক্ষয়;

ঙ. ক্ষমতার অপব্যবহার;

চ. শোষণ ও নির্যাতন;

ছ. মানুষে মানুষে, নারী পুরুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি;

জ. ব্যক্তিস্বার্থের জন্য সমাজকে ব্যবহার করা;

ঝ. সহনশীলতা ও ক্ষমার মনোভাব না থাকা;

ঞ. সহযোগিতা ও সহভাগিতার মনোভাব না থাকা।

সম্পর্ক রক্ষার উপায়

ক. সমাজকে খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রতিচ্ছবি মনে করা এবং সেখানে খ্রীষ্টের উপস্থিতি উপলব্ধি করা।

খ. খ্রীষ্ট নিজেই আমাদের পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত করেন তা মনে রেখে মন খোলা রাখা। ঈশ্বরকে আমাদের জীবনে কাজ করতে দেওয়া।

গ. সমাজের মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে তাদের গ্রহণ করা। নারী পুরুষ, ধনী গরিব সবার প্রতি সমান মনোভাব পোষণ করা।

ঘ. সমাজের মানুষকে সব পরিস্থিতিতে সহযোগিতা করা ও তাদের প্রতি সহমর্মিতার মনোভাব প্রকাশ করা।

ঙ. সমাজকে বা সমাজের প্রতিষ্ঠানকে নিজের স্বার্থের উপায় বলে মনে না করে বরং সমাজের স্বার্থকে বড় করে দেখা।

চ. সম্পর্ক রক্ষার জন্য পরস্পরের প্রতি সহনশীল থাকা।

ছ. প্রয়োজনে ত্যাগস্বীকার করার মনোভাব থাকা।

জ. কোন কারণে সম্পর্ক নষ্ট হলে ক্ষমা ও পুনর্মিলনের মাধ্যমে তা পুনঃস্থাপন করা।

ঝ. সম্পর্কের জন্য ন্যায্যতা একান্ত দরকার। সামাজিক সাম্য ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে সম্পর্ক রক্ষা করা।

ঞ. সম্পর্ক রক্ষার সবচেয়ে বড় বিষয় হলো নিজের ও অন্যের স্বাধীনতা স্বীকার করা।

ট. সম্পর্ককে জীবনের একটি মূল্যবোধ বলে মনে করা। মূল্যবোধের কারণে সম্পর্ককে লালন করা।

মোটকথা আমাদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা উভয়ই সমাজে। সমাজবিহীন জীবন আমাদের জন্য অকল্পনীয়। যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বর হয়েও এই পৃথিবীতে যখন মানুষ হিসেবে জন্ম নিলেন তখন তিনি সমাজেই তাঁর জীবন কাটিয়েছেন। ইহুদি সমাজে তিনি জন্ম-মৃত্যু ও কর্মময় জীবনযাপন করেছেন। সমাজের রীতিনীতি মেনে চলেই সেখানে পরিবর্তন এনেছেন ও সেবাকাজ করেছেন। সামাজিক সুসম্পর্ক স্থাপনে তিনি আমাদের গুরু। তিনি সব ধরনের মানুষের সাথে মেলামেশা করেছেন ও সবাইকে নিজ নিজ যোগ্য শ্রদ্ধা ও সম্মান দিয়েছেন। তাঁর জীবনে বারোজন শিষ্য বেছে নিয়ে তিনি সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা আমাদের বুঝিয়েছেন। শত্রুকে ক্ষমা করার মাধ্যমে সুসম্পর্ক রক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন।

কাজঃ মানুষের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করার জন্য তুমি কী করো? সুসম্পর্ক রক্ষার জন্য কী দক্ষতা থাকা দরকার বলে তুমি মনে করো? ছোট দলে সহভাগিতা করো।

সেবাকাজে আত্মনিবেদন

আমাদের জন্ম ও জীবন পরার্থে, নিজের জন্য নয়। বাংলার কবি বলেছেন : "পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না, পরের জন্য তোমার হৃদয় কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।" বিশ্বপ্রকৃতি এবং প্রতিটি সৃষ্টির দিকে তাকালে আমরা খুব সহজেই এই সত্য উপলব্ধি করতে পারি। ফুল তার আপন সৌন্দর্য ও গন্ধ বিলিয়ে সবাইকে আনন্দ দেয়। পশুপাখি, ফলফলাদি, ফসলও খাদ্যরূপে নিজেকে বিলিয়ে দেয় অন্যের জন্য। বায়ু সেবন করে আমরা বেঁচে থাকি।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে জানতে গিয়ে আমরা আমাদের গুণ, শক্তি ও সীমাবদ্ধতার কথা জেনেছি। আমাদের সব গুণাবলি, শক্তি, প্রতিভা সবই হলো ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ ও মানুষের সেবার জন্য। আমাদের প্রতিটি গুণ সেবা কাজে ব্যবহার করার জন্য। সেবাকাজের মাধ্যমে আমরা নিজেকে দান করি। প্রদীপ ও ধূপ যেমন নিজে পুড়ে আলো ও গন্ধ বিলায় তেমনি পরার্থে আত্মনিবেদন করে আমরাও আমাদের জীবন

সার্থক করি। সেবা কাজে আত্মনিবেদন করা আমাদের প্রত্যেকের একটি বিশেষ জীবন-আহ্বান। এটি আমাদের একটি স্বাধীন সিদ্ধান্তও বটে। শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়ে যীশু সেবার মহান দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রেখেছেন। তিনি যেমন আমাদের ভালোবেসেছেন, তেমনি পরস্পরকে ভালোবাসতে আমাদের আদেশও দিয়েছেন।

কীভাবে আমরা সেবাকাজে আত্মনিয়োগ করতে পারি

আমাদের একটিমাত্র জীবন। এই জীবন আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে উপহার হিসেবে পেয়েছি। ঈশ্বর চান তাঁর কাছ থেকে বিনামূল্যে যে দান আমরা লাভ করেছি,আমরাও যেন তা বিনামূল্যে অন্য মানুষের জন্য বিলিয়ে দেই। আমাদের জীবনটা যেন হয়ে ওঠে ভালোবাসা ও সেবাকাজে নিবেদিত। নিজেকে দান করার জন্য আমাদের নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্মরণ রাখতে হবে:

১. সরল ও নম্রচিত্তে সর্বদা মনে রাখা যে, আমার জীবন প্রভুর দান; আমি স্বাধীনভাবে তা অন্যের জন্য উদারভাবে বিলিয়ে দেব।

২. নিজের গুণ, প্রতিভা ও শক্তির দিকগুলো স্বীকার করে সেগুলো ব্যবহার করে কী করা যায় তা খুঁজে বের করা।

৩. আমি যেখানে যে অবস্থায় থাকি না কেন সেখানেই সেবার সুযোগ করে নেওয়া।

৪. নিজের জীবন আহ্বান নির্ণয় করা এবং সর্বান্তকরণে তাতে সাড়া দেওয়া।

৫. নিজের জীবনকে ঘিরে ঈশ্বরের ইচ্ছা বোঝা। আমাকে ঘিরে ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা আছে, তা বুঝে জীবনকে সেইভাবে নিবেদন করা।

৬. সবসময় নিজের স্বার্থ বা অর্থনৈতিক লাভ না খুঁজে কাজ করা।

৭. নিজের জীবনে সেবার দিকটি উজ্জ্বল রাখা।

৮. সেবা করা আমার মানবিক, সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় তথা খ্রিষ্টীয় দায়িত্ব। সেবা করতে আমি দায়বদ্ধ। মানুষকে সেবা করার মধ্য দিয়ে আমি ঈশ্বরকে সেবা করে থাকি।

সেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

পৃথিবীর ইতিহাস থেকে আমরা খুব সহজেই অনেক মানুষের নাম স্মরণ করতে পারি যাঁরা নিজের সবটুকু বিলিয়ে দিয়ে মানুষের সেবা করছেন। এইরকম কয়েকজন মানুষ হলেন: যীশুখ্রীষ্ট, মাদার তেরেজা, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল, মহাত্মাগান্ধী, নেলসন ম্যান্ডেলা। বিভিন্ন দিকে তাঁরা মানুষের কল্যাণে তাঁদের জীবন নিবেদন করেছেন।

সেবাকাজের ক্ষেত্র

পরিবার: পরিবারে আমাদের জীবন শুরু হয়। আমাদের প্রথম সেবাকেন্দ্র হলো পরিবার। তাই পরিবারে আত্মনিবেদনের অনুশীলন করতে হয়। পিতামাতা, ভাইবোন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সেবা করার মধ্য দিয়ে আমরা সেবাকাজে অনুপ্রাণিত হই। পরিবার থেকেই আমরা সেবা করতে শিখি।

সমাজঃ পরিবার হলো সমাজের অংশ। প্রতিবেশী ও সমাজের সেবা করতে করতে আমরা আত্মনিবেদন করতে শিখি। পরিবারের কাছ থেকে পাওয়া অনুপ্রেরণা আমরা সমাজে প্রয়োগ করে থাকি।

সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানঃ ধীরে ধীরে আমরা আমাদের আশপাশে যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেখানে আমরা সেবা দিতে পারি। যেমন, কোন কল্যাণমূলক সংগঠন, সংঘ, সমিতি ইত্যাদি।

হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ঃ ডাক্তার, নার্স বা স্বাস্থ্যকর্মী হয়ে আমরা মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারি। অনেক সময় হাসপাতাল বা বাড়িতে অসুস্থ ব্যক্তি বা রোগী অথবা বয়স্কদের দেখতে যেতে পারি, তাদের সাথে সময় কাটাতে পারি বা তাদের সান্ত্বনা দিতে পারি; আমরা নিরাশাগ্রস্ত মানুষদের আশার বাণী শোনাতে পারি।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : শিক্ষাদান বা জ্ঞানদান একটি উত্তম সেবাকাজ। কারণ শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের অজ্ঞতা ঘুচে যায়। মানুষ পরিশীলিত হয়। শিক্ষাদান করে আমরা সমাজে এক বিশেষ ধরনের সেবা করতে পারি।

সেলাই ও হস্তশিল্প কেন্দ্রঃ দারিদ্র্য বিমোচন ও মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য সেলাই ও হস্তশিল্প শিক্ষা দিয়েও আমরা মানুষের সেবা করে যেতে পারি। বৃহত্তর পর্যায়ে বড় শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেও সমাজের মানুষের সেবা করা যায়।

নিজস্ব কর্মক্ষেত্রঃ আমাদের নিজস্ব কর্মক্ষেত্র রয়েছে। বিশ্বস্তভাবে কাজ করে আমরা যে ধরনের কাজই করি না কেন, তার মাধ্যমে আমরা উত্তম সেবা করতে পারি। হতে পারি আমি একজন অফিস কর্মচারী, ব্যাংকার, গৃহিণী, কৃষক, শ্রমিক কিংবা শিক্ষার্থী। আমার অবস্থানে থেকেই আমি শ্রেষ্ঠ সেবা দিতে পারি।

মণ্ডলীঃ আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ সেবা করতে পারি মণ্ডলীর কাজে অবদান রেখে। আমরা দেখতে পাই মণ্ডলীর সেবায় অনেকেই তাদের জীবন নিবেদন করেছেন। তাঁরা যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে মণ্ডলীর সেবায় আত্মনিবেদন করেছেন। ঈশ্বরকে ভালোবেসে মঙ্গলবাণী প্রচার ও আর্তমানবতার সেবায় এসব নিবেদিত প্রাণ মানুষ সেবা দান করে যাচ্ছেন। তাঁদের সেবায় মণ্ডলী প্রাণবন্ত।

বর্তমানে মানুষ অনেক বেশি স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে। নিজের বিষয় বা লাভ ক্ষতির প্রশ্ন তার কাছে প্রধান বিষয়। যে কারণে মানুষ শুধু নিজের কথা ভাবে ও নিজের জন্যই বাঁচতে চায়। অন্যের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কিছু করার মনোভাব অনেক কমে যাচ্ছে। এটি আমাদের নিঃস্বার্থ আত্মদানের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। কিন্তু এইভাবে চলতে থাকলে আমরা খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধবিহীন হয়ে পড়ব। আমাদের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব ক্ষুণ্ণ হবে। তাই আমরা কীভাবে সেবাকোজে নিজের জীবন নিবেদন করব, এখন থেকেই তা চিন্তা করব, যেন ঈশ্বরের অমূল্য দান আমার জীবন দিয়ে অর্থপূর্ণ সেবা দান করতে পারি।

কাজ : ১. তোমাদের আশপাশে বা তোমার জানা মতে কী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার একটি তালিকা করো। সেখানে কারা সেবা করছেন; কী ধরনের সেবা করছেন তারা? দলে আলোচনা করে তার উপর একটি পোস্টার তৈরি করো।

কাজ : ২. তোমাদের আশপাশের কোনো সেবা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে প্রতিবেদন তৈরি ও শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

খ্রীষ্টের আত্মদান

যীশুখ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে এসেছিলেন যেন মানুষ জীবন পায় এবং তা যেন পরিপূর্ণভাবেই পায়। তিনি অগণিত মানুষকে সেবা করেছেন। তাদেরকে রোগমুক্ত করেছেন, দরিদ্র ও ক্ষমতাহীনদের পক্ষ নিয়েছেন। নিঃশর্তভাবে মানুষকে ভালোবেসেছেন। মানুষের কাছে পিতার সীমাহীন ভালোবাসার কথা বলেছেন। মানুষকে শিখিয়েছেন ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকতে। মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করার জন্য শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত থেকে তিনি ক্রুশের উপর আত্মদান করেছেন। সব মানুষকে দিয়েছেন ঐশ সন্তান হবার অধিকার। নিম্নে যীশুর আত্মদানের কয়েকটি বিশেষ দিক আলোচনা করা হলো।

১. মন্দিরে নিবেদিত শিশু যীশু: ইহুদি রীতি অনুসারে জন্মের চল্লিশ দিন পর পুরুষ শিশুকে মন্দিরে নিবেদন করা হতো। সেই রীতি অনুসারে মা মারীয়া ও সাধু যোসেফ শিশু যীশুকে মন্দিরে নিবেদন করলেন। জীবনের শুরু থেকেই যীশু ছিলেন নিবেদিত। শিশুকালেই তাঁর পিতামাতা তাঁকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছেন।

২. মন্দিরে 'পিতার কাজে' বালক যীশু: বারো বৎসর বয়সে যীশুর পিতামাতা যীশুকে নিয়ে নিস্তারপর্ব পালন করার জন্য যেরুসালেম মন্দিরে গিয়েছিলেন। তখনই যীশু জানতেন তাঁকে পিতার কাজে ব্যাপৃত থাকতে হবে। তাই তিনি পিতামাতার অজান্তে মন্দিরেই থেকে গিয়েছিলেন। তাঁর পিতামাতা ভেবেছিলেন তিনি হারিয়ে গেছেন। খুঁজতে খুঁজতে তিন দিন পর তাঁরা তাঁকে মন্দিরে পণ্ডিতদের মধ্যে ধর্ম বিষয়ক আলোচনায় রত দেখতে পান। পিতামাতা তাঁকে খুঁজে পাওয়ার পর তিনি আবার তাঁদের সাথে নাজারেথে ফিরে যান ও তাঁদের সাথে বসবাস করতে থাকেন।

৩. শয়তানের দ্বারা প্রলোভিত হওয়া: যীশু তাঁর প্রকাশ্য জীবন ও কাজ আরম্ভ করার আগে মরুপ্রান্তরে গেলেন এবং চল্লিশ দিন যাবত উপবাস ও ধ্যান-প্রার্থনা করলেন। এই সময় শয়তান তাঁকে নানাভাবে পরীক্ষা করে প্রলোভনে ফেলতে চেয়েছিল। সে সময়ও যীশু বার বার ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছেন এবং ঈশ্বরের শক্তিতে সমস্ত পরীক্ষা প্রলোভন জয় করেছেন। সম্পূর্ণ আত্মদানের মাধ্যমেই তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন এবং মানুষের জন্য কাজ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন।

৪. যীশুর প্রকাশ্য কর্মজীবন: নির্ধারিত সময় পূর্ণ হওয়ার পর যীশু তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ করলেন। তিনি সর্বান্তকরণে মানুষকে ভালোবেসেছেন। নিজের সব ক্ষমতা ও শক্তি দিয়ে মানুষের সেবা করেছেন। মানুষকে রোগ থেকে সুস্থ করেছেন, পাপের হাত থেকে বন্দিকে মুক্ত করেছেন, দরিদ্র ও ক্ষমতাহীনদের পক্ষ নিয়েছেন, আশাহীনকে শুনিয়েছেন আশার বাণী।

৫. শেষ ভোজের সময় নিজেকে খাদ্য ও পানীয়রূপে দান: মৃত্যুর পূর্বে শেষ ভোজে বসে তিনি তাঁর দেহ ও রক্ত পরিত্রাণদায়ী খাদ্যরূপে দান করেছেন। জীবনদায়ী খাদ্য পবিত্র খ্রিষ্টপ্রসাদ/সাক্রামেন্ত স্থাপন করছেন। পরিপূর্ণভাবে তিনি নিজেকে দান করলেন চিরকালের জন্য। ইতিহাসে আত্মদানের এমন উদাহরণ আর নেই।

৬. সেবার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা : শেষ ভোজে বসে যীশু তাঁর বিনম্র সেবার আর একটি স্মরণযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। তিনি নিজ হাতে শিষ্যদের পা ধুয়ে দিলেন। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি বোঝাতে চাইলেন তিনি সেবা পেতে নয়; বরং সেবা করতে এসেছেন। তিনি মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে এসেছেন মানুষের জন্য নিজেকে দান করতে। সেই সাথে তিনি আমাদের এই শিক্ষাও দিতে চান আমরাও যেন পরস্পরের সেবা করি। অন্যদের জন্য জীবন দান করি।

৭. সাক্রামেন্ত প্রতিষ্ঠা: সাতটি সংস্কার (প্রোটেস্টান্ট মতে দুইটি) স্থাপনের মধ্য দিয়ে যীশু নিজেকে আমাদের জন্য দান করেছেন। আমরা যেন পরিপূর্ণভাবে জীবন পাই। আমরা যেন সব অবস্থায় ঐশ আশীর্বাদ লাভ করতে পারি। সাক্রামেন্তগুলো আমাদের জন্য বিশেষ উপায় যার মধ্য দিয়ে যীশু আমাদের জন্য প্রতিনিয়ত নিজেকে দান করছেন।

৮. গেৎসিমানি বাগানে শত্রুদের হাতে সমর্পিত হওয়া: যীশু ইচ্ছা করলে যন্ত্রণাভোগ ও ক্রুশমৃত্যু এড়িয়ে যেতে পারতেন। পিতার কাছে তিনি প্রার্থনাও করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "হে পিতা, তুমি যদি চাও, তাহলে এই পানপাত্রটি আমার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও! তবে আমার ইচ্ছা নয়, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক!" জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি পিতার ইচ্ছাই পালন করার পথ বেছে নিলেন। মানুষকে পাপ মুক্ত করার জন্য তিনি সমস্ত যন্ত্রণা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন।

৯. পিলাতের বাড়িতে বিচারে দণ্ডিত হওয়া: পিলাতের বাড়িতে মিথ্যা বিচার ও বিচারের নামে প্রহসনকে তিনি মাথা পেতে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তাঁকে দেওয়া হলো সবচেয়ে লজ্জাজনক শাস্তি, ক্রুশীয় মৃত্যু। মানুষের জন্য তিনি তাও গ্রহণ করলেন।

১০. ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ: সবকিছুর পর চূড়ান্তভাবে তিনি অসহনীয় কষ্ট ভোগ করে ক্রুশের উপর প্রাণত্যাগ করলেন। মানুষের পরিত্রাণের জন্য তিনি এই মৃত্যুবরণ করলেন। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দান করলেন মানুষের জন্য। তিনি নিজেকে নত করলেন এবং ক্রুশের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বাধ্য থাকলেন। তিনি নিজেই বলেছেন বন্ধুর জন্য জীবন দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান আর কী হতে পারে?

১১. পুনরুত্থানের পর শিষ্যদের দর্শন ও পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করার প্রতিশ্রুতি: তিনি ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি মৃত্যুকে জয় করলেন। তিনি পুনরুত্থিত হলেন। এইভাবেই তিনি তাঁর পরিপূর্ণ আত্মদানের মধ্য দিয়ে আমাদের পরিপূর্ণ জীবন দিলেন। পুনরুত্থানের পর স্বর্গারোহণের পূর্বে তিনি তাঁর আত্মাকে আমাদের জন্য পাঠিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনে পবিত্র আত্মাকে দানের মধ্য দিয়ে যীশু তাঁর আত্মদানের পূর্ণতা ঘটালেন।

মণ্ডলীর মস্তক হিসেবে যীশু সব সময় আমাদের সাথে রয়েছেন। প্রতিবার পবিত্র খ্রিষ্টপ্রসাদ বা প্রভুর ভোজ গ্রহণের মাধ্যমে আমরা যীশুকে গ্রহণ করি। তিনি আমাদের মধ্যে আসেন এবং তাঁর জীবন আমাদের দান করেন। পবিত্র বাণীর মধ্য দিয়েও যীশু নিজেকে দান করেন।

কাজ : খ্রীষ্টের আত্মদান কীভাবে তোমার আত্মদানকে অনুপ্রাণিত করে? দলে সহভাগিতা করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. শিক্ষাদান বা জ্ঞানদান কী?

ক. দয়ার কাজ

খ. মানবতার কাজ

গ. সেবা কাজ

ঘ. ভালো কাজ

২. আমরা কীভাবে যীশুকে গ্রহণ করি?

ক. বাণীর মাধ্যমে

খ. জীবনযাপনের মাধ্যমে

গ. সাক্রামেন্তের মাধ্যমে

ঘ. খ্রীষ্টপ্রসাদের মাধ্যমে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মনি অনেক পরিশ্রম করে একটি নার্সারি প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিনি কয়েক জন গরিব লোক নিয়োগ দিয়ে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করেন।

৩. মনির সেবার ক্ষেত্র কী ছিল?

ক. ব্যক্তি খ. পরিবার

গ. সমাজ ঘ. মণ্ডলী

৪. মনি তার সেবার মাধ্যমে –

i. দারিদ্র্য বিমোচন করেন

ii. অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দেন

iii. মানুষের সেবা করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দুইটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো।

২. তোমার জানা একজন সাধুর বা সাধ্বীর জীবনী সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

৩. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের তিনটি ইতিবাচক ফলাফল উল্লেখ করো।

৪. মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো।

৫ সেবা কাজে আত্মনিবেদন বলতে কী বোঝায়?

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. প্রদীপ তাদের পরিবারের শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। একদিন সে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় একজন বৃদ্ধকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। প্রদীপ একজন শিক্ষিত মানুষ হয়েও কীভাবে এত খারাপ আচরণ করতে পারে। একসময় প্রদীপের এমন আচরণের কথা শুনে তার প্রতিবেশী প্রণয় চিন্তা করল এ বিষয়টি প্রদীপকে বলা দরকার। তাই প্রণয় সুযোগ বুঝে প্রদীপকে তার মন্দ আচরণের কথা বুঝিয়ে বলে। প্রণয়ের কথা শুনে প্রদীপ বুঝতে পারে এ ধরনের আচরণ শোভনীয় নয়।

ক. নিজেকে জানার প্রথম ধাপ কোনটি?

খ. একজন মানুষ থেকে অন্য আর একজন মানুষ সম্পূর্ণ আলাদা কেন?

গ. প্রণয়ের কোন দিকটি প্রদীপকে পরিবর্তিত হতে সাহায্য করেছে—ব্যাখ্যা করো।

ঘ. স্বাধীন মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রদীপের আত্মমূল্যায়নেরও দরকার বলে কি তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ করো।

২. তৃণা ও তৃষা যমজ বোন। বাহ্যিক চেহারা, গায়ের রং, উচ্চতা, কথা বলার ধরন সবই এক রকম। বুদ্ধির দিক থেকে প্রায় কাছাকাছি। তৃষা গরিব সহপাঠীদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে। পিতামাতার বাধ্য এবং লেখাপড়ার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। অপরদিকে তৃণা অলস, অন্যের প্রতি অমনোযোগী, নিজের সুযোগ সুবিধার প্রতি নজর বেশি।

ক. প্রকৃত শিক্ষা কী?

খ. মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনীয়তা কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. তৃণা ও তৃষার মধ্যে যে পার্থক্য তাকে কী বলা হয়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'তৃণা ও তৃষার যে পার্থক্য তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনের ফলাফলই রয়েছে'—মূল্যায়ন করো।

তৃতীয় অধ্যায়

আমার স্বাধীনতা ও সমাজ

ঈশ্বর মানুষকে এমন করেই সৃষ্টি করলেন যেন মানুষকে একা থাকতে না হয়, সে যেন সমাজে বাস করতে পারে। বিশ্বসৃষ্টির দিকে তাকালে আমরা দেখি কত বিচিত্র ধরনের প্রাণী, বস্তু, ফুলফল, গাছপালা, পশুপাখি রয়েছে। শুধু বৈচিত্র্যই নয়, তাদের মধ্যে রয়েছে দলবদ্ধতা। আমরা দেখি, পাখির ঝাঁক, পশুর পাল, বৃক্ষরাজি আর ফুলফলের সমাহার। প্রকৃতিতে রয়েছে একাত্মতা, মিলন ও সমন্বয়। তেমনি মানুষও সৃষ্ট হয়েছে সমাজে বাস করার জন্য। মানব পরিবারে তার জন্ম এবং মানবসমাজেই তার বাস। পরস্পরের সাহচর্য পাবার জন্যেই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে। মানবসমাজে বাস করতে হলে মানুষকে নিজ অধিকার রক্ষা করার সাথে সাথে অপরের অধিকার স্বীকার করে নিতে হয়। প্রতিটি মানুষই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট, তাই প্রত্যেকেরই রয়েছে ব্যক্তিমর্যাদা ও জন্মগত অধিকার। তাই নিজ নিজ অধিকার রক্ষা করে চলা প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- নিঃসঙ্গতা ও সম্প্রীতির তুলনামূলক আলোচনা করতে পারব;
- অন্যদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নিজের ও অন্যদের স্বাধীনতা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব;
- খ্রীষ্টবিশ্বাসে বলীয়ান মানুষের জীবন মূল্যায়ন করতে পারব;
- অন্যদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হবো এবং
- অন্যের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবো।

নিঃসঙ্গতা ও সম্প্রীতি

নিঃসঙ্গতা হলো মানুষের খুবই কষ্টকর একটি অনুভূতি। একজন নিঃসঙ্গ ব্যক্তি অপর্যাপ্ত সামাজিক সম্পর্কের অভাবে নিজের মধ্যে শূন্যতা ও একাকিত্ব অনুভব করে। একাকিত্বের এই অভিজ্ঞতা একান্ত ব্যক্তিগত। অর্থাৎ একজনের অনুভূতি থেকে অন্যজনের অনুভূতি ভিন্নতর হয়ে থাকে। নিঃসঙ্গতাকে একটি সামাজিক তাগিদ হিসেবেও বর্ণনা করা যায় যা একজন নিঃসঙ্গ ব্যক্তিকে সামাজিক সম্পর্ক গড়তে উদ্বুদ্ধ করে। অন্যদিকে একটি বা কয়েকটি সামাজিক দলের মধ্যে পরস্পর শান্তিপূর্ণ মানবিক শক্তি ও গতিশীলতাই হলো সম্প্রীতি। জীবনে অর্থপূর্ণভাবে ও আনন্দের সঙ্গে বেঁচে থাকা এবং সমাজে টিকে থাকার জন্য মানুষ পরস্পরের সাথে যে প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলে তাই হলো সম্প্রীতি বা বন্ধুত্ব। একজন ছেলে বা মেয়ে তার পরিবারে পরস্পর ভালোবাসার বন্ধনের মাঝেই প্রথম সম্প্রীতি বা বন্ধুত্বের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। তার সেই অভিজ্ঞতা থেকেই সে সমাজে সম্প্রীতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে আরও বৃহত্তর পরিসরে সে সম্প্রীতির অভিজ্ঞতা লাভ করে। যেমন, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি স্থানে ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, জাতি নির্বিশেষে সবার সাথে সে সম্প্রীতি গড়ে তোলে। এভাবে কষ্টকর নিঃসঙ্গ জীবন পরিত্যাগ করে মানুষ সম্প্রীতির আনন্দে বসবাস করতে উদ্যোগী হয়।

আমরা যদি নিঃসঙ্গতা ও সম্প্রীতির একটি তুলনামূলক আলোচনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো– নিঃসঙ্গতা জীবন ও কাজকর্মে বয়ে আনে অনীহা। কিন্তু সম্প্রীতিপূর্ণ জীবন আনে অদম্য কর্মস্পৃহা ও জীবনের প্রতি আগ্রহ। নিঃসঙ্গতা কষ্ট ও বেদনা বয়ে আনে এবং সম্প্রীতি বয়ে আনে সুখ, শান্তি ও আনন্দ। নিঃসঙ্গ জীবনে মানুষ অন্যদের কাছ থেকে দূরত্ব সৃষ্টি করে একা সুখী হতে চায় কিন্তু প্রকৃত সুখ তারা পায় না। তারা নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনগুলো মিটাতে পারে না এবং অন্যদের প্রয়োজনগুলো সম্বন্ধেও সচেতন থাকে না। সম্প্রীতিপূর্ণ জীবনে মানুষ নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনগুলো অনেকটাই মিটাতে সক্ষম হয় ও অন্যদের জীবনের প্রয়োজনগুলো মিটানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করে। নিঃসঙ্গ জীবনে একাকিত্ব, ব্যর্থতা ও উদ্দেশ্যহীনতার উপলব্ধি অনুভূত হয়; জীবনকে তুচ্ছ, অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন মনে হয়। কিন্তু সম্প্রীতিপূর্ণ জীবনে জীবনকে সুন্দর ও অর্থপূর্ণ মনে হয় এবং ব্যক্তির মধ্যে উদারতা ও সহভাগিতার মনোভাব জেগে ওঠে। নিঃসঙ্গ জীবনে সব সময় একটি অভাব বোধ থেকে যায়, আর সম্প্রীতিপূর্ণ জীবনে অন্তরে সর্বদা একটা পূর্ণতা, আনন্দ ও কৃতজ্ঞতাবোধ বিরাজ করে।

কাজঃ ছোট ছোট দলে নিঃসঙ্গতা ও সম্প্রীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিয়ে আলোচনা করো এবং দুইটি কলামে তা উপস্থাপন করো।

বন্ধুত্ব গড়ার প্রয়োজনীয়তা

সমাজে বসবাস করা হচ্ছে মানুষের একটি মৌলিক মানবিক আকাঙ্ক্ষা। সহজাত বৈশিষ্ট্যের গুণেই মানুষ অনুভব করে যে, শুধুমাত্র অন্যদের সঙ্গে বসবাস করার মাধ্যমেই সে অর্জন করে প্রকৃত মানবতাবোধ। তাই বন্ধুত্বের অভিজ্ঞতা লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে খুবই তীব্র। মানুষ যখন একে অন্যের সাথে দায়িত্ব সহভাগিতা করে ও একযোগে কাজ করে তখন মহৎ অনেক কিছুই সে অর্জন করতে পারে। নিঃসঙ্গতা দুঃখ বয়ে আনে। আমাদের একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতা দূর করতে আমাদের প্রয়োজন হয় বন্ধুত্বের। আমরা পরস্পরের সাথে সহভাগিতা, সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের মধ্যেই প্রকৃত সুখ ও আনন্দ খুঁজে পেতে পারি। একযোগে কাজ করে মানুষ মহৎ অনেক কিছুই অর্জন করতে পারে।

আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কখনো সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। সম্প্রীতি, একতা ও বন্ধুত্ব সহজে অর্জন করা যায় না, কোনো পাত্রের মধ্যে তা ধরে রাখা সম্ভব নয় এবং পরে তা ইচ্ছেমতো ব্যবহারও করা যায় না। ভালোবাসা, সহভাগিতা, সক্রিয় অংশগ্রহণ ও যত্নের মাধ্যমে সমাজ গড়ে ওঠে। সহযোগিতা ও ভালোবাসা জন্ম দেয় বন্ধুত্ব, মিলন ও সম্প্রীতির। এশিয়ায়, বিশেষভাবে বাংলাদেশে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিদ্যমান। এই বাস্তবতায় মানুষের অভিজ্ঞতাও অনেক সময়ই অন্য ধর্মীয় ও ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। সব ধর্মের মধ্যেই উদার ও খোলা মনোভাবাপন্ন মানুষ আছে। তারা একত্রে কাজ করে ও একে অপরকে সাহায্য করে এবং তাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ও মত বিনিময় হয়। এভাবে তাদের মধ্যেও সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে ওঠে।

কাজ: "সম্প্রীতিই মানব জীবনে সুখী হওয়ার সর্বোত্তম পন্থা"–এই বিষয়টির ওপর দুইটি দল বিতর্ক প্রতিযোগিতা করবে। অন্যরা সকলে বিচারকের ভূমিকা পালন করবে। পরে মতামত চাওয়া হলে সকলেই মতামত দিতে পারবে।

স্বাধীনতা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা

পবিত্র বাইবেলের আদিপুস্তকে সাধারণ মানুষের বোঝার উপযোগী করে মানুষের উৎস কোথায় এবং মনোনীত জাতির সূচনা কোথা হতে হয়েছে সে বিষয়ে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আদিপুস্তকের প্রথম দুইটি অধ্যায়ে কয়েকটি মৌলিক বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। সেগুলোর একটি হলো ঈশ্বর স্বাধীন ইচ্ছা দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর সাথে ও অন্য সকল মানুষের সাথে সম্প্রীতিপূর্ণ জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে। তবে এই স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে মানুষ ঈশ্বর ও মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপনের পথ বেছে নিয়েছিল। এই বিষয়টি আমরা দেখতে পাই আদিপুস্তকের চতুর্থ ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে। এখানে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মানুষের প্রথম বিদ্রোহের কাহিনির পর মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের প্রথম গুরুতর অন্যায়ের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষ অন্যায় করলেও ঈশ্বর নিজেকে সন্ধির বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন শুধুমাত্র ব্যক্তি বা জাতি বিশেষের সঙ্গে নয়; বরং সমগ্র মানবজাতি ও গোটা প্রাণিকুলের সঙ্গেও। এই বিষয়টি আমরা দেখতে পাই আদিপুস্তকের নবম অধ্যায়ে। এই সন্ধির মূলকথা হলো ঈশ্বর মানবজাতি ও প্রাণিকুলকে রক্ষা করবেনই। মানুষ তবুও ঈশ্বরকে অস্বীকার করে এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে, অন্য মানুষের কাছ থেকে, সমগ্র সৃষ্টির কাছ থেকে, এমনকি নিজের কাছ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

পবিত্র বাইবেলে দুই ধরনের স্বাধীনতা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে– রাজনৈতিক বা সামাজিকভাবে পরাধীনতা বা দাসত্ব হতে স্বাধীনতা বা মুক্তি এবং অন্যটি হলো অভ্যন্তরীণভাবে পাপের দাসত্ব হতে স্বাধীনতা বা মুক্তি। পবিত্র বাইবেলের যাত্রাপুস্তকে ইস্রায়েল জাতির মিশর দেশের দাসত্ব হতে মুক্তির বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। পরবর্তীতে প্রবক্তাদের লিখিত গ্রন্থে ইস্রায়েল জাতির বাবিলনের দাসত্ব হতে মুক্তির বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে। পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মে বর্ণনা রয়েছে পাপের দাসত্ব হতে মুক্তির বিষয়ে। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এ জগতে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমাদেরকে পাপের দাসত্ব হতে মুক্তি দিতে। নিচে নতুন নিয়ম হতে কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো।

যোহন লিখিত মঙ্গলসমাচারের ৮:৩১- ৩৬ পদে যীশু তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ইহুদিদের লক্ষ করে বললেন: "তোমরা যদি আমার বাণী পালনে নিষ্ঠাবান থাক, তাহলেই তো তোমরা আমার যথার্থ শিষ্য; তাহলেই তো সত্যকে তোমরা জানতে পারবে আর সত্য তোমাদের স্বাধীন করে দেবে"। ইহুদি ধর্মনেতারা তখন বলে উঠলেন: "আমরা ইহুদিরা আব্রাহামের বংশের লোক, আমরা কারো দাসত্ব করিনি কখনো। তাহলে আপনি কী করে বলছেন যে, তোমরা স্বাধীন হয়ে উঠবে?" উত্তরে যীশু বললেন: "আমি আপনাদের সত্যি সত্যিই বলছি, যে-কেউ পাপ করে, সে পাপের ক্রীতদাস। এখন, ক্রীতদাস তো স্থায়ীভাবে ঘরে থাকে না; পুত্র কিন্তু স্থায়ীভাবেই থাকে। তাই স্বয়ং পুত্রই যদি আপনাদের স্বাধীন করে দেয়, আপনারা সত্যিই স্বাধীন হয়ে উঠবেন।"

১০২৫

রোমীয়দের কাছে লেখা সাধু পলের পত্রের ৮:১৫ পদে বলা হয়েছে: "পরমেশ্বরের কাছ থেকে তোমরা যে আত্মিক প্রেরণা পেয়েছ, তা তো দাসের সেই মনোভাব নয়, যার জন্যে তোমাদের আবার ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে; বরং তা পুত্রেরই মনোভাব, যার জন্যে আমরা "আব্বা! পিতা! বলে ডেকে উঠি। স্বয়ং ঐশ আত্মা আমাদের অন্তরাত্মার সঙ্গে মিলিত কণ্ঠে এই সত্যের সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা পরমেশ্বরের সন্তান।" করিন্থীয়দের কাছে দ্বিতীয় পত্রের ৩: ১৭ পদে সাধু পল লিখেছেন: "যেখানে প্রভুর আত্মা, সেখানেই স্বাধীনতা।"

গালাতীয়দের কাছে লিখিত পত্রে সাধু পল বলেন: "খ্রীষ্ট যখন আমাদের স্বাধীন করে দিয়েছেন, তিনি চেয়েছেন, আমরা যেন সত্যিই স্বাধীন হয়ে থাকি। তাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো তোমরা; নিজেদের ওপর আর সেই দাসত্বের জোয়ালটা চেপে বসতে দিয়ো না" (গালাতীয় ৫:১)। এখানে আরও বলা হয়েছে: "তোমরা তো স্বাধীন মানুষ হওয়ার জন্যেই আহুত হয়েছ। শুধু দেখো, এই স্বাধীনতা যেন তোমাদের নিম্নতর স্বভাবটাকে কোন রকম সুযোগ না দেয়। তোমরা বরং ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরস্পরের সেবা কর" (গালাতীয় ৫:১৩)।

সাধু পিতর তাঁর লেখা পত্রে বলেছেন: "স্বাধীন মানুষ তোমরা– স্বাধীন মানুষের মতোই কাজ করো। তোমাদের এই স্বাধীনতার অজুহাতে মন্দ কাজ করতে যেয়ো না। বরং পরমেশ্বরের সেবকের মতোই কাজকর্ম কর তোমরা। সবাইকে সম্মানের চোখেই দেখ। আমাদের এই ভ্রাতৃমণ্ডলীকে ভালোবেসো। পরমেশ্বরকে সম্ভ্রম করে চলো" (১পিতর ২:১৬-১৭)।

পবিত্র বাইবেলের শিক্ষানুসারে আমরা স্বাধীন হয়ে সৃষ্ট হয়েছি। আমরা ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বর চান আমরা যেন আর পরাধীন না হই। স্বাধীন মানুষ হিসেবে আমরা যেন সমাজে বাস করি।

খ্রীষ্টবিশ্বাসে বলীয়ান জীবন

খ্রীষ্টবিশ্বাসে সবল ব্যক্তির উদাহরণ আমাদের সামনে অনেক। তবে এখন আমরা এরকম ব্যক্তিদের মধ্য থেকে মাত্র কয়েকজনের সাথে পরিচিত হবো। তাঁরা আমাদের মতোই সাধারণ মানুষ ছিলেন কিন্তু খ্রীষ্টবিশ্বাসে সবল জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে মণ্ডলীতে সাধু ও সাধ্বী বলে অভিহিত হয়েছেন। তাঁদেরকে আমরা আদর্শ ব্যক্তি বলে জানি।

১. সাধু পল

সাধু পল হলেন খ্রীষ্টবিশ্বাসে একজন সবল ব্যক্তি। সিলিসিয়া প্রদেশের তার্সাস নগরে তাঁর জন্ম হয়। জন্মের পর তাঁর নাম ছিল সৌল। মন পরিবর্তনের পর তাঁর নাম রাখা হয় পল। তাঁর পিতামাতা বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর লোক ছিলেন। জন্মসূত্রে তিনি রোমান নাগরিক ছিলেন। খুব সম্ভবত তিনি খ্রিষ্ট জন্মের কিছুকাল পরেই জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়ার জন্য তাঁর পিতামাতা তাঁকে যেরুসালেমে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তিনি পণ্ডিত গামালীয়েলের কাছে ইহুদি ধর্মমত ও আইনকানুন সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি একজন গোঁড়া ইহুদি ছিলেন। বক্তা হিসেবে তিনি বেশ ভালোই ছিলেন। তর্কবাগীশ হিসেবেও তিনি প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। প্যালেস্টাইনে যীশু প্রকাশ্য জীবন শুরু করার আগেই সাধু পল যেরুসালেমে পড়া শেষ করে তার্সাস নগরে ফিরে যান।

যীশুর মৃত্যুর কিছু পরে তিনি প্যালেস্টাইনে ফিরে আসেন। ইহুদি ধর্মমতে গোঁড়া বিশ্বাসী হওয়ার কারণে তিনি খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের বিরোধিতা করেন এবং তাদের ধ্বংস করার জন্য প্রচেষ্টা চালান। যেরুসালেমে সাধু স্তেফানের মৃত্যুর সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তখন বয়সে তিনি যুবক ছিলেন। ক্রমে তিনি ঘোর খ্রীষ্টবিরোধী হয়ে ওঠেন।

একবার তিনি খ্রীষ্টানদের বন্দি করে যেরুসালেমে নিয়ে আসার জন্য সম্রাটের অনুমতি আনতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে দামাস্কাস যাবার পথে তিনি নির্যাতিত খ্রীষ্টের দেখা পান। এখানেই তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন নেমে আসে। তাঁর এই মন পরিবর্তনের ঘটনা আমরা প্রেরিতদের কার্যাবলি গ্রন্থে ৯:১-১৯ পদে পাই :

"তখনো সৌল প্রভুর শিষ্যদের বিরুদ্ধে হুমকি দিয়ে বলে বেড়াচ্ছেন যে, তিনি তাদের শেষ করে দেবেন। একদিন মহাযাজকের কাছে গিয়ে তাঁকে তিনি দামাস্কাসের সমাজগৃহগুলোর সদস্যদের কাছে এই মর্মে পত্র লিখে দিতে অনুরোধ করলেন যে, ওই ধর্মমতের অনুগামী পুরুষ বা নারী কাউকে পেলেই তিনি যেন তাদের বন্দি করে যেরুসালেমে নিয়ে আসতে পারেন। পথ চলতে চলতে তিনি দামাস্কাসের বেশ কাছেই এসে গেছেন, এমন সময় হঠাৎ একটি আলো আকাশ থেকে নেমে এসে তাঁর চারদিকে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে লাগল। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং শুনতে পেলেন, কার যেন কণ্ঠস্বর তাঁকে বলছে– "সৌল, সৌল, কেন তুমি আমাকে নির্যাতন করছ?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "আপনি কে, প্রভু?" উত্তর এলো: "আমি যীশু, যাকে তুমি নির্যাতন করছ! এখন ওঠ, নগরে প্রবেশ করো। তোমাকে কী করতে হবে, সেখানেই তা বলে দেওয়া হবে।" সৌলের সহযাত্রীরা অবাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই কণ্ঠস্বর শুনেও তারা কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। সৌল তখন মাটি থেকে উঠলেন; তাঁর চোখ খোলা, অথচ তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। তাই লোকেরা তাঁকে হাত ধরে দামাস্কাসে নিয়ে চলল। তিনদিন ধরে তিনি দৃষ্টিহীন হয়েই রইলেন।

দামাস্কাসে আনানিয়াস নামে একজন শিষ্য ছিলেন। তাঁকে দর্শন দিয়ে প্রভু বললেন– 'আনানিয়াস, যাও। সরল সরণী নামে রাস্তায় গিয়ে সেখানে যুদার বাড়িতে তার্সাস নগরের সৌল বলে একজন লোকের খোঁজ করো। সে এখন প্রার্থনা করছে। দিব্য দর্শনে সে দেখতে পেয়েছে, আনানিয়াস নামে একজন এসে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেবার জন্যে তার ওপর একবার হাত রাখছে।' আনানিয়াস উত্তর দিলেন: 'প্রভু, ওই লোকটির বিষয়ে অনেকেরই কাছে শুনেছি যে, যেরুসালেমে সে আপনার ভক্তদের কত ক্ষতিই না করেছে! যারা আপনার নাম নেয়, তাদের বন্দি করবার জন্যে প্রধান যাজকদের দেওয়া ক্ষমতা নিয়েই সে নাকি এখন এখানে রয়েছে।' প্রভু কিন্তু তাঁকে বললেন: 'তুমি যাও, কারণ বিজাতীয়দের কাছে, তাদের রাজাদের কাছে এবং ইস্রায়েলীয়দের কাছে আমার নাম বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সে যে আমার মনোনীত পাত্র। আমি নিজেই তাকে বোঝাব, আমার নামের জন্যে কত দুঃখ তাকে ভোগ করতে হবে।'

আনানিয়াস তখন সেখানে গেলেন। সেই বাড়িতে ঢুকে সৌলের ওপর একবার হাত রেখে তিনি বললেন: 'ভাই সৌল, স্বয়ং প্রভুই আমাকে পাঠিয়েছেন– সেই যীশুই, এখানে আসার পথে তুমি যাঁর দর্শন পেয়েছিলে, আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন, তুমি যেন আবার চোখে দেখতে পাও, তুমি যেন অন্তর ভরে

পবিত্র আত্মাকে পেতে পার।' তক্ষুনি সৌলের চোখ থেকে আঁশের মতো কী যেন খসে পড়ল এবং তিনি আবার চোখে দেখতে পেলেন। তিনি এবার উঠে দাঁড়ালেন, তারপর দীক্ষাস্নান গ্রহণ করলেন এবং পল নাম গ্রহণ করলেন।"

দামাস্কাসেই তিনি সমাজগৃহগুলোতে প্রচার করতে শুরু করলেন, যীশুই হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বরের পুত্র। সকলেই তাঁর কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। পলের প্রচার ক্ষমতা দিনে দিনে বাড়তে লাগল। যীশুই যে খ্রিষ্ট, এই কথা প্রমাণ করে তিনি দামাস্কাসের ইহুদিদের দিশেহারা করে দিতে লাগলেন। সেখানে ইহুদিরা তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। শিষ্যরা তাঁকে যেরুসালেমে পাঠিয়ে দিলেন। যেরুসালেমে গিয়ে তিনি মণ্ডলীর প্রধান, পিতরের সাথে দেখা করেন। এর পর থেকে তাঁর দীর্ঘ প্রচার জীবন শুরু হয়। প্রথমেই তিনি তাঁর জন্মস্থান তার্সাসে যান এবং সেখানে প্রচার কাজ করেন। সেখান থেকে তিনি বার্নাবাসকে নিয়ে আন্তিয়োক নগরে যান। পিতরের সাথে বিশেষ ধর্মীয় আলোচনার জন্য তাঁরা যেরুসালেমে যান। তাদের কাজ শেষ করে তাঁরা আবার আন্তিয়োকে ফিরে যান এবং একে একে তিনটি প্রৈরিতিক যাত্রা করেন। তাঁর প্রথম প্রৈরিতিক যাত্রা ছিল সাইপ্রাস দ্বীপ হয়ে পামফিলিয়া, পিসিদিয়া এবং লিকাউনিয়া হয়ে এশিয়া মাইনরের সকল স্থানে যাত্রা করা ও পিসিদিয়া-আন্তিয়োক, ইকোনিয়াম, লিস্ত্রা ও দর্বীতে মণ্ডলী স্থাপন করা।

যেরুসালেমের প্রৈরিতিক সভায় অংশগ্রহণের পর পল প্রথমে সিলাস ও পরে তিমথি ও লুককে সঙ্গে নিয়ে তাঁর দ্বিতীয় প্রৈরিতিক যাত্রা করেন। এ সময়ে তিনি ফিলিপ্পী, থেসালোনিকা, বেরেয়া, এথেন্স ও করিন্থে প্রচার করেন। তৃতীয় প্রচার যাত্রায় তিনি তিন বছর ধরে এফেসাস নগরীতে থাকেন ও সেখান থেকে বিভিন্ন স্থানে প্রচার করেন। তিনি যেরুসালেম ছেড়ে রোম ও স্পেন দেশে যাবার জন্য আরো একটি প্রচারযাত্রার পরিকল্পনা করছিলেন। ইহুদিদের অত্যাচার তাঁর এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত হতে দেয়নি। সিজারিয়াতে দুই বছর কারাবাসের পর পল রোমে পৌঁছান। সেখানে আরো দুই বছর তাঁকে বন্দি অবস্থায় রাখা হয়। রোমের কারাবাস হতে ছাড়া পাবার পর পল স্পেন যাত্রা করেছিলেন এবং রোমে ফিরে এসে দ্বিতীয়বার কারারুদ্ধ হন এবং ৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে শিরচ্ছেদ করা হয়। তাঁর প্রচারের ফলে আন্তিয়োকে খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণ প্রথম খ্রীষ্টান নামে অভিহিত হন। যেরুসালেমের বাইরে বিজাতীয়দের কাছে তিনি খ্রীষ্টকে পরিচয় করিয়ে দেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মণ্ডলীকে লেখা সাধু পলের পত্রগুলো হতে আমরা খ্রীষ্টবিশ্বাসীর জীবন ও আধ্যাত্মিকতা কী হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারি। যুগ যুগ ধরে মণ্ডলী ও খ্রীষ্টবিশ্বাসী ভক্তজনগণ তাঁর এই অবদানের কথা মনে রাখবে ও তাঁর আদর্শ অনুসরণ করবে। ২৫শে জানুয়ারি কাথলিক মণ্ডলীতে সাধু পলের মন পরিবর্তন দিবস এবং ২৯শে জুন যৌথভাবে পিতর ও পলের পর্বদিন পালন করা হয়। (প্রোটেস্টান্ট মণ্ডলীতে সাধু পিতর ২৯শে জুন ও সাধু পৌলের পর্বদিন ৩০শে জুন)।

২. সাধ্বী মারীয়া গরেটি

সাধ্বী মারীয়া গরেটি হলেন মণ্ডলীর নবীন সাধ্বীদের মধ্যে একজন। তিনি অতি অল্প বয়সে সাধ্বী বলে ঘোষিত হন। তাঁর পবিত্রতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে তিনি সাক্ষ্যময় হয়েছেন। ১৬ই অক্টোবর ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইতালিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল লুইজি গরেটি ও মাতার নাম আসুন্তা কারলীনি। ছয় ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। তাঁর দুই বোনের নাম ছিল তেরেজা ও

আরসিলিয়া এবং ভাইদের নাম ছিল আঞ্জেলো, সানড্রিনো ও মারিনো। মারীয়ার বয়স যখন ছয় বছর তখন তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে। ছয় ছেলেমেয়ের ভরণপোষণ করতে তাঁর পিতামাতা হিমশিম খাচ্ছিলেন। তাঁদের অবস্থা এতই খারাপ হয়ে পড়ল যে, তাঁর বাবাকে নিজের জমি বিক্রি করে দিয়ে অন্যের জমিতে মজুর খাটতে হয়েছিল। মারীয়ার বয়স যখন নয় বছর তখন তাঁর বাবা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মারীয়ার ভাইয়েরা, মা ও বোন যখন জমিতে কাজ করতেন তখন মারীয়া বাড়িতে থেকে ঘরবাড়ি পরিষ্কার, রান্না-বান্না, সেলাই ইত্যাদি করতেন ও ছোট বোনের যত্নও নিতেন। কষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁদের দিন অতিবাহিত হলেও তাঁদের পরিবারে সকলের মধ্যে দৃঢ় ভালোবাসার বন্ধন ছিল। ঈশ্বরের প্রতি তাঁদের ভালোবাসা ও বিশ্বাস গভীর ছিল।

তাদের পাশেই আলেক্সান্দ্রো নামে এক যুবক ও তার বাবা সেরেনেলি বাস করত। আলেক্সান্দ্রো জানত যে প্রতিদিন যখন মারীয়ার মা, বোন ও ভাইয়েরা কাজে যায় তখন মারীয়া ও তার ছোট বোন একা বাড়িতে থাকে। আলেক্সান্দ্রো প্রায় প্রায়ই মারীয়ার কাছে আসত ও তার খোঁজখবর রাখত। মারীয়াকে তার ভালো লাগত। যতই দিন যেতে লাগল মারীয়ার প্রতি তার আসক্তি ততই বৃদ্ধি পেতে লাগল। মারীয়া তা বুঝতে পেরেছিল এবং আলেক্সান্দ্রোর কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। মারীয়ার দিকে সে কামনার দৃষ্টিতে তাকাত। একদিন মারীয়াকে সে কুপ্রস্তাবও দিয়েছিল। মারীয়া তাকে বোঝাতে চেয়েছেন যে তাদের এমন ব্যবহার করা ঠিক নয়। একদিন মারীয়া বাড়িতে বসে সেলাই করছিলেন। তার ছোট বোন পাশে ঘুমাচ্ছিল। আলেক্সান্দ্রো মারীয়ার কাছে এসে তাকে কুপ্রস্তাব দিলো। সে তার কুমারীত্ব নষ্ট করতে চাইল। মারীয়া আলোক্সান্দ্রোকে প্রথমে ভালোভাবে বুঝাতে চাইলেন। কিন্তু আলোক্সান্দ্রো কিছুতেই তা মানতে চাইল না। সে জোর করে মারীয়াকে ভোগ করতে চাইল। মারীয়াও জোরপূর্বক নিজেকে রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি আলেক্সান্দ্রোকে পাপের ভয় দেখালেন। এমন ব্যবহারে ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হবেন, তাও বললেন। কিন্তু কিছুতেই আলেক্সান্দ্রো কোন বাধা মানল না। সে তবুও জোরপূর্বক মারীয়াকে ভোগ করতে চাইল। মারীয়া তাকে বললেন, তিনি মৃত্যুকে বরণ করে নেবেন তবুও নিজের পবিত্রতাকে নষ্ট হতে দেবেন না।

যখন আলেক্সান্দ্রো দেখল যে কিছুতেই সে মারীয়াকে বশে আনতে পারছে না, তখন সে ছুরিকা দিয়ে বার বার মারীয়াকে আঘাত করল এবং রক্তাক্ত মারীয়াকে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। মারীয়ার চিৎকার ও কান্না শুনে তার বোন কেঁদে উঠল। বাড়িতে চিৎকার ও কান্না শুনে মারীয়ার মা ও আলেক্সান্দ্রোর বাবা দৌড়ে এসে মারীয়াকে অজ্ঞান ও রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পেলেন এবং তাঁকে তাড়াতাড়ি কাছের হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। ডাক্তারগণ তৎক্ষণাৎ অস্ত্রোপচার করে মারীয়াকে বাঁচাতে চাইলেন, তাঁর জখম এত বেশি হয়েছিল যে তারা তেমন কিছু করতে পারলেন না। অস্ত্রোপচারের সময় মারীয়ার জ্ঞান ফিরে আসলে তিনি ডাক্তারদের অনুরোধ করলেন তাকে যেন সেভাবেই রেখে দেওয়া হয়। চব্বিশ ঘণ্টা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে মারীয়া মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। মৃত্যুর আগে তিনি আলেক্সান্দ্রোকে ক্ষমা করেন এবং প্রকাশ করেন যে আলেক্সান্দ্রোকেও তিনি তার সাথে স্বর্গে দেখতে চান।

মারীয়ার মৃত্যুর কয়েকদিন পরই আলেক্সান্দ্রো ধরা পড়ে ও তার ত্রিশ বছর কারাবাস হয়। সে স্বীকার করে যে সে মারীয়াকে ছুরিকাঘাত করলেও তার কুমারীত্ব নষ্ট করেনি। কারাগারে জীবনযাপন করতে করতে একজন বিশপের সহায়তায় ধীরে ধীরে তার মন পরিবর্তন হয়। একদিন সে স্বপ্নে দেখে যে মারীয়া তাকে সাদা লিলি ফুল উপহার দিয়েছেন।

ফুলগুলো হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো তার হাতের মধ্যেই পুড়ে যায়। কারাগার হতে মুক্তি পাবার পর আলেক্সান্দ্রো মারীয়ার মাকে দেখতে যান, যিনি তখনো বেঁচে ছিলেন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। মারীয়ার মা-ও আলেক্সান্দ্রোকে ক্ষমা করেন। মারীয়া মৃত্যুর পুর্বে যাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তাঁর মা-ও তাকে ক্ষমা করে দিলেন। তারা একসাথে খ্রীষ্টযাগে অংশগ্রহণ করলেন ও পবিত্র সাক্রামেন্ত গ্রহণ করেন।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে পোপ দ্বাদশ পিউস মারীয়া গরেটিকে সাধ্বী শ্রেণিভুক্ত করেন। তখন থেকে প্রতি বছর ৬ই জুলাই সাধ্বী মারীয়া গরেটির পর্ব পালন করা হয়। আলেক্সান্দ্রো মারীয়ার সাধ্বী শ্রেণিভুক্তিকরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল এবং মারীয়াকে "আমার ক্ষুদ্র সাধ্বী" বলে সম্বোধন করত ও তার কাছে প্রতিদিন প্রার্থনা করত। শেষ জীবনে আলেক্সান্দ্রো ব্রাদার হিসেবে কাপুচিনো সন্ন্যাস সংঘে যোগদান করে।

৩. ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা

ক্ষুদ্র পুষ্প তেরেজা ছিলেন মার্টিন লুইস ও জেলি মার্টিনের নবমতম ও শেষ সন্তান। তিনি ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি ফ্রান্সের এলেনকনে জন্মগ্রহণ করেন। চার বছর বয়সে তাঁর মা মারা যাবার পর তাঁর বাবা তাঁদেরকে লিজুঁতে নিয়ে আসেন। মাতৃহারা তেরেজার অনেক স্নেহযত্ন ও ভালোবাসার প্রয়োজন হলো। ফলে তাঁর বাবা ও দিদিরা তাঁকে অনেক ভালোবাসা ও আদর-যত্ন দিয়ে বড় করতে লাগলেন। পরিবারে তাঁর সব চাহিদাই মেটানো হতো। ১৪ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের বড়দিনের সময়ে তেরেজার মনের পরিবর্তন হয়। ঐ সময় থেকে শুধু নিজেকে খুশি রাখার পরিবর্তে তাঁর সমস্ত শক্তি ও সহানুভূতিশীলতা ভালোবাসায় পরিবর্তিত হতে লাগল। মাত্র ১৫ বছর বয়সে পোপের বিশেষ অনুমতি নিয়ে তাঁর সমগ্র জীবন ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করার উদ্দেশ্যে তিনি লিজুঁতে অবস্থিত কার্মেলাইট সমাজে প্রবেশ করেন এবং "শিশু যীশুর তেরেজা" নাম ধারণ করেন। কার্মেলাইটের বদ্ধ সমাজে তিনি নিভৃতে প্রার্থনার জীবনযাপন করেন এবং ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করার অনুগ্রহ লাভ করেন। ছোট বেলা হতেই বরাবর তিনি অসুস্থ ছিলেন। সন্ন্যাস জীবনে এসেও তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অসুস্থতা ও কষ্ট সবই তিনি ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করতেন।

আত্মজীবনীতে তেরেজা লিখে গেছেন, তাঁর জীবন ছিল ক্ষুদ্র প্রেমের পথ। সংঘবদ্ধ জীবনের নিয়মিত ব্যক্তিগত ও দলগত কাজ, প্রার্থনা ও ছোট-বড় অন্যান্য সবকিছুই তিনি ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করতেন। ঈশ্বরের অবিচল প্রেমের ওপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর প্রতিটি দিন অতিবাহিত করতেন। তিনি তাঁর জীবনে দেখিয়ে গেছেন, "জীবনে যা প্রয়োজনীয় তা কোনো বৃহৎ কাজ নয়, কিন্তু মহৎ ভালোবাসা।" শিশুরা যেমন যে ব্যক্তি বা বস্তু তাদের সামনে থাকে তাদের প্রতিই মনোযোগী হয়, তেরেজাও প্রতিজন ভগিনী ও তাঁর প্রতিটি কাজের প্রতি তেমনি মনোযোগী ছিলেন। প্রতিজন ব্যক্তি ও প্রতিটি বস্তুকে

২০২৫

ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখা ও ভালোবাসা নিয়ে তাদের যত্ন করার আধ্যাত্মিকতা তিনি আমাদের দেখিয়ে গেছেন। তাঁর আধ্যাত্মিকতা ছিল সাধারণ কাজ অসাধারণ ভালোবাসা নিয়ে করা।

প্রাকৃতিক ঋতুগুলোকে তিনি ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্কের সাথে তুলনা করে দেখতেন। তিনি ফুল খুব ভালোবাসতেন এবং নিজেকে ঈশ্বরের বাগানের একটি ছোট্ট ফুল হিসেবে দেখতেন। ফুল যেমন নিজের জীবন দিয়ে ঈশ্বরকে খুশি করে ও ঈশ্বরের গৌরব করে, তেমনি তিনিও তাঁর জীবনকে সেভাবে দেখতেন। কার্মেলের বাগানে অন্যান্য ভগিনীদের সাথে তিনি নিজেকে একটি ছোট্ট ফুল হিসেবে দেখতেন। সেজন্যে তাঁর নামের সাথে "ক্ষুদ্র পুষ্প" যুক্ত হয়েছে। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে পোপ একাদশ পিউস তাঁকে সাধ্বী বলে ঘোষণা করেন। ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর শততম মৃত্যুবার্ষিকীতে পোপ ২য় জনপল তাঁকে মণ্ডলীর আচার্য পদে ভূষিত করেন। মৃত্যুর পূর্বে ক্ষুদ্র পুষ্প তেরেজা বলে গেছেন,"আমার মৃত্যুর পর আমার প্রেরণ কাজ হবে ঈশ্বরকে ভালোবাসতে শিখানো। স্বর্গে থেকে আমি গোলাপ বর্ষণ করব ও পৃথিবীতে মঙ্গল কাজ করে যাব।"

৪. সাধু ম্যাক্সিমিলিয়ন কল্‌বে

ম্যাক্সিমিলিয়ন কল্‌বে ছিলেন পোলাণ্ডের একজন ফ্রান্সিসকান সন্ন্যাসব্রতী। যিনি ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট জার্মানির কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে একজন অপরিচিত ব্যক্তির জীবনের পরিবর্তে স্বেচ্ছায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর এই মহৎ কাজের জন্য জগতে বিখ্যাত হয়ে আছেন। পোপ ২য় জনপল ১০ই অক্টোবর ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে 'ভালোবাসার জন্য শহিদ' এবং 'বর্তমান কঠিন সময়ে আমাদের প্রতিপালক সাধু' বলে ঘোষণা দেন।

ম্যাক্সিমিলিয়ন ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে পোলান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। পোলান্ড তখন রাশিয়ার রাজ্যাধীন ছিল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাক্সিমিলিয়ন ও তাঁর ভাই সিদ্ধান্ত নেন যে, তাঁরা ফ্রান্সিসকান সন্ন্যাস সংঘে যোগদান করবেন। যেই সিদ্ধান্ত সেই কাজ। দুই ভাই মিলে রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সীমান্ত পার হয়ে লাউয়ায় ফ্রান্সিসকান সংঘে যোগদান করেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যাজকপদে অভিষিক্ত হন এবং প্রৈরিতিক কাজের জন্য নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পোলান্ডে ফিরে আসেন। তাঁর পৌরহিত্য জীবনকালে ১৯৩০-১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি বেশ কয়েকবার মিশনারীদের নিয়ে জাপান যান এবং সেখানে সন্ন্যাসীদের জন্য মঠ স্থাপন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তাঁর স্থাপনকৃত মঠটি আণবিক বোমার হাত থেকে রক্ষা পায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন তিনি ইহুদিসহ অনেক পোলান্ডবাসীদের আশ্রয় দেন। ইহুদিদের আশ্রয় দেওয়ার কারণে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই ফেব্রুয়ারি জার্মান গ্যাস্টাবো তাঁকে বন্দি করে এবং জার্মানির কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সে বৎসর জুলাই মাসে ক্যাম্প থেকে একজন পালিয়ে যাবার কারণে ক্যাম্পের জন পুরুষকে বাছাই করে নেওয়া হয় মেরে ফেলার জন্য যেন অন্য বন্দিগণ আর পালাতে সাহস না করে। সেই ১০ জন পুরুষের মধ্যে একজন পুরুষ তাঁর পরিবারের কথা স্মরণ করে জোরে জোরে কান্নাকাটি করে আফসোস করছিল, তাই দেখে ম্যাক্সিমিলিয়নের অনেক মায়া হলো। তিনি মনে মনে ভাবলেন আমি তো একজন পুরোহিত, আমার কোনো সংসার নেই, এই লোকটি একজন স্বামী, একজন পিতা। এই ভেবে তিনি স্বেচ্ছায় সেই লোকটির পরিবর্তে নিজে এগিয়ে গেলেন সেই ১০ জনের একজন হতে। এই ১০ জনকে আলাদা একটি কক্ষে কোনো খাদ্য ও পানীয় ছাড়া রাখা হলো, যেন তারা ক্ষুধার জ্বালায় ও তৃষ্ণায় ধুকে ধুকে মারা

যায়। এই সময়ে ম্যাক্সিমিলিয়ন সবাইকে নিয়ে প্রার্থনা ও গানের মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন। তিন সপ্তাহ পর তিনি এবং আরও তিনজন কোনো কিছু না খেয়ে, কোনো কিছু পান না করেও বেঁচে ছিলেন। শেষে তাদের মেরে ফেলা হয়।

কাজঃ কয়েকজন খ্রীষ্টবিশ্বাসে সবল ব্যক্তির ছবি দেখে, তাঁদের গুণাবলিগুলোর তালিকা প্রস্তুত কর ও তা সকলের জন্য উপস্থাপন করো।

বর্তমানে আমাদের করণীয় :

তুমি চোখ মেলে চাও, হৃদয়মন খুলে দাও।

তুমি যখন মন খুলে দাও, তখন হৃদয়টাও খুলে দাও।

তুমি যখন হৃদয়টা খুলে দাও, তখন বাস কর মর্যাদা নিয়ে।

তুমি যখন মর্যাদা নিয়ে বাস কর, তখন ঐশ জীবন সহভাগিতা করো।

তুমি যখন ঐশ জীবন সহভাগিতা করো, তখন ভালোবাসার সমাজ গড়ে তুলতে পারো।

তুমি যখন ভালোবাসার সমাজ গড়ে তোল, তখন অনন্তকালে প্রবেশ করো।

তুমি যখন অনন্তকালে প্রবেশ কর, তখন কোন কিছুই তোমার ক্ষতি করতে পারে না।

যখন কোন কিছুই তোমার ক্ষতি করতে পারে না, তখন তুমি চিরকাল জীবিতই থাকবে,

এমনকি এখনো, এই বর্তমান মুহূর্তেও। ('একদা এশিয়া' থেকে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা ৫৭)

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতা দূর করতে আমাদের কিসের প্রয়োজন?

ক. ক্ষমার

খ. বন্ধুত্বের

গ. বিশ্বাসের

ঘ. ভালোবাসার

২. যীশুর কথা অনুসারে বিশ্বাসী ইহুদিরা কীভাবে তাঁর যথার্থ শিষ্য হয়ে উঠবে?

ক. সত্য জেনে

খ. যীশুর দাসত্ব করে

গ. যীশুর বাণীর প্রতি বিশ্বস্ত থেকে

ঘ. সকল কাজে সক্রিয় হয়ে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

আপন কাকাতো ভাই অনিল খুব নীতিবান হলেও সুনীল দুশ্চরিত্রের লোকদের সাথে চলে। অনিল তাকে প্রত্যাখান করে বলে সুনীল খারাপ লোকদের দিয়ে অনিলকে খুব আঘাত করেন। অনিল হাসপাতালে কষ্ট পেলেও সুনীলের কাছ থেকে পাওয়া কষ্ট ভুলে যান।

৩. **অনিলের চরিত্রে পাঠ্যপুস্তকের কার চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়?**

ক. সাধু পিতর

খ. সাধু স্তিফানের

গ. সাধ্বী মারীয়া গরেটি

ঘ. সাধু পল

৪. **অনিলের নিকট থেকে সুনীল পেয়েছিলেন–**

i. সাহায্য

ii. ক্ষমা

iii. ভালোবাসা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. নিঃসঙ্গতা বলতে কী বুঝ?

২. সম্প্রীতি বজায় রেখে চলতে হয় কেন?

৩. বন্ধুত্ব কী, বুঝিয়ে লেখ?

৪. স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়?

৫. অন্যের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হয় কেন?

৬. পবিত্রতা বলতে কী বোঝায়?

৭. ব্যক্তি জীবনে পবিত্রতার গুরুত্ব কী?

২০২৫

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. কণা ও বীনা দুইজন সহপাঠী। কণা লেখাপড়ার পাশাপাশি অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে অনেক মিলেমিশে চলে, শিক্ষকদের অনেক সম্মান করে, স্কুলের সহপাঠক্রমিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়। সর্বোপরি কণা তার ভালো আচরণ দিয়ে সবার কাছে খুবই প্রিয়। অপরদিকে বীনাও মেধাবী শিক্ষার্থী বটে কিন্তু সে সহপাঠীদের সঙ্গে চলাফেরা করে না, তার সুখ-দুঃখগুলো কারো সাথে সহভাগিতা করে না। হাসি খুশি থাকে না। সেজন্য বীনা অনেক সময়ই মানসিকভাবে অসুস্থ থাকে।

ক. প্রতিটি মানুষ কার প্রতিমূর্তিতে তৈরি?

খ. বন্ধুত্ব গড়া প্রয়োজন কেন? বর্ণনা করো।

গ. কণা কী ধরনের জীবন যাপন করে তা তোমার পাঠের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. বীনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সে কী ধরনের ফলাফল ভোগ করতে পারে বলে তুমি মনে কর? তোমার মতামত তুলে ধরো।

২. জ্যোতি এবং রমেন একটি ফার্মে কাজ করেন। জ্যোতি রমেনের চেয়ে বয়সে বড়। রমেন বয়সে ছোট হলেও তার দক্ষতা ও যোগ্যতা অনেক বেশি। তাদের ফার্মে জেনারেল ম্যানেজার পদটি শূন্য হলে কর্তৃপক্ষ রমেনকে ঐ পদে নিয়োগ দেন, যা জ্যোতি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেননি। রমেনকে সহযোগিতা না করে বরং তিনি তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালান ও বিভিন্ন কুৎসা রটান। গুরুতর অসুস্থাবস্থায় জ্যোতি বেশ কয়েক দিন যাবত অফিসে আসছেন না দেখে রমেন তাকে হাসপাতালে দেখতে যান এবং তার খোঁজখবর নেন। তাছাড়া পরিবারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। রমেনের এ মহৎ কাজ দেখে জ্যোতি রমেনের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন।

ক. কোথায় সাধু পলের জন্ম হয়?

খ. সাধু পল খ্রীষ্টানদের ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন কেন?

গ. সাধু পলের আচরণের কোন দিকটি জ্যোতির মধ্যে ফুটে উঠেছে—ব্যাখ্যা করো।

ঘ. রমেন যেন যীশুর প্রতিনিধি হয়েই কাজ করছে– উক্তিটির সাথে তুমি কি একমত? তোমার মতামত তুলে ধরো।

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনতায় বেড়ে ওঠা

মানুষ সামাজিক জীব। সে একা থাকার জন্য সৃষ্ট হয়নি। তাই কোনো মানুষই বেশি দিন একা একা বাস করতে পারে না। তাকে বাস করতে হয় সমাজে। সমাজে বাস করা তার জন্য কখনো বোঝাস্বরূপ হয় না বরং আনন্দদায়কই হয়। এটি মানব স্বভাবের একটি প্রয়োজনীয় দিক। অন্যদের সাথে মেলামেশা, আদান-প্রদান, পরস্পরের সেবা করা ও ভাবের আদান-প্রদান ও সংলাপ–এসবের মধ্য দিয়ে মানুষ তার সম্ভাবনার বিকাশ ঘটায়। আর এভাবেই সে তার মানুষ হওয়ার আহ্বানে সাড়া দেয়।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পরিপক্ব মানুষ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করতে পারব;
- স্বাধীনতায় বেড়ে ওঠার পথে খ্রিষ্টীয় আদর্শের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব এবং
- সামাজিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে খ্রিষ্টীয় পরিপক্বতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ হবো।

সমাজ সচেতনতা

সমাজ হলো মানুষের একটি দল বা গোষ্ঠী। এর সকল সদস্য এমন একটি মিলন-নীতির দ্বারা সংগঠিত যা ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে। অর্থাৎ মানবসমাজ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত। মানবসমাজের দুইটি দিক রয়েছে: একটি দৃশ্যমান ও অন্যটি আধ্যাত্মিক। দৃশ্যমান দিকটি হলো সকলের একত্রিত হওয়া ও বিপদে-আপদে একে অন্যের পাশে দাঁড়ানো; মানবজীবনের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ঘটনাসমূহে দৃশ্যমান ও নৈতিক সমর্থন দান করা। আধ্যাত্মিক দিকটি হলো সমগ্র অতীতের ওপর ভিত্তি করে ও ভবিষ্যতের জন্য সদস্যদের প্রস্তুত করে যুগ যুগ ধরে মানবসমাজ টিকিয়ে রাখা। সমাজের মধ্য দিয়েই প্রতিটি মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রে নিজে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিশেষ বিশেষ আধ্যাত্মিক গুণ লাভ করে, যা তার অনন্যতাকে প্রকাশ করে ও দিনে দিনে বিশেষ একজন ব্যক্তি হিসেবে বেড়ে ওঠে। সে যে-সমাজের অংশ সে-সমাজের কাছে তার আনুগত্য প্রকাশ করে ও সকলের মঙ্গল সাধন করার জন্য নিজেকে নিয়োগ করে।

সমাজের সদস্য হিসেবে সমাজ আমাদেরকে রক্ষা করে ও নিরাপত্তা দেয়। সমাজের বিভিন্ন নিয়মকানুন আমাদের মেনে চলতে হয়। একই সাথে সমাজকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদেরই কর্তব্য। রিচার্ড ব্যাচ-এর লেখা যোনাথন লিভিংস্টোন গাংচিলের গল্পটি থেকে আমরা সমাজের সকলের সাথে বাস করেও আমাদের ব্যক্তিস্বাধীনতায় বেড়ে ওঠার বিষয়ে ধারণা লাভ করতে পারব। যোনাথন লিভিংস্টোন নামে একটি গাংচিল ছিল। সে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় উড়তে শেখার ঝুঁকি গ্রহণ করেছিল আর সে তাতে সক্ষমও হয়েছিল। এভাবে তার জীবনে উন্নতি হয়েছিল। তার সঙ্গীসাথী অন্য গাংচিলেরা কখনো

চিন্তাও করেনি যে এসব নতুন নতুন ভঙ্গিমায় উড়তে পারা সম্ভব। যোনাথন নামের এই গাংচিলটি তাই সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়েছিল। সে তার নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা অন্যদের সাথে সহভাগিতা করতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা তা শুনতে চায়নি; বরং তারা বলেছে, এটা যোনাথনের পাগলামি। এই বলে তারা তাকে নিরুৎসাহিত ও অপমান করেছে।

বেশির ভাগ গাংচিলই শুধু খেয়েদেয়ে বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু উড়া প্রয়োজন ততটুকুই উড়তে শিখত। তারা তীর থেকে উড়ে সমুদ্রের কিছু ভিতরে গিয়ে খাবার সংগ্রহ করে আবার তীরে ফিরে আসত। এটুকুই ছিল জীবনের প্রয়োজনে তাদের ওড়ার প্রয়োজন। এর জন্য তারা যে যে কৌশল জানা প্রয়োজন শুধু সেগুলোই তারা শিখত। এটুকু করেই তারা সন্তুষ্ট থাকত। এর চাইতে বেশি কিছু জানার ব্যাপারে তারা মাথা ঘামাত না। তারা বলত, আমাদের দরকার খেয়েদেয়ে বেঁচে থাকা, এর চাইতে বেশি খাটাখাটনি করে কী লাভ? তাই খাবার সংগ্রহ করাটাই তাদের কাছে প্রধান ছিল। কিন্তু যোনাথন লিভিংস্টোন নামের ঐ গাংচিলটির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এর চাইতে বহু উর্ধ্বে। তার বেলায় খাবার সংগ্রহের ব্যাপারটিই প্রধান ছিল না। তার কাছে প্রধান ছিল দূর আকাশে বিচিত্র ভঙ্গিমায় উড়তে পারা। সে অন্য সবকিছুর চাইতে উড়তে খুবই ভালোবাসত। সে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খুব ভালোবাসত। সে জানত, অন্য গাংচিলরা তার এ ধরনের চিন্তা মোটেই পছন্দ করত না।

একদিন হঠাৎ করে গাংচিলদের নেতা উচ্চৈঃস্বরে বললেন, 'যোনাথন লিভিংস্টোন গাংচিল! তুমি সবার মাঝখানে এসে দাঁড়াও!' সবার মাঝখানে? সবার মাঝখানে দাঁড়ানোর অর্থ হয় সবচেয়ে বেশি লজ্জার ব্যাপার না হয় সবচেয়ে বেশি সম্মানের ব্যাপার। কিন্তু যোনাথনকে কেন সবার মাঝখানে দাঁড়াতে বলা হচ্ছে?

নেতার কণ্ঠস্বর আবার গর্জে উঠল: "যোনাথন লিভিংস্টোন গাংচিল, সব গাংচিল সমাজের দৃষ্টিতে যা লজ্জাকর কাজ তুমি তা-ই করেছ! তার জন্য তুমি সকলের মাঝখানে এসে দাঁড়াও!"

যোনাথনের মাথায় যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত হলো! তার হাঁটু দুইটি থরথর করে কাঁপতে লাগল আর পাখাগুলোও যেন দুর্বল হয়ে নিচের দিকে ঝুলে পড়তে লাগল। তার কানে বার বার নেতার সেই বজ্রকণ্ঠ বাজতে লাগল। সে ভাবতে লাগল, "লজ্জা পাবার জন্য মাঝখানে এসে দাঁড়াব! লজ্জা পাবার মতো কী কাজ আমি করেছি। আসলে তারা আমার জীবনের উদ্দেশ্যটাই বুঝতে পারেনি। বরং তারা আমাকে ভুল বুঝেছে।"

ঠিক সেই মুহূর্তে নেতার কণ্ঠস্বর আবার ধ্বনিত হলো: "তোমার দায়িত্বহীন কাজের জন্য তোমাকে আজ সবার কাছ থেকে লজ্জা পেতেই হবে। কারণ তুমি গাংচিল পরিবারের মর্যাদা ও ঐতিহ্য ধুলায় লুণ্ঠিত করেছ।"

যোনাথন ভাবতে লাগল: "হায়রে কপাল! আজ লজ্জা পাবার জন্য সবার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতে হবে? হয়তো আজ আমাকে সমাজচ্যুত করা হবে, হয়তো আমাকে দূরে কোথাও অন্য কোনো দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হবে!"

নেতা বললেন, "যোনাথন লিভিংস্টোন গাংচিল, একদিন তুমি বুঝতে পারবে যে আমাদের সমাজে দায়িত্বহীন কাজের কোনো মূল্য নেই। কারণ আমরা জীবন সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না, তাকে পুরোপুরি জানাও সম্ভব নয়। আমরা শুধু জানি, এই পৃথিবীতে আমাদের পাঠানো হয়েছে খেয়েদেয়ে বেঁচে থাকতে এবং এভাবেই যতদিন বাঁচা যায়!"

গাংচিলদের কেউই তাদের দলের মহাসভার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলে না। কিন্তু যোনাথন আজ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে উঠল: "দায়িত্বহীনতা? কী দায়িত্বহীনতার কাজ আমি করেছি? আমার ভাইয়েরা, কে বেশি দায়িত্বশীল? যে নাকি জীবনের একটা উচ্চতর উদ্দেশ্যের সন্ধান পেয়েছে আর সেই উচ্চতর উদ্দেশ্যের জন্য জীবনযাপন করছে সে নয় কি? হাজার হাজার বছর ধরে আমরা কেবল মাছের মাথাই তো খুঁজে বেড়িয়েছি। কিন্তু আজ আমরা বেঁচে থাকার একটা মহৎ উদ্দেশ্যের সন্ধান পেয়েছি। আজ আমরা নতুন কিছু শিখতে পারছি, নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারছি আর এভাবে আমরা মুক্ত গাংচিলে পরিণত হচ্ছি! এটাই কি আমাদের জন্য বেশি দায়িত্বশীলতার ব্যাপার নয়? আপনার কাছে একটা বিনীত অনুরোধ করি, আমাকে একটিবার সুযোগ দিন, আমি আপনাদের সামনে দেখাব আমি কীসের সন্ধান পেয়েছি!"

কিন্তু ততক্ষণে মহাসভায় উপস্থিত গাংচিলদের ধৈর্যের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। তারা একসাথে সবাই বলে উঠল, "আজ থেকে তুমি আমাদের ভাই নও! তুমি আমাদের গাংচিল সমাজের কেউ নও।" এই বলে তারা তাদের কান চেপে ধরল যেন যোনাথনের কথা আর শুনতে না হয়। তারা যোনাথনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

> কাজ : দলে আলোচনা করো : যোনাথন তার জীবন নিয়ে কী করতে চাইল? তার প্রতি গাংচিলদের নেতার ও অন্যান্য গাংচিলদের ব্যবহার কেমন ছিল? তাদের ব্যবহার যোনাথনের ওপর কী প্রভাব ফেলল? দায়িত্বশীলতা সম্বন্ধে যোনাথনের ধারণা কী ছিল? যোনাথনের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও স্বাধীনতা সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

এখন আমরা ভেবে দেখি মানুষ কীভাবে তাদের স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীলতা কাজে লাগায়। মার্টিন লুথার কিং আমেরিকার ইতিহাসে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তিনি আমেরিকাতে কৃষ্ণাঙ্গ জাতির অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। তাঁর জীবনের একটি ঘটনা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি। "জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে এক রাতে, সারাদিনের অধিক পরিশ্রমের পর আমি গভীর রাতে বিছানায় গেলাম। আমার স্ত্রী করেত্তা ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমিও প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছি, এমন সময় টেলিফোনটি বেজে উঠল।"

রাগান্বিত কণ্ঠে একজন বলে উঠল, "শোন, তোমার কাছ থেকে যা নেবার আমরা তা নিয়ে নিয়েছি, সপ্তাহ শেষ হবার আগেই তুমি হায় হায় করবে।" আমি টেলিফোনটি রেখে দিলাম কিন্তু কিছুতেই ঘুমাতে পারলাম না। মনে হচ্ছিল আমার সমস্ত ভয় আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরেছে। আমি যেন এক কোণায় থেমে গেছি। আমি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম এবং ঘরময় পায়চারি করতে লাগলাম। অবশেষে আমি রান্নাঘরে গিয়ে এক কাপ কফি গরম করে নিলাম। প্রায় হাল ছেড়েই দিলাম। কফির কাপ টেবিলের উপর রেখে দিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম কী করে আমি নিজেকে কাপুরুষ হিসেবে না দেখিয়ে এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারি।

এই ক্লান্ত-অবসন্ন অবস্থায় যখন আমার সমস্ত সাহস নিঃশেষ হয়ে আসছিল, আমি স্থির করেছিলাম, আমি আমার সমস্যাটি ঈশ্বরের নিকট তুলে ধরব। হাতের মধ্যে আমার মাথাটি রেখে আমি রান্নাঘরের টেবিলের উপরেই নত হলাম এবং উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করতে লাগলাম। সেদিন মধ্যরাতে আমি ঈশ্বরের

কাছে যে প্রার্থনা করেছিলাম তা এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে। প্রার্থনায় আমি বলেছিলাম: "আমি যা ন্যায্য তারই পক্ষ নিয়েছি। এখন আমি ভীত। জনগণ আমার দিকে তাকিয়ে আছে, আমি যেন তাদের নেতৃত্ব দেই। এই মুহূর্তে যদি আমি কোন শক্তি ও সাহস ছাড়া তাদের সামনে দাঁড়াই, তারা একেবারে ভেঙে পড়বে। আমার নিজের সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমার আর কিছুই নেই। আমি এমন এক পর্যায়ে এসেছি, যেখান থেকে আমি একা বাস্তবতার মুখোমুখি হতে পারছি না।" সেই মুহূর্তে আমি এক তীব্র ঐশ্বরিক শক্তির অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করলাম। ঈশ্বরকে আমি ইতিপূর্বে কোনোদিন এমনভাবে উপলব্ধি করিনি।

কাজ: ১. মার্টিন লুথার কিং-এর জীবনের এই অভিজ্ঞতার আলোকে এবার তোমরা তোমাদের নিজেদের জীবনে ঈশ্বরের শক্তির অভিজ্ঞতা কেমন তা চিন্তা করে বের করো।

২. একই সাথে তোমার সমাজে বা এলাকায়, দেশ ও বিশ্বে বিভিন্ন অন্যায্য অবস্থা ও পরিস্থিতিতে মানুষ কীভাবে অন্য মানুষকে ঠকাচ্ছে, প্রতারণা করছে, কীভাবে নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটছে তা দলে সহভাগিতা করো। এক্ষেত্রে তোমার দায়িত্ব কী তা-ও সহভাগিতা করো।

পরিপক্ক মানুষ হওয়া

মানুষের আহ্বানের পরিপূর্ণতার জন্য সমাজ অপরিহার্য। এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে মানুষকে মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে হবে, যা দৈহিক ও প্রবৃত্তিজাত প্রবণতাগুলোকে অভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক প্রবণতার অধীন করে রাখে। মানুষ ও মানবসমাজ প্রথমত আত্মিক জগতের সাথে সম্পৃক্ত। আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়ে, সত্যের উজ্জ্বল আলোতে মানুষ তার নিজেকে ও তার জ্ঞান ও গুণসমূহ সহভাগিতা করে, তাদের অধিকার বাস্তবায়নে ও তাদের দায়িত্বকর্তব্য পালন করতে সক্ষম হয় এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সন্ধান করতে অনুপ্রাণিত হয়। জীবনে যা-কিছু সুন্দর তা থেকে খাঁটি আনন্দ লাভ করতে সক্ষম হয়। একজন পরিপক্ক মানুষ তার ধর্মবিশ্বাসকে এবং তার আপন সর্বোত্তম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলোকে অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য উৎসাহী হয়। একই সাথে অন্যদের দ্বারা অর্জিত সাফল্যগুলো উৎসাহের সঙ্গে নিজের করে গ্রহণ করতে নিজেকে উন্মুক্ত রাখে। একজন পরিপক্ক মানুষের আধ্যাত্মিকতার বিকাশ শুধু তার ব্যক্তি জীবনের ওপরেই প্রভাব ফেলে না, সেই প্রভাব তার ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক–অর্থাৎ তার সামগ্রিক জীবনের ওপর পড়ে।

মানব ব্যক্তি ও মানবসমাজের মধ্যে রয়েছে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তাই মানব সমাজে একজন ব্যক্তিকে তার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের বিকাশ সাধন করে পরিপক্ক মানুষ হয়ে গড়ে ওঠা আবশ্যক, যাতে সামাজিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়। সমাজে পরিবর্তন আনার পূর্বে প্রথমে আমাদের নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। নিজের ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীলতার অর্থ হলো নিজের জীবনে ও সমাজে যা কিছু ভালো তা মূল্যায়ন করা, বেছে নিতে পারা ও ধরে রাখা এবং যা কিছু মন্দ তা ত্যাগ করা। স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীলতা একে অপরের বিপরীত নয়; বরং তারা পরস্পরের সহায়ক ও পরিপূরক। দুইটাকেই ব্যক্তির ও সমাজের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতে হবে। দায়িত্বশীল হতে হলে প্রথমেই যে সমাজ ও বিশ্বে আমরা বাস করছি, তাকে জানতে ও বুঝতে হবে। যে জনগণের মাঝে আমরা বাস করছি, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা কী, তাদের কষ্ট-যন্ত্রণা ও সমস্যাগুলি কী তা জানতে ও বুঝতে হবে। দায়িত্বশীলতার অর্থ শুধু সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করা নয়, বরং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি ও আমরা কী করতে পারি সে বিষয় নিয়েও আলোচনা করা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া। এবার আমরা সচেতনতা সম্পর্কে একটা গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত কিছু অংশ পাঠ করি।

"অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বর্তমানে সচেতনতা সবচেয়ে বেশি দরকার। এই সচেতনতা হচ্ছে বর্তমান বিশ্বে বসবাসরত আমাদের জন্য দ্রুতগামী প্রযুক্তি ও সম্পদের প্রতি আমাদের লোভলালসা যে বিপদ ডেকে আনতে পারে সেই বিষয়ের প্রতি। এছাড়াও আমাদের সম্ভাবনাসমূহের উপর ক্রমবর্ধমান সচেতনতা আনা দরকার। আমাদের ভেবে দেখতে হবে কীভাবে আমরা আমাদের ও যে বিশ্বে আমরা বসবাস করছি সেই বিশ্বের কল্যাণের জন্য এই সম্ভাবনাগুলোকে ব্যবহার করতে পারি এবং তা যেন করতে পারি পরিবেশের কোন রকম ক্ষতি না করে।

বর্তমান সময়টি আমাদের ভবিষ্যৎকে নির্ধারণ করবে। আগামী অন্তত দশটি বছর পার না হলে আমরা বুঝতে পারব না আমরা এই কাজে সফল হয়েছি কিনা। এই কারণে প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের চোখ-কান খোলা রাখতে হবে এবং আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো আনন্দের সাথে পালন করে বাস্তবতার মোকাবিলা করতে হবে। এভাবেই আমরা হয়তো সফলতার মুখ একদিন দেখতে পাব।

মানুষের কয়েকটা মহৎ গুণ হচ্ছে আত্মত্যাগ, সংবেদনশীলতা, সাহস, সৃজনশীলতা। এই গুণগুলোর বিকাশ ঘটিয়ে আমরা আমাদের পরিবেশ দূষণ, বৈষম্য, দারিদ্র্য ইত্যাদি দিকগুলো জয় করতে হবে। আমাদের আরও দেখতে হবে:

ক. আমাদের দেশের সকল ছেলেমেয়ে যেন স্কুলে যেতে পারে,

খ. শিক্ষার মান যেন উন্নত হয়,

গ. সকলের মধ্যে সহনশীলতা যেন বৃদ্ধি পায়,

ঘ. রাজনীতি যেন মানুষের মঙ্গলের জন্য হয়,

ঙ. সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে যেন উন্নতি ঘটে,

চ. ব্যবসা-বাণিজ্যে মানুষ যেন সৎ হয়

ছ. সর্বত্র যেন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

কাজ: বর্তমান শিক্ষার্থী হিসেবে তোমাদের সামনের বাধাগুলো কীভাবে মোকাবেলা করা যায় তা দলে সকলের সাথে আলোচনা কর ও পোস্টার পেপারের মাধ্যমে উপস্থাপন করো।

খ্রীষ্ট আমার আদর্শ

মানুষ যখন অন্তরে স্বাধীনতা অর্জন করে তখনই সে দায়িত্বশীল হতে পারে। স্বাধীনতা মানুষকে দায়িত্ব-কর্তব্য অর্পণ করে এবং তখন সে এগুলো স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করে। আমরা যেসব কাজ করি, সেগুলোর দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করার সামর্থ্যের ভিত্তি হলো স্বেচ্ছায় ও উন্মুক্ত হৃদয়ে ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি সাড়া দান। এই ধরনের সাড়াদানের দৃষ্টান্ত যীশুর পুরোটা জীবনেই আমরা দেখতে পাই। যীশু তাঁর সমগ্র জীবন ধরেই পিতার ইচ্ছা পালন করেছেন। তাঁর জীবনের সকল কাজে আমরা দেখতে পাই তিনি সর্বদাই পিতার পরিকল্পনা মেনে নিয়েছেন এবং তাঁর চারপাশের মানুষের ও সমগ্র সৃষ্টির মঙ্গলের কথা ভেবে সব কাজ করেছেন। যোহন লিখিত মঙ্গল সমাচারের ৮ অধ্যায়ের ২১ থেকে ৩০ পদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, যীশু বলেছেন, যেসব কাজে তাঁর পিতা ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন, তিনি সর্বদা তা-ই করে থাকেন।

তাঁর অনুসারীদের সামনে তিনি এই আদর্শ তুলে ধরেছেন: "তোমরা যদি আমার বাণী পালনে নিষ্ঠাবান থাকো, তাহলেই তো তোমরা আমার যথার্থ শিষ্য; তাহলেই তো সত্যকে তোমরা জানতে পারবে আর সত্য তোমাদের স্বাধীন করে দেবে" (যোহন ৮ঃ ৩১-৩২)।

ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি প্রকাশ করা ও পিতার একমাত্র পুত্রের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হওয়া মানবজাতির এক বিশেষ আহ্বান। এই আহ্বানের প্রকাশ ঘটে ব্যক্তিগত জীবনে কারণ আমরা প্রত্যেকেই ঐশ্বরিক সুখময় জীবনে প্রবেশ করার আহ্বান পেয়েছি। এটা আবার সামগ্রিকভাবে গোটা মানবজাতিরও আহ্বান। "বিশ্বসৃষ্টি ব্যাকুল প্রত্যাশা নিয়ে প্রতীক্ষায় রয়েছে, পরমেশ্বর কবে তাঁর সন্তানদের সেই মহিমার অলৌকিক প্রকাশ ঘটাবেন।" (রোমীয় ৮ঃ১৯)।

মানুষের পরস্পর সম্পর্কের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার অনুশীলন ঘটে। ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতিগত অধিকার রয়েছে স্বাধীন ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিরূপে স্বীকৃতি পাওয়ার। একে অন্যকে সম্মান করা সকলের কর্তব্য। স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার, বিশেষত নৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে, মানব ব্যক্তির মর্যাদার একটি অপরিহার্য দাবি। "তোমার ঈশ্বর স্বয়ং প্রভু যিনি, তাঁকে তুমি ভালোবাসবে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আর তোমার সমস্ত মন দিয়ে। আর তোমার প্রতিবেশীকেও তুমি নিজের মতোই ভালোবাসবে।" (লুক ১০:২৭)।

স্বাধীনতায় বেড়ে ওঠার অর্থ হলো দায়িত্বশীল হওয়া। আর দায়িত্বশীল হওয়ার অর্থ হলো বিশ্ব, সমাজ ও আমার প্রতিবেশীদের সম্পর্কে সচেতন হওয়া। যাদের সাথে আমি বাস করি সেসব মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা, সমস্যা, কষ্টভোগ ইত্যাদি সম্পর্কে আমাকে সচেতন হতে হবে। সচেতন হওয়ার অর্থ শুধু অভাবী মানুষের সম্পর্কে বক্তব্য দেওয়াই নয়; বরং তাদের সম্পর্কে কিছু করা। নিচের অংশটুকু পাঠ করলে দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে স্বাধীনতায় বেড়ে ওঠার বিষয়ে আমরা খ্রিষ্টের শিক্ষা সম্পর্কে আরও স্পষ্ট হতে পারব।

"মানবপুত্র যখন আপন মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে আসবে—আর তার সঙ্গে আসবে সমস্ত স্বর্গদূত— সে তখন নিজের গৌরবের সিংহাসনে এসেই বসবে এবং তার সামনে তখন সকল জাতির মানুষকে সমবেত করা হবে। মেষপালক যেমন ছাগ থেকে মেষদের পৃথক করে নেয়, তেমনি সেও মানুষ থেকে মানুষকে পৃথক করে নেবে। মেষগুলোকে সে রাখবে তার ডান পাশে, আর ছাগলগুলোকে বাঁ পাশে। তারপর ডান পাশে যারা আছে, এই রাজা তাদের বলবেঃ 'এসো তোমরা, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যারা! জগতের সৃষ্টির সময় থেকে যে-রাজ্য তোমাদের দেওয়া হবে বলে রাখা আছে, তা এবার তোমরা নিজেদেরই বলে গ্রহণ করো। কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে জল দিয়েছিলে; বিদেশি ছিলাম, দিয়েছিলে আশ্রয়ঃ ছিলাম বস্ত্রহীন, তোমরা আমাকে পোশাক পরিয়েছিলে; আমি পীড়িত ছিলাম, তোমরা আমার যত্ন নিয়েছিলে; ছিলাম কারারুদ্ধ আর তোমরা আমাকে দেখতে এসেছিলে।' তখন ধার্মিকেরা উত্তরে তাকে বলবেঃ 'প্রভু' কখন আমরা আপনাকে ক্ষুধার্ত দেখে খেতে দিয়েছিলাম, কিংবা তৃষ্ণার্ত দেখে জল দিয়েছিলাম? কখন আপনাকে বিদেশি দেখে দিয়েছিলাম আশ্রয়, কিংবা বস্ত্রহীন দেখে পরিয়েছিলাম পোশাক? কখনই বা আপনাকে পীড়িত বা কারারুদ্ধ দেখে আপনাকে দেখতে গিয়েছিলাম?' রাজা তখন তাদের এই উত্তর দেবেঃ 'আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আমার এই তুচ্ছতম ভাইদের একজনেরও জন্যে তোমরা যা-কিছু করেছ, তা আমারই জন্যে করেছ।'

তারপর যারা তার বাঁ পাশে আছে, সে তাদের বলবেঃ 'আমার সামনে থেকে দূর হও তোমরা, অভিশাপের পাত্র যারা! শয়তান ও তার দলের যত অপদূতের জন্যে যে শাশ্বত আগুন প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, তোমরা সেই আগুনে যাও। কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দাওনি; আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম,

২০২৫

আমাকে জল দাওনি: বিদেশি ছিলাম, তোমরা আশ্রয় দাওনি; ছিলাম বস্ত্রহীন তোমরা আমাকে পোশাক পরাওনি। পীড়িত ও কারারুদ্ধ ছিলাম, আর তোমরা আমার যত্ন নাওনি।' তখন উত্তরে তারাও বলবে: 'প্রভু কখন আমরা আপনাকে ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত, বিদেশি বা বস্ত্রহীন, পীড়িত বা কারারুদ্ধ দেখেও আপনার সেবা করিনি? তখন সে তাদের এই উত্তর দেবে: 'আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এই তুচ্ছতম মানুষদের একজনেরও জন্যে তোমরা যা-কিছু করনি, তা আমারই জন্যে করনি।' তখন এরা যাবে শাশ্বত দণ্ডলোকে এবং ধার্মিকেরা যাবে শাশ্বত জীবনলোকে।

কাজ : চার্টের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন দায়িত্বসমূহের একটা তালিকা উপস্থাপন করো। বিভিন্ন পেশার নাম উল্লেখ করো। ঐ পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিটি দায়িত্ব পালন করার সুফল এবং পালন না করার ফলে সৃষ্ট সমস্যা নিয়ে আলোচনা করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মানব সমাজ কাদের সমন্বয়ে গঠিত?

ক. পুরুষদের

খ. ব্যক্তিবর্গের

গ. শিক্ষিতদের

ঘ. নারীদের

২. আমরা দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান থাকব। কারণ–

ক. যীশুর যথার্থ শিষ্য হবো

খ. সমাজে প্রতিষ্ঠা পাব

গ. গুরুজনের স্নেহভাজন হবো

ঘ. বন্ধুদের সঙ্গ পাব

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

অপুর মা বাবা খুবই গরিব। তারপরও অপু স্বপ্ন দেখে ডাক্তার হবার। সে নিয়মিত স্কুলে যায়, মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করে। লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে কাজও করে। নিজের প্রচেষ্টায় সে সমাজে নামকরা একজন ডাক্তার হয়। ধীরে ধীরে তার এলাকায় বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, নৈশ বিদ্যালয় এবং ফ্রি চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। অপুর কাজে সকলেই খুব খুশি।

৩. অপুকে কোন ধরনের মানুষ বলা যায়?

- ক. পরিপক্ক
- খ. সমাজ সচেতন
- গ. আদর্শবান
- ঘ. আনুগত্যশীল

৪. অপুর কাজের ফলে –

- i. সমাজের উন্নতি হবে
- ii. অন্যদের আগ্রহ বাড়বে
- iii. শিক্ষার হার বাড়বে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- খ. ii
- গ. i ও ii
- ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনের অর্থ ব্যাখ্যা করো।

২. কীভাবে আমরা দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পরিপক্ব মানুষ হয়ে উঠতে পারি?

৩. কীভাবে আমরা সমাজ সচেতন হয়ে উঠতে পারি?

৪. গাংচিলের গল্প থেকে তুমি কী শিক্ষা পেলে? ব্যাখ্যা দাও।

৫. মার্টিন লুথার কিং-এর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কী শিক্ষা পেলে? ব্যাখ্যা দাও।

৬. দায়িত্বহীনতার কোনো মূল্য নেই বলতে কী বোঝায়?

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বিভাস সুন্দরপুর উপজেলার মেম্বার। তিনি প্রতিদিনই প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠ করেন। নিয়মিত গির্জায় যান। তিনি গ্রামকে খুব ভালোবাসেন, তাই গ্রামের লোকদের উন্নতির জন্য স্কুল, রাস্তা সংস্কার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, দরিদ্রের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র ও কুটির শিল্পের ব্যবস্থা করেছেন। গ্রামে কোনো সমস্যা হলে তিনি সাহসের

সঙ্গে মোকাবিলা করেন। বিভাস মনে করেন ঈশ্বর তাকে সমাজের এই দায়িত্বগুলো দিয়েছেন। তাই তিনি আনন্দের সঙ্গে হাসিমুখে সব কাজ করেন।

ক. মানব সমাজের কয়টি দিক?

খ. কীভাবে স্বাধীনতার অনুশীলন ঘটে?

গ. বিভাসের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে খ্রিষ্টীয় আদর্শের কোন দিক ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'বিভাসের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে গ্রামের লোকেরা একদিন সফলতার মুখ দেখবে' – উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো।

২. সাফিনদের পাঁচতলা বাড়ির পাশেই একটা বস্তি আছে। সেখানে তার সমবয়সী কয়েকজন ছেলেমেয়ে আছে। তাদের ঘর, জামা-কাপড়, খেলাধুলা ইত্যাদি দেখে সে মনে মনে কষ্ট পায়। তার মাকে জিজ্ঞাসা করে বলে, 'ওদের এত কষ্ট কেন মা? আমার তো অনেক 'জামা, প্যান্ট, খেলনা আছে, সুন্দর বাড়ি আছে, ওদের নাই কেন মা? আমি আমার কিছু জামা-প্যান্ট, খেলনা ওদের জন্য দিতে চাই।' মা বললেন, 'ঠিক আছে।' সাফিন তার বন্ধুদের জন্য জামা-কাপড়, খেলনা ইত্যাদি কিনে সুন্দর রঙিন কাগজ দিয়ে মোড়ায়। পরে বন্ধুদের দাওয়াত দিয়ে খাওয়ায় এবং উপহারগুলো তাদের হাতে তুলে দেয়। বন্ধুরা খুব খুশি হয়।

ক. মানুষের পরস্পর সম্পর্কের মধ্যে কী ঘটে?

খ. আমরা কীভাবে মানুষ হওয়ার আহ্বানে সাড়া দেবো?

গ. সাফিনের মনোভাবের মধ্যে খ্রিষ্টীয় আদর্শের কোন দিকটির প্রকাশ ঘটে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'সাফিন ও বস্তির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তার স্বাধীনতায় বেড়ে ওঠা প্রকাশ পায়'— মূল্যায়ন করো।

পঞ্চম অধ্যায়

স্বাধীনতা ও বাধ্যতা

আমরা আগেই জেনেছি যে মানুষ সামাজিক জীব এবং সে একা থাকতে পারে না। সে একটি সমাজের সদস্য এবং সমাজে অন্যদের সাথে পরস্পর সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সে জীবনে পরিপূর্ণতা খুঁজে পায়। প্রতিটি সমাজে রয়েছে আইন-শৃঙ্খলা ও বিধিবিধান। অন্যকথায় প্রত্যেকটি মানবসমাজ গোষ্ঠীকে পরিচালনার জন্য রয়েছে একটি বৈধ কর্তৃপক্ষ। কোন মানব-সমাজ যদি সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংরক্ষণ করার জন্য ও সর্বসাধারণের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কাজ ও দেখাশুনা করার জন্য কিছু সংখ্যক লোককে কর্তৃপক্ষ পদে নিযুক্ত না করে তবে সে-সমাজ সুশৃঙ্খল বা সমৃদ্ধশালী হতে পারে না। পরিপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠতে হলে প্রতিটি মানুষকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি, উন্নতি ও পরিপক্কতা অর্জন করতে হয়। তা সম্ভব হয় কেবলমাত্র এমন একটি সামাজিক পরিবেশে যেখানে নিয়ম-নীতি পালনে বাধ্যতার প্রতি মানুষ বিশ্বস্ত থাকে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- ব্যক্তিগত ও সামাজিক মূল্যবোধ হিসাবে স্বাধীনতা ও বাধ্যতার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- কর্তৃত্বের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্যের (বাধ্যতার) প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব;
- বাধ্যতার প্রতি যীশুর মনোভাব বর্ণনা করতে পারব এবং
- কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হবো।

স্বাধীনতা ও বাধ্যতা

মানুষ হলো যুক্তিবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী। একজন মানুষ অন্যদের সাথে বিশেষভাবে ঈশ্বরের সাথে আধ্যাত্মিক ও যুক্তিসম্পন্ন সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিসত্তা টিকিয়ে রেখে পুরোপুরি ব্যক্তি হিসেবে গড়ে ওঠে। মানুষ একদিকে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, অন্যদিকে সে অন্যসব মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত। একই সাথে সে একজন 'আমি' ও 'আমরা'। একজন ব্যক্তিকে যখন আমরা এই দৃষ্টিতে দেখি ও বুঝতে পারি তখনই আমরা স্বাধীনতা ও বাধ্যতার অর্থ ও এই দুইয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক বুঝতে পারি। আধুনিক যুগে যেখানে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ওপর জোর দেওয়া হয় সেখানে স্বাধীনতা ও বাধ্যতাকে মোটেই যথাযথ দৃষ্টিতে দেখা হয় না। স্বাধীনতা ও বাধ্যতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটিকে ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। একটিকে ছাড়া অন্যটি বাতিল হয়ে যায়। অন্যকথায় বলা যায়, বাধ্যতাবিহীন স্বাধীনতা মোটেই স্বাধীনতা নয়, অন্যদিকে স্বাধীনতাবিহীন বাধ্যতাও খাঁটি বাধ্যতা নয়। স্বাধীনতা ও বাধ্যতার লক্ষ্য এক এবং তারা চলে সমান্তরালভাবে। ঈশ্বর নিজের উদ্যোগে নিজেরই প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মধ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতা দিয়েছেন এবং একই সঙ্গে মানুষ যেন তাঁকে জানতে ও ভালোবাসতে পারে সেই ক্ষমতাও তিনি দান করেছেন। যীশু বলেছেন, "পিতা যেমন আমাকে ভালোবেসেছেন,

আমিও তেমনি তোমাদের ভালোবেসেছি। তোমরা আমার ভালোবাসার মধ্যে থেকে যদি আমার সমস্ত আদেশ পালন করো, তবেই তোমরা আমার ভালোবাসার আশ্রয়ে থাকবে, আমিও যেমন আমার পিতার সমস্ত আদেশ পালন করেছি আর আছি তাঁর ভালোবাসার আশ্রয়ে।" (যোহন ১৫: ৯-১০)।

যীশুর জীবনে বাধ্যতা ছিল একটি অন্যতম গুণ। কিন্তু অনেকেই বাধ্যতাকে একটি গুণ হিসেবে স্বীকার করতে চায় না। সকল মানুষ যদি তাদের স্বাধীনতাকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করত তাহলে সমাজে দেখা দিত চরম বিশৃঙ্খলা। যেসব কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করেন তারা সর্বসাধারণের মঙ্গলকেই প্রাধান্য দেন ও রক্ষা করেন। কর্তৃত্ব বা নেতৃত্বের যথাযথ ব্যবহার আমাদেরকে নিরাপত্তা দেয় এবং আমাদের স্বাধীনতাকে বিকশিত হতে সাহায্য করে।

জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট। কিন্তু এ মহান ব্যক্তি পিতামাতার বড় বাধ্য ছিলেন। মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে তিনি আটলান্টিক সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তাঁর ভাইয়ের মতো এ্যাপলবি স্কুলে শিক্ষা গ্রহণের জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। বাড়ি ছাড়ার পূর্বে তিনি তাঁর সমস্ত ব্যক্তিগত মালামাল জাহাজে তোলার জন্য তাঁর লোকদেরও নির্দেশ দেন। আর তাঁর নির্দেশমতো তাঁর সমস্ত মালামাল জাহাজে তোলা হয়। এবার বিদায় নেবার জন্য তিনি তাঁর মায়ের সাথে দেখা করতে গেলেন। মা তাঁর এই ১৫ বছর বয়সের ছেলেকে কঠোর পরিশ্রমের মাঝে শিক্ষালাভের ব্যাপারে তেমন উৎসাহী ছিলেন না। তিনি তাঁর ছেলের গৃহত্যাগের প্রাক্কালে অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে ছেলের সামনে এসে দাঁড়ান। এত ছোট ছেলের বিক্ষুব্ধ আটলান্টিক সমুদ্র পাড়ি দেবার ব্যাপারে তিনি মোটেও আগ্রহী ছিলেন না। তবুও তিনি তাঁর ছেলের যাবার বেলায় তাঁকে কোনো বাধা দিতে চাইলেন না। বিদায় বেলায় মা-ছেলে যখন মুখোমুখি তখনই ছেলে ওয়াশিংটন তাঁর মায়ের চোখে জল দেখে তাঁর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে সমুদ্র পাড়ি দেবার অভিপ্রায় ত্যাগ করে বলেছিলেন, "আমি সমুদ্রে গিয়ে আমার মায়ের হৃদয় বিদীর্ণ করতে চাই না।" মা তাঁর এই কথা শুনে এতই আবেগাপ্লুত হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে অত্যন্ত স্নেহ ভরে বলেছিলেন, "বাবা, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি, তুমি একদিন খুব বড় মানুষ হও।" আর ঠিকই জর্জ ওয়াশিংটন তাঁর ব্যক্তিগত শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করে একসময়ে এক বিরল সম্মানজনক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। মায়ের প্রতি জর্জ ওয়াশিংটনের এই বাধ্যতা ইতিহাসের একটি বিরল ঘটনা। আমরা জানি, আমেরিকার ইতিহাসে জর্জ ওয়াশিংটনের মতো আর দ্বিতীয় কোনো প্রেসিডেন্টের আবির্ভাব ঘটেনি। আর তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি মরণোত্তর "জেনারেল অব দি আর্মিজ অব দি ইউ.এস.এ" আমেরিকার সর্বোচ্চ সামরিক খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন (৪ জুলাই, ১৯৭৬)।

কর্তৃত্ব

কোনো দল বা গোষ্ঠী, সমাজ বা প্রতিষ্ঠান, দেশ বা জাতিকে পরিচালনা দানের জন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে যে আইনগত ক্ষমতা বা শক্তি দেওয়া হয়, তাকেই বলে কর্তৃত্ব। এই ক্ষমতা তাদের দেওয়া হয় যেন তারা তাদের অধীনস্থদেরকে সঠিক পরিচালনা দিতে পারেন, তাদের অধিকার আদায়ে নিশ্চয়তা দান করতে পারেন, নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং উন্নতি সাধনের জন্য কাজ করতে পারেন। ভালোভাবে শাসন

করার অর্থ অধিকারের নিশ্চয়তা দান এবং দায়িত্ব পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা নয়, বরং সকলের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক, ন্যায্যতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলার স্বাভাবিক সদিচ্ছা নেতৃবর্গের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। একটি মানবদেহ যেমন মস্তক দ্বারা পরিচালিত হয়, তেমনি একটি পরিবার, সামাজিক বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং একটি রাষ্ট্রও তার নেতৃবর্গ দ্বারা পরিচালিত হয়। মস্তক ব্যতীত যেমন দেহ কিছুই করতে পারে না, দেহের প্রতিটি অঙ্গ যেমন মস্তকের নির্দেশনায় চলে তেমনি কোনো পরিবার বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানেও পরিচালক ছাড়া কার্যকর হতে পারে না। একটি পরিবারে পিতা বা কোনো কোনো পরিবারে পিতার অবর্তমানে মাতা পরিবার পরিচালনা করেন। একটি সমাজে সমাজ-নেতা, একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যেমন ধর্মপল্লীতে পাল-পুরোহিত, একটি দেশে প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি, এবং আমাদের খ্রিষ্টমণ্ডলীতে পোপ, বিশপ, পুরোহিত ও নির্বাচিত নেতৃবর্গ ও নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন তেমনি তাঁদের সাথে পরিচালনার কাজে আরও সভাসদ বা মন্ত্রিপরিষদ সহযোগিতা করেন।

যে দল, গোষ্ঠী, দেশ বা জাতিকে পরিচালনার দায়িত্ব নেতৃবর্গকে দেওয়া হয় তারা তাদের নেতৃবর্গের পরিচালনা ও নির্দেশনা অনুসারে চলে এবং তাদের বাধ্য থাকে। অর্থাৎ পরিবার, সমাজ ও দেশের সদস্য হিসেবে প্রতিটি ব্যক্তি সেই পরিবার, দেশ ও সমাজের নিয়ম-নীতি, বিধিবিধান মেনে চলে যেন কাঙ্ক্ষিত শান্তি, উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ সম্ভব হয়। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে, এমনকি আমাদের দেশের দিকে তাকালে আজকাল আমরা কী দেখি? কেন এত অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা, ধর্মঘট ও হরতাল? কোনো কোনো সময় এগুলো হয় ন্যায্য অধিকার আদায়ের কারণে। কিন্তু কোনো কোনো সময় এগুলোর যথাযথ কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিছু কিছু ব্যক্তি নেতৃবর্গের পরিচালনা মানতে চায় না, বাধ্যতাকে দুর্বলতা হিসেবে দেখে অথবা স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ বলে মনে করে।

পবিত্র মঙ্গলসমাচারে আমরা দেখতে পাই যীশু কর্তৃত্বকে অপব্যবহার ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে সেবা হিসেবে শিক্ষা দিয়েছেন। এই অর্থে কর্তৃত্ব হলো জীবনদানের ক্ষমতা এবং এই ক্ষমতা ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিসত্তায় বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। আমরা পবিত্র বাইবেলের দুইটি উদাহরণ দেখি:

"সেই সময় শিষ্যদের মধ্যে এই নিয়ে তর্ক উঠল যে, তাঁদের মধ্যে কে সবচেয়ে বড় বলে গণ্য হবার যোগ্য। যীশু তাঁদের বললেন: বিজাতীয়দের রাজারা নিজেদের প্রজাদের ওপর প্রভুত্ব চালায়; তাদের যত অধিপতিরা 'গণমঙ্গল-বিধায়ক' নামেই নিজেদের অভিহিত করায়। তোমাদের কিন্তু ওইভাবে চলা উচিত নয়। তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড়, তাকে বরং চলতে হবে কনিষ্ঠেরই মতো; আর যে তোমাদের প্রধান, তাকে চলতে হবে সেবকেরই মতো।" (লুক ২২:২৪-২৬)।

মার্ক লিখিত মঙ্গলসমাচারের ১০: ৩৫-৪৫ পদে আমরা দেখতে পাই: "জেবেদের সেই দুই ছেলে, যাকোব আর যোহন, এক সময়ে যীশুর কাছে এসে বললেন: গুরু, আমরা চাই যে, আপনি আমাদের একটা অনুরোধ রাখুন।" যীশু তাঁদের বললেন: "তোমরা কী চাও? বল, তোমাদের জন্যে কী করতে হবে?" তারা উত্তর দিলেন: "অনুগ্রহ করুন, আপনি যখন সেই গৌরবের আসনে বসবেন, আমরা একজন যেন আপনার ডান পাশে, আর একজন আপনার বাঁ পাশে বসতে পাই।" যীশু তাঁদের বললেন: "তোমরা যে কী চাইছ, তা তোমরা বুঝতে পারছ না। আমি নিজে যে-পাত্র থেকে পান করতে চলেছি, তোমরা কি সেই

পাত্র থেকে পান করতে পার? যে-দীক্ষাস্নানে আমি দীক্ষিত হতে চলেছি তোমরা কি সেই দীক্ষাস্নানে দীক্ষিত হতে পার?" তাঁরা উত্তর দিলেনঃ "হ্যাঁ, আমরা পারি!" তখন যীশু বললেন: "যে- পাত্র থেকে আমি পান করতে চলেছি, তা থেকে তোমরা অবশ্যই পান করবে; আর যে-দীক্ষাস্নানে আমি দীক্ষিত হতে চলেছি, সেই দীক্ষাস্নানে তোমরা দীক্ষিত হবেই! কিন্তু কাউকে আমার ডান পাশে বা বাঁ পাশে বসতে দেওয়ার অধিকার তো আমার নেই। সেই স্থান দুইটি যে তাদেরই প্রাপ্য, যাদের জন্যে তা নির্দিষ্ট হয়ে আছে।"

এইসব কথা যখন বাকি দশজন শিষ্যের কানে এলো, তখন যাকোব আর যোহনের ওপর তাঁরা রেগে গেলেন। তাই যীশু তাঁদের কাছে ডেকে বললেন: "তোমরা তো জানোই, বিজাতীয়দের তথাকথিত শাসক যারা, তারা প্রজাদের ওপর প্রভুত্ব করে; তেমনি বিজাতীয়দের মধ্যে বড় যারা, তারাও আবার অন্যদের ওপর কর্তৃত্ব করে। তোমাদের মধ্যে কিন্তু এমনটি যেন না হয়। বরং তোমাদের মধ্যে যে বড় হতে চায়, তাকে হতে হবে তোমাদের সেবক; এবং তোমাদের মধ্যে যে প্রধান হতে চায়, তাকে হতে হবে তোমাদের সকলেরই দাস। মানবপুত্র তো সেবা পাবার জন্যে আসেনি। সে এসেছে সেবা করতে এবং বহু মানুষের মুক্তিপণ হিসেবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে।"

সিস্টার মেরিয়ান টিরিজা হলিক্রস ভগিনী সংঘের একজন সেবিকা। সেবা কাজে নিবেদিত তাঁর জীবন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন হলিক্রস কলেজের অধ্যক্ষ। এক নিবেদিতপ্রাণ মানুষ। একটি স্বনামধন্য কলেজের অধ্যক্ষ হয়েও তাঁর মধ্যে কোনো অহংবোধ ছিল না। অমায়িক ছিল তাঁর ব্যবহার। অসম্ভব সুন্দর তাঁর বাচনভঙ্গি। মানুষকে গ্রহণ করার এক সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি, সদাচারী, বিনয়ী। এরকম একটি কলেজের অধ্যক্ষ হয়েও তিনি চালচলনে অত্যন্ত সাদাসিধে। একজন অধ্যক্ষ হিসেবে এরূপ একটি কলেজের সঠিক তত্ত্বাবধান ও এর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তাঁর দূরদর্শিতার কোনো জুড়ি ছিল না। সকল পর্যায়ে সকলের সাথে তিনি সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন।

তাঁর পরিচালনায় সকলেই সন্তুষ্ট ছিল। কারণ তিনি কাউকে অপ্রয়োজনে তিরস্কার করতেন না, কটু কথা বলতেন না বা মনে আঘাত দিতেন না। সদা কর্তব্যপরায়ণ, অসামান্য দক্ষতার অধিকারী, সকলের নিকট অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় হলিক্রস কলেজ বহুবার দেশে একটি সেরা মহিলা কলেজ হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে। তাতেও তিনি উচ্ছ্বসিত হননি বা নিজের মধ্যে অতি বেশি আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করেননি। কারণ তিনি এ কথা জানতেন ও মানতেন, তিনি কর্তব্য প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁর ভগিনী সংঘের সিদ্ধান্তক্রমে। আর তাই তিনি আজীবন চলেছেন ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ও তাঁর নির্দেশনায়। এত ক্ষমতাধর একজন অধ্যক্ষ হয়েও তাঁর বিনয় ও কঠোর সাধনা তাঁকে উন্নীত করেছে এমন এক উচ্চতায় যেখানে পৌছানো যেকোনো মানুষের জন্য অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য

কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য স্বাধীনতারই অংশ। এই আনুগত্য আমাদের স্বাধীন সত্তা থেকে আসে। যদি সহজভাবে আমাদের অন্তর থেকে না আসে তবে সেখানে প্রকৃত শান্তি থাকতে পারে না। আমরা স্ব-ইচ্ছায় ও মুক্ত অন্তরে আমাদের পরিবারের কর্তা যিনি, তিনি পিতা বা মাতা যে-ই হোন না কেন,

যেন তার বাধ্য থাকি। একইভাবে সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রধানদের প্রতিও আমাদের বাধ্যতা হবে স্বেচ্ছায় ও খোলা মনে। পরিবারে প্রতিজন ব্যক্তি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক শিক্ষার্থী, সমাজে প্রতিজন সদস্য, দেশে প্রতিটি নাগরিক যদি এভাবে স্বেচ্ছায় ও খোলা মনে তাদের পরিচালক ও নেতৃবর্গের পরিচালনাধীনে চলে ও বাধ্য থাকে তাহলে সেই পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সকল সদস্যদের পরস্পর পরস্পরের মধ্যে একতা ও শান্তি বিরাজ করবে। নেতৃবর্গ ও কর্তৃপক্ষ সেই প্রতিষ্ঠানকে ও প্রতিষ্ঠানের সকলকে উন্নতি, বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

সমাজের বিভিন্ন স্তরে কেন কর্তৃপক্ষের প্রতি বাধ্য থাকতে হয় এবং তা না হলে কী অসুবিধার সৃষ্টি হয় তা কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে দেখি।

বাধ্যতার ক্ষেত্র	বাধ্যতার প্রয়োজনীয়তা	অবাধ্যতার ফল
পরিবার	পরিবারে সদস্যদের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক, শৃঙ্খলা, শান্তি ও আনন্দ বজায় রাখার জন্য মা-বাবা, বয়োজ্যেষ্ঠদের ও অন্যান্য সকল গুরুজনদের বাধ্য থাকা একান্ত প্রয়োজন।	বাধ্য না থাকলে সেখানে আসে ভুল বোঝাবুঝি, দুঃখ, মনোমালিন্য, অশান্তি এবং পরিবারে একটি অসহনীয় অবস্থা ও পরিবেশ বিরাজ করে।
রাস্তাঘাটে চলাচলের সময়	বিশেষ করে ট্রাফিক নিয়মকানুন মেনে চলা একান্ত প্রয়োজন। ট্রাফিক আইন মেনে চললে রাস্তায় নিরাপত্তা বিরাজ করে। পথচারীরা নির্দ্বিধায় চলাচল করতে পারে। আমাদের দেশে রাস্তার বাম পাশ ধরে চলার নিয়ম রয়েছে। সঠিক নিয়ম মেনে চললে সকলেই নিজ গতিতে নিজস্ব গন্তব্যের পথে নির্বিঘ্নে চলতে পারে।	ট্রাফিক আইন যথাযথভাবে মেনে না চলার কারণে আমাদের দেশে অহরহ দুর্ঘটনা ঘটছে। অগণিত নির্দোষ ব্যক্তি প্রাণ হারাচ্ছে। এভাবে অনেক পরিবার বিপদগ্রস্ত ও অচল হয়ে যাচ্ছে। অনেকে প্রিয়জনকে হারিয়ে বেদনায় কাতর হচ্ছে।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণ ও শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নিয়মিত উপস্থিতি, সকল কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে জ্ঞানলাভের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য উপস্থিত থাকা প্রতিটি শিক্ষার্থীর কর্তব্য।	বিদ্যালয়ে প্রতিদিন উপস্থিত না থাকলে শিক্ষার্থী শ্রেণিপাঠ লাভ হতে বঞ্চিত হয়। ফলে সে পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারে না। বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন মেনে না চললে শ্রেণিকক্ষে ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ও পরিবেশ নষ্ট হয়।

সবুজ নবম শ্রেণির একজন মেধাবী শিক্ষার্থী। সে নিয়মিত পড়াশোনা করে। শ্রেণিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কথামতো কাজ করে সর্বদা মনোযোগী থাকে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপস্থিত থাকার ব্যাপারে সে সদা সতর্ক। যথাসময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়, সকালে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সমাবেশে উপস্থিত থাকে ও নিয়মমাফিক দিন শুরু করে। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মতো কাজ করে। যেমন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সঠিক সময়ে উপস্থিত হওয়া, সকালে সমাবেশে যোগ দেওয়া, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত পোশাক পরিধান করে আসা, শ্রেণিকক্ষে মোবাইল ফোন ও অনাকাঙ্ক্ষিত অন্য কোন কিছু না আনা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সকল নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলার ক্ষেত্রে তার জুড়ি নেই। সে মনে করে

তার সুশৃঙ্খল জীবনের জন্য এসবের প্রয়োজন প্রচুর। তাই সে সবই করে নিজের সুন্দর ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভেবে। সে কোন উচ্ছৃঙ্খল শিক্ষার্থীর প্ররোচনায় চলে না ও বিশৃঙ্খল জীবনের পথে পা বাড়ায় না। আর তার সুশৃঙ্খল হওয়ার পিছনে যাদের অবদান অত্যন্ত বেশি তারা হলেন তার স্নেহপূর্ণ বাবা-মা ও শিক্ষকমণ্ডলী। বাবা মায়ের আদেশ-নির্দেশ ও উপদেশ এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষিকাদের শিক্ষা ও পরিচালনাদান, যা কিনা তার জীবনে চমৎকারভাবে কাজে আসে। তার দৃষ্টান্ত সবার কাছে গ্রহণীয় ও অনুকরণীয় হয়ে ওঠে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষও তাকে সুনজরে দেখেন। শিক্ষকগণও তার ব্যাপারে অত্যন্ত আশাবাদী। আর তার এ রকম বাধ্যতার কারণে সকলেই তাকে স্নেহ করে ও উৎসাহ উদ্দীপনা জোগায়, যা তার সুন্দর ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তাকে আরও উৎসাহী করে তোলে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ তাকে বিভিন্ন ছোট ছোট দায়িত্ব দেন এবং সে দায়িত্বগুলো অত্যন্ত বিনয়ের সাথে গ্রহণ ও পালন করে। তার মধ্যে যে সদাচরণ আছে তার প্রতিফলন তার কাজের মধ্যে সুস্পষ্ট। তাই বিদ্যালয়ে তার বাধ্যতা কর্তৃপক্ষের কাছে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। একজন কিশোরের এ রকম আনুগত্য ও বাধ্যতা কর্তৃপক্ষের গর্বের কারণ।

কাজ : ব্যক্তিগতভাবে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

- ক উপরে সবুজের দৃষ্টান্তটি তোমার কী কী কারণে গ্রহণযোগ্য মনে হয়?
- খ. কর্তৃপক্ষের প্রতি তোমার মনোভাব কী?
- গ. তুমি কি কখনো কখনো কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে দূরে সরে থাকো? তাঁদেরকে ভয় পাও?
- ঘ. তাঁদেরকে কেন ভয় পাও?
- ঙ. তুমি কি তাঁদের কাছে নিজেকে নিরাপদ বোধ কর?
- চ. কর্তৃপক্ষ যদি তোমাকে বুঝতে পারেন, তিনি যদি দয়ালু ও নিরপেক্ষ হন তখন কর্তৃপক্ষের প্রতি তোমার মনোভাব ও আচরণ কেমন হয়?

যীশু ও বাধ্যতা

দ্বিতীয় পাঠে আমরা কর্তৃত্ব সম্বন্ধে যীশুর ধারণা ও শিক্ষা সম্পর্কে জেনেছি। এখন আমরা দেখব বাধ্যতার প্রতি যীশুর মনোভাব কী? যীশুর জন্ম ও বেড়ে ওঠার মাঝে আমরা তাঁর বাধ্যতার বহু দৃষ্টান্ত পেয়ে থাকি। যীশুর জন্মের পর তাঁর মা মারিয়া ও পালক পিতা যোসেফ তাঁকে আদরযত্ন ও স্নেহে বড় করে তোলেন। সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিবিধান মেনেই তাঁর মা-বাবা তাঁকে সম্মুখ জীবনে চলার প্রেরণা দেন। তাই ১২ বছর বয়সে যীশু যেরুসালেম মন্দিরে হারিয়ে গেলে তাঁর মা-বাবা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। ব্যস্ত হয়ে তাঁর, তাঁকে খোঁজাখুঁজি করেন। তাঁরা এক প্রকার নিশ্চিত ছিলেন, আত্মীয়-স্বজনদের মাঝেই তাঁরা যীশুকে খুঁজে পাবেন। কিন্তু না, তিনি আত্মীয়-স্বজনের মাঝেও ছিলেন না! এ কথা তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেননি যে যীশু হারিয়ে যেতে পারেন। তাহলে মা-বাবাকে না জানিয়ে যীশু কোথায় হারিয়ে গেলেন। অবশেষে বিফল মনোরথ হয়ে খুঁজতে খুঁজতে যীশুর মা-বাবা আবার যেরুসালেম মন্দিরে ফিরে যান। আর তাঁরা সেখানে তাঁকে দেখতে পান পণ্ডিতদের মাঝে। সেখানে যীশু পণ্ডিতদের সাথে গভীর তত্ত্বালোচনায় রত ছিলেন।

বিজ্ঞের মতো পণ্ডিতদের প্রশ্ন করছিলেন। এতে অনেকেই হতবাক হচ্ছিলেন তার প্রজ্ঞা দেখে। যীশুকে মন্দিরে দেখতে পেয়ে তাঁর মা-বাবা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তিনি তাঁদের সাথে এমন ব্যবহার করলেন এবং তাঁকে জানালেন যে তাঁরা কত উদ্বিগ্ন হয়েই না তাকে খুঁজছিলেন। যীশু তাঁদের উত্তর দিয়েছিলেন: "কেন খুঁজছিলে আমাকে? তোমরা কি জানতে না যে, আমি নিশ্চয়ই আমার পিতার গৃহেই থাকব?" তারপর তিনি মন্দির ছেড়ে মা-বাবার সাথেই চলে গেলেন। আর প্রকাশিত জীবন শুরুর পূর্ব পর্যন্ত মা-বাবার বাধ্য হয়েই রইলেন। ঈশ্বরপুত্র হয়েও জগৎ সংসারে মা-বাবার অনুগত ছিলেন। তাঁর জীবনের উচ্ছল ও উজ্জ্বল দিনগুলো এভাবেই কেটে গেল।

যীশুর বাধ্যতার দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। তিনি সারা জীবন ধরে 'তাঁর পিতার' বাধ্য ছিলেন। সাধু যোহনের লেখা মঙ্গলসমাচার থেকে যীশুর নিজের কথায় আমরা পিতার প্রতি তাঁর বাধ্যতার কথা জানতে পারি "যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা মেনে চলা এবং তাঁর দেওয়া কাজ সম্পন্ন করা, সেই তো আমার খাবার।" (যোহন ৪:৩৪)। "আমি নিজে থেকে কিছুই করি না; বরং পিতা আমাকে যা শিখিয়েছেন, আমি ঠিক তা-ই বলে থাকি।... যে সমস্ত কাজে তিনি প্রীত হন, আমি সর্বদা তা-ই করে থাকি" (যোহন ৮:২৮-২৯)। মৃত্যু পর্যন্ত যীশু তাঁর পিতার ইচ্ছা পালন করে গিয়েছেন। মৃত্যুর আগের রাতে গেৎসিমানি বাগানে যীশু তাঁর আসন্ন ক্রুশ-মৃত্যুর কথা ভেবে দুঃখে কাতর হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "পিতা আমার, যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্রটি আমার কাছ থেকে দূরেই সরে যাক। তবে আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক" (মথি ২৬:৩৯-৪২)।

ফিলিপ্পীয়দের কাছে লেখা সাধু পলের পত্র থেকে আমরা জানতে পারি যীশুর বাধ্যতার স্বরূপ কী এবং তা আমাদের কাছ থেকে কী দাবি করে: "তোমাদের মনোভাব তেমনটি হওয়া উচিত, যেমনটি খ্রীষ্ট যীশুর নিজেরই ছিল। তিনি তো স্বরূপে ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতুল্যতাকে আঁকড়ে থাকতে চাইলেন না, বরং নিজেকে তিনি রিক্ত করলেন: দাসের স্বরূপ গ্রহণ করে তিনি মানুষের মতো হয়েই জন্ম নিলেন। আকারে-প্রকারে মানুষের মতো হয়ে তিনি নিজেকে আরও নমিত করলেন। চরম আনুগত্য দেখিয়ে তিনি মৃত্যু, এমনকি ক্রুশেই মৃত্যু মেনে নিলেন। তাই ঈশ্বর তাঁকে সবকিছুর ওপরে উন্নীত করলেন, তাঁকে দিলেন সেই নাম, সকল নামের শ্রেষ্ঠ যে নাম, যেন যীশু নামে নত হয় প্রতিটি জানু—স্বর্গে, মর্ত্যে ও পাতালে—প্রতিটি জিহ্বা যেন এই সত্য ঘোষণা করে: যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং প্রভু, আর এতেই যেন প্রকাশিত হয় পিতা ঈশ্বরের মহিমা" (ফিলিপ্পীয় ২: ৫-১১)।

কাজ : বাধ্যতার প্রতি যীশুর মনোভাবের সাথে তোমার মনোভাবের তুলনা করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। স্বাধীনতার সাথে কোন বিষয়টি জড়িত?

ক. শ্রদ্ধা   খ. ভক্তি
গ. নম্রতা   ঘ. বাধ্যতা

২। জেবেদের দুই ছেলে যাকোব ও যোহন যীশুর ডান-বাম পাশে বসতে চেয়েছিল কেন?

ক. ক্ষমতা পেতে   খ. বাধ্য হয়ে
গ. বিশ্বাসী হয়ে   ঘ. সেবা করতে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

চয়ন পিতামাতার খুব প্রিয় সন্তান। ছোটবেলা থেকেই সে পিতামাতার কথামতো চলে। সে প্রতিদিন খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠে, পড়ালেখা করে এবং প্রতিনিয়ত পারিবারিক প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করে। এ কারণে অনেক সময় তার পিতামাতা তাকে পরিবারের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিত থাকেন।

৩। চয়নের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে?

ক. কর্তৃত্বের   খ. বাধ্যতার
গ. কর্তৃপক্ষের   ঘ. বন্ধুত্বের

৪। চয়নের এ ধরনের আচরণের কারণে পরিবারে আসতে পারে–

i. মনোমালিন্য   ii. সুন্দর সম্পর্ক
iii. আনন্দ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়?
২. বাধ্যতা ও স্বাধীনতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত কেন?
৩. কর্তৃত্ব কাকে বলে?
৪. কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুগত থাকা উচিত কেন?
৫. যীশুখ্রীষ্টের বাধ্যতাকে আমরা অনুসরণ করব কেন?

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. পিতামাতার দুই সন্তান হৃদয় ও উদয়। হৃদয় খুব অধ্যবসায়ী, সে পিতামাতার কথা শোনে, গুরুজনদের শ্রদ্ধা করে, কারো সাথে সে ঝগড়া-বিবাদ করে না। কিন্তু উদয় মেধাবী হলেও সে পিতামাতা বা গুরুজনদের কথা শোনে না, বাজে ছেলেদের সাথে চলাফেরা করে। হৃদয় ও উদয় দুই জনই ঢাকায় থেকে কলেজে পড়তে আগ্রহী। তাদের মা তাদের আগ্রহ জানতে পেরে বললেন, 'তোমাদের ঢাকায় লেখাপড়া করাতে আমাদেরও ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাতে তোমাদের ছোট ভাইবোনদের লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটবে'। মায়ের কথায় হৃদয় ঢাকায় না গিয়ে গ্রামের এক কলেজে ভর্তি হলো।

ক. যাকোব ও যোহনের সাথে কারা রেগে গেলেন?

খ. যে প্রধান হতে চায় তাকে সকলের সেবক হতে হয় কেন?

গ. যীশুর কোন শিক্ষা মনে রেখে হৃদয় গ্রামের কলেজেই মনোযোগের সাথে লেখাপড়া করছে–বর্ণনা করো।

ঘ. উদয়ের আচরণে কি স্বাধীনতার সঠিক ব্যবহার লক্ষ করা যায় বলে তুমি মনে কর? তোমার মতামত প্রদান করো।

২. নবম শ্রেণির ছাত্র পবিত্র খুব নম্র, ভদ্র ও মেধাবী। তার এই গুণ দেখে শ্রেণি শিক্ষক তাকে শ্রেণির ক্যাপ্টেন নির্বাচন করেন। দায়িত্ব পেয়ে পবিত্র শ্রেণির সহপাঠীদের সকল সমস্যা প্রধান শিক্ষককে জানায় এবং সেগুলোর সমাধান করে। কোনো ছাত্র অসুস্থ হলে অন্য ছাত্রদের সাথে নিয়ে তাকে সেবা দেওয়াসহ শ্রেণিতে কোলাহল ও বিশৃঙ্খলা হলে ছাত্রদের বুঝিয়ে ও অনুরোধ করে শ্রেণিতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনে। তাদের শ্রেণির এক সহপাঠী প্রীতম তাদের শ্রেণির ক্যাপ্টেন হতে চেয়েছিল কিন্তু সে তা হতে না পেরে শ্রেণিতে শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে জোরে জোরে চিৎকার করে, অনুমতি না নিয়ে অযথা বাইরে ঘোরাফেরা করে, মিথ্যা কথা বলাসহ আরও নানা ধরনের বিরক্তিকর কাজে সে লিপ্ত।

ক. বিজাতীয়দের রাজারা নিজেদের প্রজাদের ওপর কী চালায়?

খ. বড়দের কনিষ্ঠদের মতো হতে হবে কেন?

গ. পবিত্রের মধ্যে কর্তৃত্বের কোন দিকটি কাজ করেছে – ব্যাখ্যা করো।

ঘ. কর্তৃপক্ষের প্রতি বাধ্য থাকার জন্য প্রীতমের এমন আচরণ কি যৌক্তিক বলে মনে হয়? উত্তরের সপক্ষে তোমার যুক্তি প্রদান করো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিশ্বস্ত বন্ধু

ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা অনেক সুন্দর সুন্দর দান ও উপহার পেয়েছি। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ দান হলো বন্ধু ও বন্ধুত্ব। যীশু নিজেই বলেছেন, বন্ধুর জন্য প্রাণ দেওয়ার মতো বড় ভালোবাসা আর নাই। যীশুর এই কথা দ্বারাই আমরা বন্ধুত্বের মর্যাদা ও তাৎপর্য কী তা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। পুরাতন নিয়মে আব্রাহামকে ঈশ্বর বন্ধু বলেছেন। আব্রাহামও ঈশ্বরকে বন্ধু বলেছেন। যীশুর মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে এসে শিষ্যদের বাছাই করার মাধ্যমেও আমরা জীবনে বন্ধু নির্বাচনের বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ তা অনুভব করতে পারি। বিশ্বস্ত বন্ধু জীবনে মণি-মুক্তার চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান। বন্ধুত্ব আমাদের জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই এই বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের গভীরভাবে জানা দরকার। বন্ধুত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে আমাদের জীবন হয়ে উঠবে আনন্দময় ও অর্থপূর্ণ।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- বিশ্বস্ত বন্ধুত্বের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জীবনে বিশ্বস্ত বন্ধুর গুরুত্ব মুল্যায়ন করতে পারব;
- ভালো ও খারাপ বন্ধুত্বের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব;
- বিশ্বাসে সমৃদ্ধ জীবনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব এবং
- প্রকৃত বন্ধুত্ব স্থাপনে উদ্যোগী হবো।

বন্ধুত্ব

জীবনটা অনেক সুন্দর! মানুষের সাথে মানুষের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে তা আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। দুর হয়ে যায় নিঃসঙ্গতা। পৃথিবীর সুন্দর, আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় শব্দগুলোর একটি হলো বন্ধু। বন্ধু কথাটি বললেই বা শুনলেই আমরা খুব আনন্দ বোধ করি। এই শব্দটি উচ্চারণে এমন কারো কথা মনে পড়ে, যাকে আমি বিশ্বাস করি, যার ওপর আমার গভীর আস্থা, যার সাথে আমি সময় কাটাতে চাই, যার সান্নিধ্য উপভোগ করি, যার জন্য আমি যেকোনো কিছু করার জন্য প্রস্তুত এবং আমি আশা করি যে সেও আমার জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত। শুধু তাই নয় আমি তাকে ভালোবাসি এবং আমাকেও সে ভালোবাসে। এক কথায় আমরা বলতে পারি একজন মানুষের সাথে আর একজন মানুষের যে আন্তরিকতাপূর্ণ বা সুহৃদ সম্পর্ক তাকেই বলা হয় বন্ধুত্ব। এই সম্পর্কে রয়েছে পরস্পর পরস্পরের জন্য দরদ, আন্তরিকতা, যত্ন, সহৃদয়তা, মঙ্গল কামনা, গ্রহণযোগ্যতা, সাহায্য-সহযোগিতার মনোভাব এবং ত্যাগ স্বীকার করার ইচ্ছা। মানুষে মানুষে এই গভীর আন্তরিক ও অন্তরঙ্গ সম্পর্কই হলো বন্ধুত্ব। বন্ধু হলো আত্মার আত্মীয়। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও মনের টানে, হৃদয়ের টানে মানুষের মধ্যে যে আত্মার সম্পর্ক তৈরি হয় তাই হলো বন্ধুত্ব।

কে আমাদের প্রকৃত বন্ধু?

বাবা ও মায়ের সম্পর্ক থেকেই আমাদের জন্ম। পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয়-পরিজনদের সাথে আমাদের প্রথম সম্পর্ক তৈরি হয়। তারপর ধীরে ধীরে আমরা পরিবারের বাইরের অন্য মানুষদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলি। বড় হবার সাথে সাথে আমরা বুঝতে পারি একেক জনের সাথে আমাদের একেক রকম হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। শিশু, যুবক-যুবতী, প্রাপ্তবয়স্ক, বৃদ্ধ–সবার জন্য একথা সত্য। পরিবার থেকে শুরু করে খেলার মাঠ, রাস্তাঘাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, সামাজিক অনুষ্ঠান– মোটকথা যেখানেই মানুষের সাথে আমাদের ভাবের আদান-প্রদান হবার সুযোগ ও সম্ভাবনা আছে সেখানেই কারো না কারো সাথে আমাদের মনের মিল হতে পারে। তারপর ধীরে ধীরে তা বন্ধুত্বে পরিণত হতে পারে। ব্যক্তিত্বের ভিন্নতায় বন্ধু হবার জন্য বয়স, পেশা, শ্রেণি, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ভৌগোলিক দূরত্ব কখনো কার্যকরী হতেও পারে আবার না-ও হতে পারে। কে যে কার বন্ধু হয় তা সুনির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তবে বয়স, পেশা, শ্রেণি, সহপাঠী, সহকর্মী, পাড়াপ্রতিবেশী বা নিকটে অবস্থানের লোকজন, এমনকি নিজ পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে এই সুহৃদ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। বন্ধু আসলে আত্মার আত্মীয়। হৃদয়ে বা আত্মায় যার সাথে আমাদের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন তৈরি হয় সেই হলো বন্ধু। গণমাধ্যম ও ত্বরিৎ যোগাযোগের যুগে নানারকম সামাজিক নেটওয়ার্ক রয়েছে। যেমন- ইন্টারনেট, ফেইসবুক ইত্যাদির মাধ্যমে পৃথিবীর একপ্রান্তের মানুষের সাথে অন্যপ্রান্তের মানুষের বন্ধুত্ব গড়ে উঠছে। যদিও এই ধরনের বন্ধুত্বে মানুষ নানাভাবে প্রতারিতও হচ্ছে। তাহলে কে বিশ্বস্ত বন্ধু? বন্ধুত্বের বিশেষ বিশেষ কতকগুলো গুণ নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করব, যেগুলো থাকলে একজনকে আমরা প্রকৃত বন্ধু বলতে পারি।

ভালোবাসা ও আন্তরিকতা: আমাদের জন্মই ভালোবাসা থেকে। আমাদের জন্ম মানুষকে ভালোবাসার জন্য। বন্ধুত্বের মাধ্যমে আমরা সেই ভালোবাসা ও আন্তরিকতা বিনিময় করে থাকি। বন্ধুত্বপূর্ণ এ ভালোবাসার জন্য যীশু বলেছিলেন আমি তোমাদের আর দাস বলছি না বরং বন্ধু বলছি। বন্ধুত্বের বড় শক্তি হলো ভালোবাসা। ভালোবাসা থাকলে একজন মানুষ যেমনই হোক না কেন তাকে গ্রহণ করতে পারি।

দরদ ও মমতা: বন্ধুর জন্য বন্ধুর থাকে দরদ ও মমতা। যেকোনো ঘটনায় সে নিজের মতোই তার বন্ধুর জন্য অনুভব করে। অনুভূতির তীব্রতা বন্ধুত্বের একটি বড় গুণ। দরদ ও মমতায় তার প্রকাশ ঘটে।

মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা: সে-ই আমার বন্ধু যার নিরন্তর শুভ কামনায় আমি বেঁচে আছি। বন্ধু আমার জন্য সর্বদা শুভ কামনা করে। আমার উদ্দেশ্যে তার প্রতিটি কথা ও কাজ আমার মঙ্গল কামনায় নিবেদিত। প্রকৃত বন্ধু যেকোনো অবস্থায় আমার মঙ্গল কামনা করে।

বিশ্বস্ততা: বিশ্বস্ততা বন্ধুত্বের কেন্দ্রবিন্দু। পরস্পর বিশ্বাস ও বিশ্বস্ততাকে ঘিরে বন্ধুত্বের অন্য গুণগুলো প্রকাশ পায়। একজন বিশ্বস্ত বন্ধু জীবনের অনেক বড় পাওয়া। মণি-মুক্তার চেয়েও মূল্যবান হলো বিশ্বস্ত বন্ধু–যার ওপর আস্থা রাখা যায়, নিজের জীবনের একান্ত সুখ দুঃখ মন খুলে সহভাগিতা করা যায়।

আত্মদান ও সমর্থন: প্রকৃত বন্ধু তার বন্ধুর জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত। যীশু আমদের প্রকৃত বন্ধু। তিনি আমাদের ভালোবেসে জীবন দিয়েছেন। সব অবস্থায় এক বন্ধু আর এক বন্ধুকে সমর্থন করে। তবে মনে রাখতে হবে যে প্রকৃত বন্ধু তার বন্ধুর অন্যায় কাজকে সমর্থন করে কখনো তাকে বিপদের দিকে ঠেলে দেবে না। সমর্থন হতে হবে সত্য ও ন্যায়ের পথে সমর্থন।

সহমর্মিতা, সহভাগিতা ও সহযোগিতা: প্রকৃত বন্ধু জীবনের ভালোমন্দ, আনন্দবেদনা, ঘাত-প্রতিঘাত, বিপদ-আপদের সঙ্গী ও সহমর্মী। যে কোন প্রয়োজনে সে বাড়িয়ে দেয় তার সহভাগিতা ও সহযোগিতার হাত। বিনা দ্বিধায় যাকে বলা যায় সব কথা ও চাওয়া যায় সাহায্য সহযোগিতা। জীবনের আনন্দময় ঘটনা বা উৎসবে সে যেমন আনন্দ করে দুঃখের সময়ও সে তেমনিভাবে কাতর হয়।

গ্রহণযোগ্যতা: মানুষ হিসেবে আমরা প্রত্যেকেই ভিন্ন। আমাদের রয়েছে আলাদা বৈশিষ্ট্য। এই আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়েই আমরা হয়ে উঠি একে অপরের বন্ধু। কিন্তু বন্ধুত্বের সবচেয় বড় গুণ হলো যে, আমরা বন্ধু হিসেবে পরস্পরের এই ভিন্নতাকে খুব সহজেই গ্রহণ করি; বৈচিত্র্যের সৌন্দর্যকে স্বীকৃতি দেই; বন্ধু হিসেবে যে যেমন তাকে সেইভাবেই গ্রহণ করি। এতে আমরা পরস্পর খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।

স্বাধীনতা: বন্ধুত্বের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এই যে, প্রকৃত বন্ধুত্ব পরস্পরকে স্বাধীন করে তোলে কিংবা একে অপরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করে। স্বাধীনতায় তারা বেড়ে ওঠে। স্বাধীনতায় তারা একে অন্যকে কেবলমাত্র 'আমার আমার' বলে দাবি করে না বা তাকে নিজের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না। বিশ্বাস ও বিশ্বস্ততার কারণে তারা একে অন্যকে স্বাধীন করে তোলে। স্বাধীনতার কারণে তারা পরস্পর পরস্পরের কাছে আরও ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। প্রকৃত বন্ধুত্বের এ স্বাধীনতায় একজন মানুষ নিজের মতো করে বেড়ে ওঠার সুযোগ পায় এবং সুন্দরভাবে বিকশিত হয়।

কাজ: তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে কী কারণে তুমি ঘনিষ্ঠ বলে মনে করো? তার বিশেষ গুণগুলো লেখ।

বিশ্বস্ত বন্ধুত্বের গুরুত্ব

আমরা অনেকের সাথেই বন্ধুসুলভ। কিন্তু সবাই আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু নয়। ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে-ই যাকে আমি সত্যিকারভাবে বিশ্বাস করি। আমরা জীবনে হয়তো অনেক বন্ধু পাব, প্রকৃত বিশ্বস্ত বন্ধুর সংখ্যা খুবই কম। জীবনে দুই একজন যদি পাই তাও বড় ভাগ্যের ব্যাপার। যীশুর জীবনের দিকে তাকালে আমরা এই বিষয়টি খুবই ভালোভাবে বুঝতে পারি। বারোজন শিষ্যের মধ্যে যুদাস যীশুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সাধু পিতরও ভয়ে তাঁকে তিনবার অস্বীকার করেছিলেন, পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত যীশুর প্রতি আজীবন বিশ্বস্ত থেকে নিজের জীবনও দান করেছেন। বিশ্বস্ত বন্ধু আর বন্ধুর বিশ্বস্ততা সত্যি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যীশু নিজে কিন্তু সমগ্র মানবজাতির বিশ্বস্ত বন্ধু। মানুষকে ভালোবেসে তিনি তাঁর নিজের জীবন দিয়েছেন। রোমান ক্যাথলিক বাইবেলের পুরাতন নিয়মের বেন সিরা পুস্তকে বিশ্বস্ত বন্ধুর গুরুত্ব দেখতে পাই।

বন্ধুত্ব এক অমূল্য সম্পদ: (বেন সিরা : ৬: ৫-১৭)

মধুর আলাপ কত বন্ধু আনে;
স্নিগ্ধ কথা নিয়ে আসে কত প্রীতিসম্ভাষণ!
বহু মানুষেরই সঙ্গে তোমার সদ্ভাব ঘটুক,
তবে হাজারজনের মধ্যেও তোমার মন্ত্রণাদাতা হোক মাত্র একজন!
কাউকে বন্ধু বলে গ্রহণ করার আগে যাচাই করে নাও তাকে;

সঙ্গে সঙ্গে তাকে যেন করো না বিশ্বাস!
এক ধরনের বন্ধু আছে, যারা যতক্ষণ সুবিধা পায়, ততক্ষণই বন্ধু থাকে;
তবে বিপদের দিনে তোমার পাশে তারা কেউই থাকবে না।
এক ধরনের বন্ধু আছে, শেষকালে যারা শত্রু হয়ে ওঠে;
তারা তো তোমার সঙ্গে তাদের ঝগড়ার কথা সকলকে জানাবে, তোমাকে লজ্জাই দেবে।
এক ধরনের বন্ধু আছে, যারা ভোজনসঙ্গী হয়;
তবে বিপদের দিনে তোমার পাশে তারা কেউই থাকবে না।
তোমার সুদিনে তারা হবে যেন দ্বিতীয় কোন তুমি;
তোমার লোকজনের ওপর তারা ইচ্ছামতো কর্তৃত্বই করবে।
কিন্তু তোমার অবস্থা পড়ে গেলে তারা তোমার বিরোধিতা করবে:
সেদিন তোমাকে দেখে লুকিয়ে পড়বে তারা।
তোমার যত শত্রুর কাছ থেকে নিজেকে দূরেই রাখ তুমি,
আর বন্ধুদের ব্যাপারে তুমি সজাগ-সতর্ক থাক।
বিশ্বস্ত বন্ধু, সে তো নিরাপদ আশ্রয়ের মতো;
তেমন বন্ধুকে পাওয়া, সে তো মহাসম্পদ-ই পাওয়া।
বিশ্বস্ত বন্ধু, আহা, কোন মূল্যেই মেটে না তার দাম;
কোন তুলাদণ্ডেই তার যোগ্যতার হয় না পরিমাপ।
বিশ্বস্ত বন্ধু, সে তো জীবনদায়ী অমৃতেরই মতো;
প্রভুকে সম্ভ্রম করে যারা, তারাই বন্ধুত্বকে সুপথে নিয়ে চলে;
সে নিজেও যেমন, তার সঙ্গী-ও তো তেমনই হয়ে থাকে।

বিশ্বস্ত বন্ধুর উপকারিতা সম্পর্কে কিছু বাস্তব কথাও শুনি:

- নিঃসঙ্গতা দূর করে বন্ধুত্ব মানুষের জীবনে নুতন অর্থ দান করে;
- ব্যক্তির জীবন বিকাশে সাহায্য করে বন্ধুত্ব;
- বিশ্বস্ত বন্ধুত্বের মাধ্যমে ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারে তার নিজ জীবনের মূল্য, শক্তি এবং সে ভালোবাসার যোগ্য;
- বিশ্বস্ত বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া যায় সুপরামর্শ ও সঠিক নির্দেশনা;
- বিশ্বস্ত বন্ধু নিরাপদ আশ্রয়—যার ওপর রাখা যায় আস্থা ও ভরসা;
- বিশ্বস্ত বন্ধু দর্পণস্বরূপ। সে আমাকে চিনে, জানে ও বোঝে এবং আমার আমিকে চিনতে ও জানতে (আত্মজ্ঞান অর্জনে) সাহায্য করে;
- আমার আসল আমি বা প্রকৃত আত্মপ্রকাশের জন্য বিশ্বস্ত বন্ধু দরকার; তার কাছে আমার মুখোশ খুলে যায়।

- বিশ্বস্ত বন্ধু জীবন পথের ঘাত-প্রতিঘাতে এগিয়ে চলার প্রেরণা।

আমাদের সবার জীবনে তাই বিশ্বস্ত বন্ধু খুবই দরকার। নিঃসঙ্গ জীবন নিরর্থক, যন্ত্রণাদায়ক ও ভারগ্রস্ত।

কাজঃ ১. তোমার বিশ্বস্ত বন্ধু তোমাকে কী কী ভাবে সাহায্য করে তা লেখ।
কাজঃ ২. তুমি যদি কারও বিশ্বস্ত বন্ধু হতে চাও তবে তোমাকে কী রকম মানুষ হতে হবে তা লেখ।

ভালো ও মন্দ বন্ধু

বাংলা ভাষায় একটি প্রবাদ রয়েছে 'সঙ্গদোষে লোহা ভাসে।' অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে যা সম্ভব নয় বলে মনে হয়, কারো সান্নিধ্য বা সাহচর্যে তাই সম্ভব হতে পারে। স্বাভাবিকভাবে লোহার মতো ভারী বস্তু জলে কখনো ভাসতে পারে না। কিন্তু নৌকা বানাবার জন্য লোহার পেরেক যখন কাঠের সাথে লাগানো হয় তখন কিন্তু লোহাগুলো নৌকার সাথে ঠিকই ভাসতে থাকে। এই বিষয়টি কিন্তু মানুষের জীবনের বন্ধুত্বের বেলায় খুব সত্য। ভালো বন্ধুর সান্নিধ্যে এসে অনেক খারাপ প্রকৃতির মানুষও ভালো হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে বলা যায়, যা অসম্ভব তাই সম্ভব হতে পারে। আবার খারাপ মানুষের সাহচর্যে এসে অনেক ভালো মানুষও খারাপ হয়ে যেতে পারে। তাই আমাদের জীবনে বন্ধু নির্বাচনের জন্য ভালো বা মন্দের বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার। আমাদের জানতে ও বুঝতে হয় কে ভালো বা কে মন্দ বন্ধু।

রোপেন, কেয়া, দ্যুতি, সাবরিন, ঐক্য, সাম্য, আকাশ তারা সবাই নবম শ্রেণিতে পড়ে। তারা সহপাঠী ও বন্ধু। তারা একসাথে লেখাপড়া, খেলাধুলা ও নানারকম কাজ করে, অনেক জায়গায় দল বেঁধে বেড়াতে যায়। দ্যুতি, সাবরিন ও কেয়া তাদের নিজেদের মধ্যে অনেক বিষয়ে কথা হতো, পড়াশোনায় একে অন্যকে সাহায্য করত। তারা সবাই পরস্পর বন্ধু হলেও রোপেন ও কেয়া পরস্পর বেশ ঘনিষ্ঠ। রোপেনের পরিবারে বেশ কিছু সমস্যা ছিল কেয়ার সাথে কথা বলতে সে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত। কেয়ার প্রতি তার অন্যরকম একটি আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। কেয়াও তার প্রতি বেশ মনোযোগী ছিল। তার কথাগুলো সে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনত এবং তাকে বোঝার চেষ্টা করত। তাকে বেশ উৎসাহ দিত। যে কোন ব্যাপারে তারা পরস্পরকে সাহায্য করার আপ্রাণ চেষ্টা করত। আকাশ দলে সবার সঙ্গে সব কিছু করলেও রোপেনকে সে একবারে সহ্য করতে পারত না। রোপেনের বিষয়ে সে নানারকম কথা বলত। এতে অবশ্য রোপেন কিছু বলত না। একদিন আকাশ রোপেনকে তার সাথে এক জায়গায় যেতে অনুরোধ করল। রোপেন রাজি হলো। তাকে নিয়ে আকাশ একটি গোপন জায়গায় গেল। সেখানে গিয়ে সে রোপেনকে গাঁজা খেতে পরামর্শ দিল। সে বলল, গাঁজা খেলে তার কোন কষ্ট থাকবে না; পরিবারের সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। রোপেন কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না বলে তাকে সে বেশ বাজে বাজে কথা বলল। রোপেনকে সে এও বলল, 'তুই অন্য কারো সাথে মিশতে পারবি না এবং আজকের কথা কাউকে বলতে পারবি না।' রোপেন সেদিনের মতো রক্ষা পেল। এই ঘটনার পর থেকে আকাশ তাদের দল থেকে দূরে দূরে থাকতে লাগল। ঐক্য ও সাম্যকেও আকাশ বাসা থেকে টাকা চুরি করার বুদ্ধি দিয়েছে। তারাও আকাশের কথা শোনেনি এবং আজকাল তাকে এড়িয়ে চলছে। হঠাৎ একদিন শোনা গেল আকাশকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়ি থেকে টাকা চুরি করে আকাশ কোথায় যেন পালিয়ে গেছে।

তাহলে ভালো ও মন্দ বন্ধুর বৈশিষ্ট্য আমাদের জানতে হয়।

ভালো বন্ধু	মন্দ বন্ধু
বিশ্বস্ত	অবিশ্বস্ত
উদার	স্বার্থপর
আত্মনিবেদিত	সুবিধাবাদী
শুভাকাঙ্ক্ষী	প্রতারক
মনোযোগী শ্রোতা	কারো কথা শোনে না
পরিপক্কতা ও সমঝোতার মনোভাব	অপরিপক্ক ও অসহযোগিতার মনোভাব
সহমর্মী ও সহযোগী	হিংসুটে মনোভাব
নিঃশর্ত সহায়তাকারী	শর্ত আরোপ করার প্রবণতা
নিঃশর্ত ভালোবাসা	নিজের করে রাখার মনোভাব
স্বাধীনতায় বিশ্বাসী	প্রতিযোগিতা ও বিচারমূলক মনোভাব
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী	সবাইকে তার মতো হতে হবে
সুপরামর্শদাতা	কুপরামর্শদাতা

কাজঃ তোমার দুইজন ভালো বন্ধুর নাম লেখ এবং তাদের গুণগুলো উল্লেখ করো।

বিশ্বাসে সমৃদ্ধ জীবন

বন্ধুত্ব একটি অতি প্রাচীন ও সর্বজনীন মূল্যবোধ। মানব ইতিহাসে বন্ধুত্ব হলো বিশ্বাসের অভিজ্ঞতা। সুসম্পর্ক ও বন্ধুত্বের মধ্য দিয়েই মানুষ ঈশ্বর ও মানুষকে বিশ্বাস করতে শিখে। বিশ্বাস হলো জীবনের ভিত্তি। ঈশ্বর মানুষকে ভালোবেসে ও বিশ্বাস করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি চেয়েছেন মানুষ তাঁকে ভালোবাসবে, তাঁর ওপর আস্থা রাখেবে, তাঁকে বিশ্বাস করবে। ঈশ্বর চিরদিন মানুষের প্রতি বিশ্বস্ত থাকলেও মানুষ কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি অনেকবার অবিশ্বস্তই হয়েছে। তারপরও ঈশ্বর কিন্তু চিরবিশ্বস্তই থেকেছেন। তিনি বার বার মানুষকে নানাভাবে বোঝাতে চেয়েছেন পরস্পর পরস্পরের সাথে বিশ্বাস ও আস্থার মাধ্যমেই আমরা সমৃদ্ধ আনন্দময় জীবন গড়ে তুলতে পারি। খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসে সমৃদ্ধ জীবনের নানা ঘটনা ও দৃষ্টান্ত আমরা পবিত্র বাইবেলে দেখতে পাই।

১. প্রথম সামুয়েলের ২০তম অধ্যায়ে আমরা দাউদ ও যোনাথনের বন্ধুত্বের অপূর্ব সুন্দর ঘটনাটি দেখতে পাই। রাজা শৌল যখন হিংসার বশবর্তী হয়ে দাউদকে হত্যা করতে দৃঢ়সংকল্প, তখন রাজা শৌলের পুত্র যোনাথন তার বন্ধু দাউদকে কোনো না কোনোভাবে রক্ষা করেছেন। পিতার বিরোধিতা করেও তিনি তার বন্ধুর প্রাণ রক্ষা করেছেন। বন্ধুর প্রতি বিশ্বস্ততার এই অনন্য সুন্দর ঘটনাটি তাদের পরস্পরকে দিয়েছে একটি সমৃদ্ধ জীবন।

কাজঃ প্রথম সামুয়েল ২০তম অধ্যায় পাঠ করে দাউদ ও যোনাথনের বন্ধুত্বের ওপর একটি ছোট একাঙ্কিকা প্রস্তুত করো।

২. মথি লিখিত মঙ্গল সমাচারের ১২: ২৮-৩০ এ যীশু বলছেন–

"তোমরা, শ্রান্ত যারা, বোঝার ভারে ক্লান্ত যারা, তোমরা সকলেই আমার কাছে এসো: আমি তোমাদের বিশ্রাম দেবো! তোমরা কাঁধে তুলে নাও আমারই জোয়াল, আমারই শিষ্য হও তোমরা: কারণ আমি যে কোমল, বিনম্র-হৃদয় আমি। দেখো, পাবে তোমরা প্রাণের আরাম, কেননা জোয়াল আমার সুবহ, বোঝাও আমার লঘুভার!" এই কথার মধ্যে যীশুর বন্ধুসুলভ আমন্ত্রণ রয়েছে। বিশ্বাসে সাড়া দিয়ে আমরা তাঁর বন্ধু হয়ে উঠলে তিনি কোমলতা, উষ্ণ ভালোবাসা, দয়া, প্রশান্তি ও মমতায় আমাদের জীবন ভরিয়ে তুলবেন। তাই অসীম বিশ্বাসে তাঁর বন্ধু হয়ে উঠলে আমরা হয়ে উঠব সমৃদ্ধ।

৩. যোহন ১৩: ২৩ "শিষ্যদের মধ্যে একজন, যাকে যীশু বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন, সে তখন তাকিয়ায় হেলান দিয়ে তাঁর পাশ ঘেঁষেই বসে ছিল।" যীশু তাঁর সব শিষ্যদেরই ভালোবাসতেন, স্নেহ এবং বিশ্বাস করতেন। তাঁদের সান্নিধ্য ও সাহচর্য তিনি উপভোগ করতেন। যোহনকে তিনি একটু ভিন্ন বা বিশেষ স্নেহের চোখেই দেখতেন। যোহনও তা বুঝতেন। এই বিশ্বাস ও ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়েই তাঁর লিখিত মঙ্গলসমাচারে যীশুকে অনেক গভীরভাবে তিনি উপস্থাপন করতে পেরেছিলেন। এটি ছিল তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও ভালোবাসার অভিজ্ঞতা। এ কারণেই তাঁরা হতে পেরেছিলেন অনেক বেশি আন্তরিক ও অন্তরঙ্গ।

৪. যোহন ১৫: ১২-১৫খ: "আমার আদেশ হলো এই: আমি যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি, তোমরাও তেমনি পরস্পরকে ভালোবাসবে। বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালোবাসা আর কিছুই নেই। তোমরা আমার বন্ধু– অবশ্য আমি তোমাদের যা করতে বলেছি, তোমরা যদি তাই কর। আমি তোমাদের আর দাস বলছি না, কারণ প্রভু যে কী করছেন, দাসের তো তা জানার কথা নয়। তোমাদের আমি এই জন্যেই বন্ধু বলছি যে, আমার পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি, সবই তোমাদের জানিয়েছি।"

৫. বাইবেলের পুরাতন নিয়মের বেন সিরা পুস্তকের ৬: ৫-১৭-এ আমরা দেখেছি বন্ধুকে ঘিরে বিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসের আলোকে জীবন আলোকিত করার একটি অপূর্ব সুন্দর নির্দেশনা। বিশ্বস্ত বন্ধু মণি-মুক্তার চেয়ে দামি, একটি নিরাপদ আশ্রয়। যাকে লাভ করে আমরা সত্যি সত্যি ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে উঠি।

আমাদের জীবনে কে এই প্রকৃত বন্ধু যে সত্যি সত্যি আমাদের জন্য দিতে পারেন একটি সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী জীবন? তিনি হলেন যীশু, যিনি যোহন, পিতর, লাজার, মেরী ম্যাগডেলিন, শামারীয় নারী– সবাইকে সেই জীবন দিয়েছিলেন। প্রকৃত বন্ধুর সব গুণাবলি যীশুর মধ্যে রয়েছে। অন্য সব বন্ধুরা অবিশ্বস্ত হলেও তারা আমাদের সাথে প্রতারণা করলেও যীশু কিন্তু কোন দিন আমাদের ছেড়ে যান না। সাধু-সাধ্বীগণ ও যারা বিশ্বাসে সবল ছিলেন তারা কিন্তু ঠিকই তাঁদের জীবনকালে এই কথা বুঝেছিলেন। এ কারণে তাঁরা নিজেদের জীবন দিয়ে যীশুকে ভালোবেসেছিলেন। যেমন: সাধু পল, ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা, মাদার তেরেজা, আভিলার সাধ্বী তেরেজা, ক্রুশভক্ত সাধু যোহন, সিয়েনার সাধ্বী তেরেজা, সাধ্বী মারীয়া গরেটি প্রমুখ। যীশু আমাদেরও বন্ধু। তিনি প্রতিনিয়ত আমাদের মধ্যে আছেন। তিনি আমাদের ভালোবাসেন। তিনি আমাদের স্বাধীন করে তোলেন। তিনি আমাদের আশা-নিরাশা, আনন্দ, দুঃখ-বেদনা, নিঃসঙ্গতা সব বোঝেন। অনেক সময় আমরা তা বুঝি না।

যীশুকে আমাদের ব্যক্তিগত বন্ধু বলে মনে করি না। যীশুকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, কারণ তিনি আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। তিনি আমাদের বন্ধু বলে গ্রহণ করেছেন। যীশুর প্রতি বিশ্বাস আমাদের জীবনকে অর্থপূর্ণ ও আনন্দময় করে তুলবে।

কাজ: ১. যীশুর সাথে তোমার সম্পর্ক কী রকম? যীশুর সাথে সম্পর্ক গভীর করার জন্য তুমি কী করো? দলে তা সহভাগিতা করো।

কাজ: ২. দলে বন্ধুত্ব স্থাপনের কৌশলসমূহ আলোচনা ও লিপিবদ্ধ করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

একসাথে গান করি:

তুমি আমার বন্ধু যীশু, তুমি মম সাথী
অন্ধকারে তুমি যে মোর পথ দেখানো বাতি।।
তুমি আমার পালক প্রভু, ভুলে আমার যাও না কভু
চোখে চোখে রাখ মোরে তুমি দিবস রাতি।।
তুমি সাথে আছ প্রভু, করি না আর ভয়
আসুক যত কঠিন বাধা হবে আমার জয়।
ওগো পাপীর পরিত্রাতা, তুমি আমার মুক্তিদাতা
তোমায় পেয়ে দুখের মাঝে আনন্দে তাই মাতি।।

–লেখক : মাণিক নাথ

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বন্ধুত্বের মাধ্যমে কী দূর হয়ে যায়?

ক. নিঃসঙ্গতা
খ. অভাববোধ
গ. অসহায়বোধ
ঘ. দুশ্চিন্তা

২. যীশু মানুষকে বন্ধু বলেছেন কেন?

ক. সুসম্পর্কের জন্য
খ. আন্তরিকতার জন্য
গ. সমাজের জন্য
ঘ. ভালোবাসার জন্য

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শ্রেয়া ও ঐশী দুই বান্ধবী। তারা মিলেমিশে পড়াশোনা করে। কিন্তু ঐশী যখন পরীক্ষায় ফলাফল ভালো করে তখন শ্রেয়া ঐশীকে সহ্য করতে পারে না। ঐশী কিন্তু শ্রেয়ার সাথে খারাপ আচারণ করেনি; বরং একই রকম সুসম্পর্ক বজায় রাখে।

৩. শ্রেয়ার মধ্যে বন্ধুত্বের কোন বৈশিষ্ট্যের অভাব রয়েছে?

ক. সহমর্মিতার
খ. মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার
গ. গ্রহণযোগ্যতার
ঘ. দরদের

৪. শ্রেয়ার সাথে ঐশীর সম্পর্ক –

i. আন্তরিকতার
ii. সহযোগিতার
iii. অন্তরঙ্গতার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কে আমাদের প্রকৃত বন্ধু হতে পারে?
২. বিশ্বস্ত বন্ধুর উপকারিতা উল্লেখ করো।
৩. ভালো ও মন্দ বন্ধুর ৩টি বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করো।
৪. মথি লিখিত মঙ্গল সমাচার ১২: ২৮-৩০ পদে যীশু কী বলেছেন?
৫. তোমার বন্ধুর কয়েকটি ভালো দিক উল্লেখ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বিমল ধনী পিতামাতার একমাত্র সন্তান। স্কুলের পড়াশোনা সমাপ্ত করে কলেজে ভর্তি হয়েছে। সেখানে বেশ কয়েক জনের সাথে তার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। বিমলের সম্পদের লোভে বন্ধুরা তাকে দলনেতা বানিয়েছে। বন্ধু শিশির বুঝতে পারল যে অন্যান্য বন্ধুদের মনোভাব বেশি ভালো নয়। তাই শিশির বিমলকে বন্ধুদের সাথে মেলামেশার ব্যাপারে সচেতন হতে পরামর্শ দেয়। পরবর্তীতে তাকে সঙ্গ দেয় ও সব সময় পড়াশোনায় সাহায্য করে।

ক. বিশ্বস্ত বন্ধুকে কীসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?
খ. বন্ধুত্ব বলতে কী বুঝ?
গ. শিশির বিমলের কী ধরনের বন্ধু–তা ব্যাখ্যা করো।
ঘ. বিমল ও শিশিরের বন্ধুত্বের ফলাফল মূল্যায়ন করো।

২. তনয়, সোহেল, চঞ্চল, প্রতিমা ও অভি সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী। শিক্ষাঙ্গনে তাদের অবদান অনেক। সোহেল পড়াশোনায় একটু দুর্বল। তাই বন্ধু মহল থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। একপর্যায়ে সে দুষ্ট বন্ধুদের সাথে মেলামেশা আরম্ভ করে। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, নিয়মিত স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। অভি সোহেলের ঘটনাটি লক্ষ করে। অভি স্কুলের পর সোহেলের বাড়িতে যায়। সোহেলের মানসিক অবস্থা সে বুঝতে পারে। সোহেলকে পুনরায় সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য যথেষ্ট সময় দেয়, পড়াশোনা বুঝতে সাহায্য করে, সৎপথে ফিরে আসতে উৎসাহিত করে।

ক. মানুষের জন্মের উদ্দেশ্য কী?

খ. বন্ধুত্ব গড়ার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

গ. অভি সোহেলের কী ধরনের বন্ধু—বর্ণনা করো।

ঘ. 'সোহেল ভালো ও মন্দ বন্ধুর দ্বারা প্রভাবিত'—উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো।

সপ্তম অধ্যায়

পুরুষ ও নারী

কেউ যখন আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে তখন আমরা সচরাচর আমাদের নাম ও বংশপরিচয় দিয়ে থাকি। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেরই এর চাইতে বড় একটি পরিচয় আছে। আর তা হলো আমরা প্রত্যেকেই মানুষ। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককেই মনুষ্যত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন নিজের প্রতিমূর্তিতে, পুরুষ ও নারী করে। আমরা নারী-পুরুষ হলেও আমাদের প্রত্যেকের সমান মর্যাদা ও অধিকার রয়েছে। সেই কারণে সবার প্রতি প্রেম বা ভালোবাসার মনোভাব পোষণ করা আমাদের প্রত্যেকেরই দরকার।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- ঈশ্বর কর্তৃক পুরুষ ও নারী হিসেবে মানুষ সৃষ্টির বিষয় বর্ণনা করতে পারব;
- নারী-পুরুষের সুস্থ সম্পর্ক বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নারী-পুরুষের সমতা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ভালোবাসা সম্পর্কে প্রেরিত পলের শিক্ষা বিশ্লেষণ করতে পারব এবং
- নারী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল হবো।

ঈশ্বরের সৃষ্টি পুরুষ ও নারী

আমাদের চারপাশের সমস্ত কিছু পরম করুণাময় প্রভু ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজেই ভালোবাসা এবং তাঁর নিজের এই ভালোবাসা দিয়ে তিনি পরম যত্নে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। অন্য সবকিছু সৃষ্টি করার পর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এই মানব সৃষ্টির মধ্য দিয়ে শুরু হলো পৃথিবীতে নরনারীর রহস্যময় ইতিহাস।

ঈশ্বর মানুষের বাসযোগ্য করে এই পৃথিবীর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করার পর তাঁর আপন প্রতিমূর্তিতে ও আপন সাদৃশ্যে প্রথম মানব আদমকে সৃষ্টি করলেন এবং তাঁকে নিয়ে এদেন উদ্যানে রাখলেন। কিন্তু পরে এক সময় ঈশ্বর বললেন, মানুষের একা থাকা ভালো নয়। তাই ঈশ্বর তাঁরই মতো করে এমন আর একজনকে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করলেন, যে তাকে সাহায্য করবে ও তার যোগ্য সঙ্গী হবে। তাই আদমের ওপর গভীর তন্দ্রার আবেশ নামিয়ে এনে তাঁর একটি পাঁজর খুলে নিয়ে তিনি তা মাংস দিয়ে ঢেকে দিলেন। আদমের বুক থেকে খুলে নেওয়া সেই পাঁজর দিয়ে ঈশ্বর একজন নারীকে গড়ে তুললেন। এরপর তাঁকে আদমের কাছে নিয়ে এলেন। আদম তাঁকে দেখে আনন্দে অভিভূত হয়ে বলে উঠলেন, এই হলো আমার অস্থির অস্থি, মাংসের মাংস। এর নাম নারী হবে, কেননা নরদেহ থেকেই তাকে তুলে আনা হয়েছে।

ঈশ্বরের পরিকল্পনায় পুরুষ ও নারী

পুরুষ ও নারী করে মানুষকে সৃষ্টি করা ছিল ঈশ্বরের নিজস্ব পরিকল্পনা এবং একান্ত ইচ্ছা। এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে দুইটি দিক। একদিকে মানব ব্যক্তি হিসেবে পূর্ণ সমতা ও অন্যদিকে নিজ নিজ সত্তায় পুরুষ ও নারীরূপ। পুরুষ হওয়া বা নারী হওয়া হলো একটি সত্য যা ভালো ও ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রসূত।

মানুষের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো–মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গড়া। ঈশ্বর অনাদি অনন্ত। তিনি ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। সেই ঈশ্বর মানুষের মধ্যে দিয়েছেন অমর আত্মা। পবিত্র, ন্যায়বান, প্রেমময় ঈশ্বর মানুষের মধ্যেও দিয়েছেন পবিত্রতা, ন্যায্যতা ও ভালোবাসা। মানুষকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন সকল সৃষ্টির ওপর সেবা ও যত্ন করার উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর এক। নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করে তাদের দুইজনকে তিনি এক করেছেন।

সকল সৃষ্টির পরে মানুষকে সৃষ্টি করে ঈশ্বর দেখলেন, সকল সৃষ্টির দেখাশোনা করার জন্য তাঁর সহকর্মী প্রয়োজন। কারণ ঐ সৃষ্টিগুলো অন্যান্য সৃষ্টিকে তাঁর মতো করে দেখাশোনা করার যোগ্যতা অর্জন করেনি। ঐগুলো তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট ছিল না। মানুষকে সৃষ্টি করে ঈশ্বর তৃপ্ত হলেন। পূর্ণ তৃপ্তির জন্য ঈশ্বর মানুষের মধ্যে নিজের প্রতিমূর্তি, নিজের সাদৃশ্য দিলেন।

শুরুতে ঈশ্বর শুধু একজন পুরুষ ও একজন নারী সৃষ্টি করেছেন। এর অর্থ এই যে, একজন পুরুষের মাত্র একজন স্ত্রী থাকবে এবং একজন নারীর একজন স্বামীই থাকবে। তারা দুজনই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গড়া। এই কারণে দুইজনেই সমান মর্যাদার অধিকারী। ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ষষ্ঠ দিনে, সকল সৃষ্টি সমাপ্ত করার পর। এর অর্থ হলো, মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টজীব। সে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গড়া হলেও ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মে তার কোন হাত নেই। নিজের প্রতিমূর্তিতে গড়ে তাকে তিনি দায়িত্ব দিয়েছেন সৃষ্টিকে দেখাশুনা করার।

কাজ: জোড়ায় জোড়ায় বসে ঈশ্বরের সৃষ্ট পুরুষ বা নারী হিসেবে তুমি তোমার অনুভূতি সহভাগিতা করবে।

নারী-পুরুষের সুস্থ সম্পর্ক

সম্পর্ক হলো ভাবের আদান–প্রদান। একজন মানুষ তার মনের ভাব বা ইচ্ছা অন্য একজন মানুষের কাছে প্রকাশ করবে, এটাই স্বাভাবিক। সুস্থ সম্পর্ক আমাদের সহায়তা করে সুন্দরভাবে ভাবের আদান–প্রদান করতে। ভালো বা সুস্থ সম্পর্ক একে অন্যের আরও কাছাকাছি যেতে সাহায্য করে।

আমরা জানি, মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধভাবে বাস করা তার স্বভাব। সমাজের সবার সাথে একটা সুন্দর সম্পর্ক থাকবে, সেটাই সকলে কামনা করে। কিন্তু সম্পর্কটা যখন দুই বিপরীত লিঙ্গের মধ্যে হয়, তখন অনেকের বেলায় একটা অহেতুক ভয় বা দ্বিধা কাজ করে। এটা রক্ষণশীল সমাজে আরও বেশি হয়। এই কারণে আমাদের এই পর্যায়ে সুন্দর মানসিকতা নিয়ে গড়ে উঠতে হবে। আমাদের ভালোভাবে বুঝতে হবে যে, আমরা প্রত্যেকে একই ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি।

নারী ও পুরুষ একই ঈশ্বরের সৃষ্টি। ঈশ্বর নারী ও পুরুষকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন যা আমরা পূর্বেই জেনেছি। মানুষ হিসেবে নারী ও পুরুষ এক হলেও শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে কিছু ভিন্নতা রয়েছে। একে অন্যের চাওয়া-পাওয়া, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির মধ্যে সেই ভিন্নতা বেশি করে লক্ষ করা যায়। তাই নারী-পুরুষের সুস্থ সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে যেহেতু এই বিষয়গুলো বেশি প্রভাব বিস্তার করে তাই সব সময় সচেতন থাকতে হয়।

নারী-পুরুষের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক বলতে সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে বোঝায়: একে অন্যকে সম্মান করা বা মর্যাদা দেওয়া, বুঝতে পারা, একে অন্যের প্রয়োজনে ভাইবোনসুলভ মনোভাব নিয়ে

পাশে দাঁড়ানো, বন্ধুসুলভ মনোভাব পোষণ করা, দৈহিক লালসাকে নিজের আয়ত্তে রেখে মানবীয় দিকের প্রতি প্রাধান্য দেওয়া: একে অন্যের প্রতি দরদবোধ বা সহানুভূতি দেখানো। এসবের মধ্য দিয়ে একে অন্যের কাছাকাছি আসা ও ভাবের আদান-প্রদান করা।

নারী ও পুরুষের মধ্যে এ বিষয়গুলোর অভাব ঘটলে সেখানে আর সুস্থ সম্পর্ক থাকে না। তখন নারী পুরুষের সম্পর্কটা সীমাবদ্ধ হয়ে যায় শুধুমাত্র ভোগের মধ্যে। মানুষ তখন একে অন্যকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে। শুধুমাত্র নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য একে অন্যকে ব্যবহার করে। তখন মানবীয় দিকটি বাদ পড়ে যায় বা তা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পায়। ফলে পরস্পরের মধ্যে দেখা দেয় সন্দেহ, স্বার্থপরতা, পারিবারিক ভাঙন, পারস্পরিক অশ্রদ্ধা বা অমর্যাদা ইত্যাদি। ফলে ঘটে নৈতিক অবক্ষয়—যা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ তথা গোটা মানবতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা মানবজীবনে মোটেই কাম্য নয়।

কাজঃ এবার আমরা নিচের ছকটি ব্যক্তিগতভাবে পূরণ করব। প্রয়োজনবোধে ছকের ঘরের সংখ্যা আরও বাড়ানো যেতে পারে।

নারী ও পুরুষের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে উভয়ের ভূমিকা :

নারীর ভূমিকা	পুরুষের ভূমিকা
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.

পারিবারিক বা দাম্পত্যজীবনে নারী-পুরুষের সম্পর্ক

পারিবারিক বা দাম্পত্যজীবনে নারী-পুরুষের সুস্থ সম্পর্ক বলতে বিবাহিত জীবনের মধ্য দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার সম্পর্ককে বোঝায়। ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করার পর বলেছেন, মানুষের একা থাকা ভালো নয়। আর তাই তাঁরই মতো করে আর একজনকে সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে তিনি স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তারা হৃদয়ের টানে একে অপরের কাছে আসে এবং প্রত্যেকে একে অপরের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করে। খ্রীষ্টভক্তদের জন্য তা একটি পবিত্র সাক্রামেন্ত যা গ্রহণের মধ্য দিয়ে স্বামী-স্ত্রী ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করে। তারা তাদের ভালোবাসার দায়িত্ব গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সৃষ্টি কাজে তাদের নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে। কাজেই এই সম্পর্ক পবিত্র। এই সম্পর্কের মর্যাদা ও পবিত্রতা বজায় রাখা খ্রিষ্টীয় স্বামী-স্ত্রীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

কাজঃ শ্রেণিকক্ষের কয়েকজন ভালো বক্তা নিয়ে "পুরুষ ও নারীর সুস্থ সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকাই অধিক" এই বিষয়ের ওপর বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে। যারা বিতর্কে অংশগ্রহণ করবে না তারা মন দিয়ে শুনবে ও পরে মতামত ব্যক্ত করবে।

নারী-পুরুষের সমতা

আমরা আগেই জেনেছি, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে ঈশ্বর তাঁর আপন প্রতিমূর্তিতে, আপন সাদৃশ্যে এবং পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি প্রতিটি মানুষকে স্ব-স্ব মর্যাদা ও সম্মান দান করেছেন। তাই পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোনো ধরনের ভেদাভেদ বা পার্থক্য থাকতে পারে না। তারা সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে প্রত্যেকে সমান। তবে শারীরিক গঠন ও মানসিক ধ্যান-ধারণা বা চিন্তাধারার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে, যা আমরা প্রত্যেকেই জানি ও স্বীকার করি। এই ভিন্নতা সৃষ্টিকে আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে, মানুষকে করে তুলেছে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক বা সহায়ক।

মানুষ হিসেবে আমরা প্রত্যেকে একক সত্তার অধিকারী বা স্বতন্ত্র। মানুষ হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আমরা আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনায় অনন্য। পুরুষ বা নারী বলে কেউ ছোট বা বড়—তা নয়। তেমনিভাবে কোন এক শ্রেণির মানুষ কম বুদ্ধিমান আবার আর এক শ্রেণির মানুষ বেশি বুদ্ধিমান, এক শ্রেণি উঁচু স্তরের আবার এক শ্রেণি নিচু স্তরের—তা নয়। মানুষ হিসেবে মর্যাদার মাপকাঠিতে আমরা পুরুষ ও নারী সবাই সমান।

নারী-পুরুষের অসমতার ধারণা

অনেকে মনে করেন, ঈশ্বর আদমের পাঁজর থেকে হবাকে সৃষ্টি করেছেন বলে পৃথিবীতে নারীজাতি দ্বিতীয় শ্রেণির। ফলে পুরুষ সব সময় নারী জাতির ওপর তার সব ক্ষমতা, প্রভাব ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে থাকবে অর্থাৎ নারী জাতিকে সব সময় হেয় জ্ঞান করবে, এমনটি হওয়া ন্যায্যতার প্রকাশ নয়। অন্য একটি বিষয় হলো পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থা। আমাদের দেশে পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থার কারণে এক শ্রেণির পুরুষ সব সময় নারীদেরকে তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করে আসছে। ফলে তাদের সুবিধা আদায়ের জন্য নারী জাতিকে ঘরকণো করে নিজেদের আয়ত্তে রাখতে চেষ্টা করছে। বাংলাদেশের ন্যায় একটি উন্নয়নশীল দেশে এর প্রভাব প্রকট। ফলে নারী বিভিন্ন নিয়মের বেড়াজালে দিনের পর দিন নিষ্পেষিত হচ্ছে।

ছকপূরণ : নারী ও পুরুষের মধ্যেকার বৈষম্যসমূহ ও তার দূরীকরণের উপায়সমূহ নির্ণয় করো (প্রয়োজনে ঘরের লাইন বাড়ান যেতে পারে)

নারীর-পুরুষের বৈষম্যের ক্ষেত্র	বৈষম্যগুলো দুর করার উপায়
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.
৫.	৫.

২০১৫

ভালোবাসা ও সাধু পলের শিক্ষা

প্রভু যীশুখ্রীষ্ট এই জগতে এসেছেন মানুষের মাঝে ঈশ্বরের ভালোবাসার পরিচয় তুলে ধরতে ও এর বিস্তার ঘটাতে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় ধনী-গরিব, উঁচু-নিচু, শিক্ষিত-অশিক্ষিত–সর্বস্তরের মানুষকে ভালোবেসেছেন ও কাছে টেনে নিয়েছেন। যারা তাঁকে ভালোবেসেছে তিনি শুধু তাদেরই ভালোবাসেননি। তিনি তাঁর শত্রুদেরকেও ভালোবেসেছেন, তাদের ক্ষমা করেছেন ও প্রয়োজনে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি নিজে ভালোবেসে আমাদেরকে ভালোবাসার মানুষ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

ভালোবাসা কী?

সাধু পৌল করিন্থীয়দের কাছে তাঁর প্রথম পত্রে ভালোবাসা সম্পর্কে আমাদেরকে একটা পরিষ্কার ধারণা দিয়েছেন। আমরা খুব বড় মাপের দানশীল মানুষ হতে পারি বা খুব জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান হতে পারি অথবা খুব সুন্দর সুন্দর কথা মানুষের ভাষায় বা স্বর্গদূতদের ভাষায় বলতে পারি। কিন্তু আমাদের অন্তরে যদি ভালোবাসা না থাকে তাহলে সাধু পৌলের কথা অনুসারে আমরা কিছুই নই। অর্থাৎ ভালোবাসা না থাকলে আমাদের কোনো মূল্যই নেই। তাঁর কথানুসারে ভালোবাসা হলো:

"আমি যদি মানুষের ও স্বর্গদূতদের ভাষায় কথা বলতে পারি, অথচ আমার অন্তরে যদি ভালোবাসা না থাকে, তাহলে আমি ঢং ঢঙানো কাঁসর বা ঝনঝনে করতাল ছাড়া আর কিছুই নই! . . . আর আমি যদি প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণা করতে পারি, যদি উপলব্ধি করতে পারি সমস্ত রহস্যাবৃত সত্য, জানতে পারি ধর্মজ্ঞানের সমস্ত কথা, যদি আমার অন্তরে থাকে পর্বত সরিয়ে দেবার মতো পূর্ণ বিশ্বাস, অথচ অন্তরে না থাকে ভালোবাসা, তাহলে আমি তো কিছুই নই!. . . আর আমি যদি আমার অন্তরে সমস্ত কিছুই দীনদরিদ্রের মধ্যে বিলিয়ে দিই, এমন কি আমার নিজের দেহ-ও আগুনে সঁপে দেই, অথচ আমার অন্তরে যদি না থাকে ভালোবাসা, তাহলে তাতে আমার কোনো লাভই নেই।" (১ করি ১৩:১-৩)।

সাধু পলের মতে, ভালোবাসার মধ্যে কোন অসহিষ্ণুতা, নিষ্ঠুরতা, হিংসাবিদ্বেষ, রুক্ষতা ইত্যাদি থাকতে পারে না। তিনি বলেন:

"ভালোবাসা নিত্য-সহিষ্ণু, ভালোবাসা স্নেহকোমল। তার মধ্যে নেই কোনো ঈর্ষা। ভালোবাসা কখনো বড়াই করে না, উদ্ধতও হয় না, রুক্ষও হয় না। সে স্বার্থপর নয়, বদমেজাজিও নয়। পরের অপরাধ সে কখনো ধরেই রাখে না। তার বিশ্বাস সীমাহীন, সীমাহীন তার আশা ও তার ধৈর্য।" (১ করি ১৩: ৪-৭)।

সাধু পল তিনটি ঐশগুণের কথা তুলে ধরেন। গুণগুলো হলো: বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসা। কারণ আমরা প্রত্যেকে ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রয়োজন অনুসারে এই তিনটি গুণ বা দান পেয়েছি। এই গুণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রধানটি হলো ভালোবাসা। তিনি বলেন:

"ভালোবাসার মৃত্যু নেই। প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণা? তা তো একদিন মূল্যহীন হয়ে যাবে। অজ্ঞাত ভাষায় কথা বলা? তা তো একদিন শেষ হয়ে যাবে। ধর্মীয় জ্ঞান? তা-ও তো মূল্যহীন হয়ে যাবে, কারণ আমাদের সমস্ত জানা-ই যে অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ আমাদের সমস্ত প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণা। কিন্তু যা পূর্ণ, তা যখন আসবে, তখন যা-কিছু অসম্পুর্ণ, তা সবই অসার হয়ে যাবে। ... আপাতত বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসা, এই তিনটিই থেকে যাচ্ছে বটে কিন্তু ভালোবাসাই সর্বশ্রেষ্ঠ।" (১ করি ৮-১০, ১৩)।

ভালোবাসা সম্পর্কে অনেক কিছুই বলা যায়। বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। তবে ভালোবাসা সম্পর্কে বলতে পারা বা ব্যাখ্যা করতে পারাই সবকিছু নয়। ভালোবাসা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারা হলো মুখ্য বিষয়। ভালোবাসা হলো পবিত্র। এখানে কখনো কোন শর্ত থাকে না। বরং শর্তহীন ভাবে হৃদয়ের টানে যখন পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি আসে, পরস্পরের কথা চিন্তা করে, পরস্পরের মঙ্গল কামনা করে তা-ই প্রকৃত ভালোবাসা। ভালোবাসা মানুষকে মহান করে তোলে।

কাজঃ খ্রিষ্টের শিক্ষানুসারে কীভাবে পরস্পরের সাথে সুস্থ ভালোবাসার সম্পর্ক গড়া যায় তা দলে আলোচনা করো।

নীতিভ্রষ্ট মানুষের মন পরিবর্তনের প্রতি যীশুর শিক্ষা

যীশুর সংস্পর্শে এসে এক পাপী নারী ভক্তিপ্রাণা হয়ে উঠল : (লুক ৭:৩৬-৫০)

একদিন ফরিসিদের একজন যীশুকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানালেন। সেই ফরিসির বাড়িতে এসে যীশু খাবার আসনে বসলেন। সেই সময়ে একটি মেয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলো; শহরে সে পাপের জীবনযাপন করত। যীশু ফরিসিদের বাড়িতে খেতে বসেছেন শুনে সে সাদা ফটিকের একটি পাত্রে করে সুগন্ধি তেল নিয়ে এসেছিল। যীশুর পেছনে তাঁর পায়ের কাছে এসে সেখানেই সে বসে রইল; সে কাঁদছিল; যীশুর পা দুইখানি তার চোখের জলে ভিজে যেতে লাগল। সে তখন নিজের মাথার চুল দিয়ে তাঁর পা দুইটি মুছিয়ে তা চুম্বন করল আর সেই সুগন্ধি তেল তাতে মাখিয়ে দিলো। তাই দেখে যে-ফরিসি যীশুকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন: 'লোকটা প্রবক্তা হলে তো বুঝতেই পারত, যে-মেয়ে এখন ওকে স্পর্শ করছে, সে কে, কেমন-ধারার মেয়ে। বুঝতেই পারল, সে একটা পাপিনী!'

তখন তাঁর এই মনের চিন্তার উত্তর দিতে গিয়ে যীশু বললেন: 'সিমোন, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে!' তিনি উত্তর দিলেন: 'বলুন গুরু!' যীশু বললেন: 'এক মহাজনের কাছে দুইজন লোকের ঋণ ছিল: একজনের দেনা ছিল পাঁচশত রূপোর টাকা আর একজনের পঞ্চাশ রূপোর টাকা। তাদের শোধ করার ক্ষমতা না থাকায় মহাজন দুইজনেরই দেনা মাপ করে দিল।

এখন বলুন, এই দুইজনের মধ্যে কে মহাজনটিকে বেশি ভালোবাসবে?' সিমোন উত্তর দিলেন: 'আমার তো মনে হয়, মহাজন যার বেশি দেনা মাপ করেছে, সে-ই তাকে বেশি ভালোবাসবে!' যীশু বললেন: 'ঠিক কথাই বলেছেন।' তারপর সেই মেয়েটির দিকে ফিরে তিনি সিমোনকে বললেন: 'আপনি এই মেয়েটিকে দেখছেন তো? আমি আপনার বাড়িতে এলাম, অথচ আপনি আমাকে পা ধোবার জল দিলেন না। এই মেয়েটি কিন্তু তার চোখের জলে আমার পা দুটো ভিজিয়ে দিলো: মুছিয়ে দিলো নিজের চুল দিয়েই। আপনি তো আমাকে চুম্বন করে স্বাগত জানালেন না; এ কিন্তু আমি এখানে আসার সময় থেকেই আমার পা দুইটাতে চুম্বন করেই চলছে! আপনি তো আমার মাথায় একটু তেল মাখিয়ে দিলেন না; এ কিন্তু আমার পায়ে সুগন্ধি তেল মাখিয়ে দিলো! তাই আমি আপনাকে বলছি, এর পাপ, এর যে-বহু পাপ, তা ক্ষমা করাই হয়েছে। এর এতখানি ভালোবাসাই তো সেই ক্ষমার প্রমাণ। যাকে অল্প ক্ষমা করা হয়, সে অল্পই ভালোবাসে।' তারপর তিনি মেয়েটিকে বললেন: 'তোমার পাপ ক্ষমা করাই হয়েছে!' যারা সেখানে তাঁর সঙ্গে খেতে বসেছিল, তারা মনে মনে বলতে লাগল: 'কে এই লোক, যে কিনা পাপও ক্ষমা করে?' যীশু তখন মেয়েটিকে বললেন: 'তোমার বিশ্বাসই তোমাকে উদ্ধার করেছে! এবার যাও তুমি, শান্তিতেই থাকো!'

উপরের শাস্ত্রাংশে দেখতে পাই যে ঐ মেয়েটি যে পাপী ছিল তা সকলেই জানত। মেয়েটি যীশুকে স্পর্শ করলে লোকে মন্দ বলবে তা জেনেও যীশু মেয়েটিকে কিছু বলেননি। মেয়েটি তাঁর পা স্পর্শ করেছে। শেষে তিনি

মেয়েটিকে বললেন, 'তোমার পাপ ক্ষমা করাই হয়েছে!' যীশুকে কি অস্বাভাবিক বলে মনে হয়? অন্যেরা এ ধরনের মেয়েকে যেভাবে দেখে যীশু কেন সেভাবেই দেখেননি? এ ধরনের মানুষের প্রতি আমার মনোভাব কেমন? আমি কি শিষ্টাচারী? আমি কি নিজের পবিত্রতা বা সদগুণের জন্য গর্বিত বা অহংকারী? আমি কার দলে–যীশুর না ফরিসিদের? তিনি শুধু অনুতাপীদেরই ক্ষমা করেন। আমরা সকলেই যীশুর ক্ষমা পেতে পারি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঈশ্বর আদমের পাঁজর দিয়ে কাকে বানালেন?

ক. মারীয়াকে
খ. যীশুকে
গ. হবাকে
ঘ. সাধু যোসেফকে

২. মানুষের একা থাকা ভালো নয় কারণ তার–

i. সঙ্গীর প্রয়োজন
ii. সাহায্যের প্রয়োজন
iii. ত্যাগের প্রয়োজন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. i ও ii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

অপূর্ব বিদেশে থাকেন। প্রায়ই তিনি টেলিফোনে তার স্ত্রী বিথির সাথে কথা বলেন। তিনি তার স্ত্রীকে এতই ভালোবাসেন, যে কারণে তিনি বেশি দিন বিদেশে না থেকে স্বদেশে চলে আসেন।

৩. স্ত্রীর সাথে অপূর্বের কথা বলার মধ্য দিয়ে কী প্রকাশ পায়?

ক. কঠোর মনোভাব
খ. সচেতন সম্পর্ক
গ. ভাবের আদান-প্রদান
ঘ. সামাজিকতা

৪। অপূর্ব ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে–

ক. সরলতা
খ. শিল্প নৈপুণ্য
গ. ভালো সম্পর্ক
ঘ. শ্রদ্ধা ও ভক্তি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ঈশ্বর মানুষকে নারী ও পুরুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন কেন?

২. নারী-পুরুষের মধ্যে সুসম্পর্ক রাখা উচিত কেন?

৩. নারী-পুরুষের সমতা বলতে কী বোঝায়?

৪. ভালোবাসা সম্পর্কে সাধু পলের শিক্ষা কী?

৫. নারী-পুরুষকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হয় কেন?

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অরুণ ও রুনা একে অপরকে ভালোবাসে। দুইজনই দুইজনকে খুব উপলব্ধি করে। প্রতিদিন তারা দেখা করে কথা বলে। নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলে। তাদের মধ্যে পবিত্র ভালোবাসার সম্পর্ক চলছে। তবে অরুণ রুনাকে এতই ভালোবাসে যে সে রুনাকে খুব কাছে পেতে চায়। রুনাও অরুণকে ভীষণ ভালোবাসে। তবে তার পারিবারিক এবং ধর্মীয় সুশিক্ষা দ্বারা রুনা বৃদ্ধি লাভ করেছে। এজন্য সে ভালোবাসার পবিত্রতা সম্পর্কে অরুণকে বোঝাতে সক্ষম হয়।

ক. ঈশ্বর মানুষকে কততম দিনে সৃষ্টি করেছেন?

খ. ঈশ্বর মানুষকে তার প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করলেন কেন?

গ. অরুণ ও রুনার মধ্যে যীশুর কী ধরনের শিক্ষা বিদ্যমান – ব্যাখ্যা করো।

ঘ. ধর্মীয় ও পারিবারিক সুশিক্ষা রুনার মাধ্যমে অরুণ গ্রহণ না করলে তাদের সম্পর্কের পরিণতি কী হতে পারে– তা বিশ্লেষণ করো।

২. জলি ও তুলি পাড়া-প্রতিবেশী এবং বান্ধবী। তারা দুইজনে যেকোন জায়গায় একত্রে যায়, একত্রে থাকে। তারা দুইজন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে একজন আরেকজনের বিপদে আপদে সব সময় পাশে থাকবে। তুলিদের পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো ছিল না বলে জলি তাকে প্রায়ই সাহায্য সহযোগিতা করত যেন তুলির লেখাপড়া চালিয়ে যেতে সমস্যা না হয়। একদিন দুই বান্ধবী রাস্তায় চলার সময় ছিনতাইকারীরা তাদেরকে আটক করে ঘিরে ফেলে। ছিনতাইকারীরা জলির গলা থেকে মূল্যবান স্বর্ণের গহনা খুলে নিতে চেষ্টা করছিল। এমতাবস্থায় জলির বিপদে পাশে না থেকে তুলি নিজে বিপদমুক্ত হতে ঐ স্থান ছেড়ে চলে গেল।

ক. সাধু পল কয়টি ঐশগুণের কথা তুলে ধরেন?

খ. বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসার মধ্যে ভালোবাসা প্রধান কেন?

গ. জলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ভালোবাসার কোন শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে – বর্ণনা করো।

ঘ. তুলির আচরণ পরিবর্তন না করলে তার পরিণতি কেমন হবে বলে তুমি মনে কর? তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

অষ্টম অধ্যায়

স্বাধীনতা ও জীবনাহ্বান

ঈশ্বর আমাদেরকে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সারা বিশ্বের জন্য তাঁর একটা পরিকল্পনা আছে। আমরা ক্ষুদ্রতম হলেও বিশ্বেরই একেকটি অংশ। আমাদেরও কোনো না কোনো ভূমিকা আছে এই পৃথিবীতে। কী সেই ভূমিকা? তা আবিষ্কার করার এখনই আমাদের সময়। বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনাহ্বান সম্পর্কে জানা, বিভিন্ন গুরু ব্যক্তির সাথে আলাপ-আলোচনা করা এবং নিজে ব্যক্তিগতভাবে ধ্যান-প্রার্থনা করার মাধ্যমে আমরা নিজ নিজ জীবনাহ্বান আবিষ্কার করব এবং সেই আহ্বানে সাড়া দেবো। এভাবেই আমাদের জীবনে প্রকৃত সুখ খুঁজে পাব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- জীবনাহ্বানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- আমাদের স্বাধীন হওয়ার জন্য ঈশ্বরের আহ্বানের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- আহ্বান ও জীবনের পারস্পরিক সম্পৃক্ততা বিশ্লেষণ করতে পারব;
- নিজ আহ্বানের প্রতি দায়বদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে পারব এবং
- ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুক্ত-স্বাধীন মানুষ হবো।

জীবনাহ্বানের গুরুত্ব

একবার একটি ছোট্ট মেয়ে তার মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, সে জীবনে সুখী হতে পারবে কি না এবং স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারবে কি না। তার মা তাকে উত্তর দিয়েছিলেন, ভবিষ্যৎকে দেখা যায় না। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিয়ে কিছু বলা বা করা যায় না। আসলে যে ব্যক্তি যত বেশি নিজের জীবন আহ্বান সম্বন্ধে সচেতন, সে ব্যক্তি তত বেশি স্বাধীন। জীবনাহ্বান আমাদের প্রত্যেকের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা বিভিন্নজন বিভিন্ন আহ্বান পেয়েছি। আমাদের সেই আহ্বান আবিষ্কার করতে হয় এবং সেভাবে সাড়া দিতে হয়। খ্রিষ্টান হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের আহ্বান হলো স্বাধীনতার আহ্বান।

সুখী জীবন লাভের জন্য ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুন্দর আশা ও স্বপ্ন থাকলে, সে অনুসারে চলতে বা সে লক্ষ্যে পৌছতে সবাই দায়িত্বশীল হবে। নিজের ভবিষ্যৎকে গড়ার জন্য প্রত্যেকের দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব অনুসারে জীবনযাপন করতে হয়। তবেই প্রত্যেকের জীবন সুখের ও সুন্দর হতে পারে।

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুই ধরনের ধারণা আছে। কেউ কেউ বলে থাকে, ভবিষ্যৎ বলতে কিছু নেই। তারা বর্তমানকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে এবং বর্তমানকে সর্বশক্তি দিয়ে উপলব্ধি ও উপভোগ করে। অনাগত ভবিষ্যৎকে নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে বর্তমানে সুখী হওয়াটাই তারা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। অনেক সময় বাস্তবতার কারণে ভবিষ্যতের স্বপ্ন পূরণ হয় না, যেমন একজন মেধাবী ছাত্র ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে স্কুল ছেড়ে কাজ করতে হয়েছে। সে এখন গাড়ির গ্যারেজে কাজ করছে।

আবার কেউ কেউ মনে করে, ঈশ্বর যদি আমাদের ভবিষ্যৎ রচনা করে থাকেন তবে আমাদের কোন স্বাধীনতা নেই ভবিষ্যতকে বেছে নেওয়ার। ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারেই আমাদের জীবনে সব কিছু ঘটবে। উল্লিখিত এসব ধারণা আমাদের কাছে কী বলে? আমাদের কি জীবন আহ্বান আবিষ্কার করার স্বাধীনতা আছে?

কাজঃ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তোমার ধারণা কী? তোমার কি ভবিষ্যৎ স্বপ্ন আছে? খাতায় তা লেখ ও পরস্পরের সাথে সহভাগিতা করো।

স্বাধীন হওয়ার আহ্বান

আহ্বান আবিষ্কার করা ও বেছে নেওয়াই জীবনের চূড়ান্ত বিষয় নয়। আমাদের পারিপার্শ্বিকতা ও জীবন অবস্থার সাথে আহ্বান ওতপ্রোতভাবে জড়িত—তা দ্বারা আমরা প্রভাবিত হই। আমরা আহ্বানকে জীবন থেকে আলাদা করে দেখতে পারি না।

একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, অনিলের স্বল্প আয়ের বাবা একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি। সে তার মাসিক আয়ের একটি বড় অংশ মদ্য পান করে শেষ করে, যার ফলে সে তার পরিবারের ভরণপোষণ ও অনিলের পড়ালেখার খরচ জোগাতে পারে না। অনিল খুবই মেধাবী ছাত্র। তার খুব ইচ্ছা সে ডাক্তার হবে। পারিবারিক বাস্তবতার কারণে স্কুল জীবন পার হতে না হতেই অনিলকে একটা কাজ নিতে হয়েছে। কয়েক বছর কাজ করার পর সে কাজ আর পড়াশুনা একসাথে চালাতে লাগল। এভাবে মাস্টার্স শেষ করার মাধ্যমে সে তার কর্মস্থলে ম্যানেজার পদ লাভ করল যার ফলে বিধবা মা ও ছোট ভাইয়ের পড়াশোনার খরচ ও সংসারের ব্যয় সে চালাতে পারছে।

এক্ষেত্রে, অনিল তার জীবনাহ্বান বেছে নেওয়ার জন্য কতটুকু স্বাধীন ছিল? কীভাবে তার অপূর্ণ ইচ্ছা পূরণ হলো। সে কি অন্য কোনভাবে নিজেকে ধাবিত করতে পারত? তাতে কী ফল হতো?

আসলে মানুষের স্বাধীনতার কোন চূড়ান্ত সমাপ্তি নেই। স্বাধীনতা মানুষের ইতিহাস, শিক্ষা, পারিপার্শ্বিকতা, চলমান বাস্তবতা, সামাজিক ও পারিবারিক কৃষ্টি, সংস্কৃতি, অভ্যাস, বৃদ্ধি ও সমসাময়িক অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

স্বাধীনতা কী?

বাংলা ভাষায় 'স্বাধীনতা' শব্দটি বুৎপত্তিগতভাবে দুইটি শব্দ থেকে আগত: স্ব (নিজ) + অধীনতা। কাজেই স্বাধীনতার অর্থ হলো নিজেকে নিজের অধীনে রাখা। যে ব্যক্তি বা দেশ নিজেকে নিজের অধীনে রাখতে বা নিজেকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারে, তখন তাকে স্বাধীন ব্যক্তি বলা যায়। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি বা দেশ নিজেকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারে না, সে ব্যক্তি বা দেশ স্বাধীন নয়; সে পরাধীন।

স্বাধীনতা প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার। এটি একটি সর্বজনীন মূল্যবোধ যা সারা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। এই স্বাধীনতা শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্যন্ত সবার কাম্য। মায়ের কোলের যে শিশু, সে-ও স্বাধীনভাবে তার হাত-পা নাড়া-চাড়া করতে চায়; একটু বড় হলে নিজের মতো করে হামাগুড়ি

দিতে চায়; হাঁটতে ও দৌড়াতে চায়। তার স্বাধীনতা ব্যাহত হলে সে ছট্‌ফট্‌ করে, কান্নাকাটি করে। একজন বিবাহিত নারীও স্বাধীনভাবে তার স্বামী-সন্তানদের সাথে বিবাহিত জীবনযাপন করতে চায়। শ্বশুর-শাশুড়ি বা অন্য কারো দ্বারা তার এই স্বাধীনতা বিঘ্নিত হলে অনেক ক্ষেত্রে তারা আলাদা সংসার গড়ে তোলে। অনেক বৃদ্ধ পিতামাতা যখন উপলব্ধি করেন যে, তাদের উপার্জনশীল ছেলে বা বউমা দ্বারা তাদের স্বাধীনতা বিঘ্নিত হচ্ছে, তারা তখন সেই সন্তানকে আলাদা করে দিয়ে নিজেরা স্বাধীন জীবনযাপন করতে পছন্দ করেন। বৃদ্ধ বয়সে ছেলে বা বউমার অধীনতা অনেক বৃদ্ধ পিতামাতা মেনে নিতে পারেন না।

আমরা এখন কয়েকজনের জীবনের বাস্তব কাহিনী থেকে বুঝতে চেষ্টা করব স্বাধীনতা কী এবং কখন একজন ব্যক্তি স্বাধীন।

জীবন কাহিনি ১

আমি যখন ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী ছিলাম তখন নতুন পরিবেশে, নতুন শ্রেণিতে আমি একজন ভীতু ছাত্রী ছিলাম। আমি নিজে থেকে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম না, এমনকি নিজ উদ্যোগে কোন কাজও করতে পারতাম না। কোন কিছু করার পর আমি সব সময় আশা করতাম অন্যেরা আমার প্রশংসা করুক। প্রশংসা না পেলে আমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে থাকত। স্কুলের প্রধান শিক্ষক একদিন আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না কেন তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। আমি ভাবছিলাম, আমি কি কোন ভুল করেছি? আমার আচরণ দিয়ে আমি কি কোনভাবে তাঁকে বা স্কুলের কারো মনে আঘাত দিয়েছি? আমি নিজে এর কোন উত্তর খুঁজে পেলাম না। তাই আমি তাঁর ধমক খাওয়ার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য! দুরু দুরু বুকে আমি প্রধান শিক্ষকের অফিসকক্ষে প্রবেশ করলাম। তিনি অনেক খুশি হয়ে আমার প্রশংসা করলেন এবং বাবা-মাকে দেবার জন্য তাঁর প্রস্তুত করা একটি প্রতিবেদন আমাকে দিলেন। ওহ্! আমি তখন হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। আমি প্রধান শিক্ষককে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর অফিসকক্ষ ত্যাগ করলাম। কী যে ভালো লাগছিল! আনন্দে লাফাতে ইচ্ছে করছিল! আমি এখন ভয় আর দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত। আমি স্বাধীন।

জীবন কাহিনি ২

আমি তখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। একবার আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আমার অবস্থা এতই খারাপ হয়ে পড়েছিল যে, স্কুলে যাওয়াও আমার বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধুদের সাথে ক্রিকেট খেলা বন্ধ হয়ে গেল। অথচ ক্রিকেট ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় খেলা। আমাকে সব সময় ডাক্তারের নির্দেশ অনুসারে চলতে হতো। আমার শরীর খুবই দুর্বল হয়ে পড়ল এবং ভালোভাবে হাঁটতেও পারতাম না। ফলে আমি সবসময় মনোকষ্টে ভুগতাম। ঈশ্বরের কৃপায় আমি ধীরে ধীরে সেরে উঠতে লাগলাম। আমার মনে পড়ে, যখন আমি পুরোপুরি সেরে ওঠার পর প্রথম দিন স্কুলে গেলাম, বন্ধুদের সাথে আনন্দ করলাম আর ক্রিকেটও খেলতে পারলাম। সেদিন আমি ভীষণ আনন্দ পেয়েছিলাম। আমি দৈহিক অসুস্থতা থেকে মুক্ত! আমি ডাক্তারের বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত! আমি স্বাধীন!

জীবনাহ্বান ও মানবজীবন

মানুষের একটি আহ্বান হলো সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের মতো হওয়া। কেননা ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে নিজের রূপে ও সাদৃশ্যে সৃষ্টি করেছেন (আদি ১ঃ২৬)। তাই মানুষের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ আহ্বানই হলো স্রষ্টা-ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বা ছবি হয়ে ওঠা এবং তাঁরই রূপ ধারণ করা। সৃষ্টিকর্তা যেমন সুন্দর, নির্মল-পবিত্র, প্রেমময় ও শান্তিময়, প্রত্যেক মানুষের আহ্বান হলো ঠিক তেমনি হয়ে ওঠা, সেই রূপে বৃদ্ধি পাওয়া, জীবনযাপন করা এবং অন্যের সামনে ঈশ্বরের দেওয়া সেই রূপ সুন্দর করে তুলে ধরা।

পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মে মথি লিখিত সু-সমাচারে যীশু সব মানুষকেই সেই আহ্বানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেনঃ "তোমরা পবিত্র বা খাঁটি হও, ঠিক যেমন তোমাদের স্বর্গীয় পিতা পবিত্র বা খাঁটি" (মথি ৫:৪৭)। ঈশ্বরের মতো হয়ে ওঠাই যে মানুষের সবচেয়ে বড় জীবন-আহ্বান, যীশু সেই কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন। যীশু তাঁর ত্রি-বিধ প্রেরণ-কর্ম, তথা প্রচার, শিক্ষাদান এবং নিরাময়করণ–এর মধ্য দিয়ে মানুষকে ঈশ্বরের মতো হয়ে ওঠার বা ঐশ-রূপ ধারণের বাণী প্রচার করে গেছেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও তাঁর একটি গানে সেই সু-মহান জীবন-আহ্বানের কথাই সব মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেনঃ

"অরূপ তোমার বাণী
অঙ্গে আমার চিত্তে আমার মুক্তি দিক সে আনি... ।"

কবিগুরু বলেছেন যে, সব মানুষের জন্য মুক্তি, পরিত্রাণ, মোক্ষ-লাভ বা নির্বাণ হলো মানুষের দেহ-মন-প্রাণে পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টিকর্তার রূপ ধারণ করা। মানুষ যে জাতি-ধর্ম-বর্ণেরই হোক না কেন, সবারই মুক্তি চিরকাম্য। সবার জন্যে সেই একই আহ্বান, যেহেতু সবার স্রষ্টা এক–যিনি পরম সত্য-সুন্দর, প্রেমময়-শান্তিময় ঈশ্বর।

পরম প্রেমময় ঈশ্বর কখনোই কারো ওপর সেই আহ্বান বলপূর্বক চাপিয়ে দেন না। মানুষকে তিনি আহ্বান করেন, যেন সে স্বাধীনভাবে ও স্বেচ্ছায় তাঁর এই ঐশ-আহ্বানে সাড়া দেয়। কেননা এই ঐশ-আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মধ্যেই মানবজীবনের সফলতা ও পূর্ণতা নিহিত রয়েছে। এই আহ্বানে যে ব্যক্তি সাড়া দেয় না এবং ঈশ্বরের মতো হতে চায় না, মানব জন্ম ও জীবন তার জন্যে অর্থহীন ও বৃথা।

আহ্বানে সাড়া দান

ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে স্বাধীন সত্তা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কেননা ঈশ্বর নিজেই স্বাধীন, তিনি কারো অধীন নন। প্রত্যেক মানুষকে তিনি তাঁর নিজ রূপ এবং সাদৃশ্যে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র বাইবেলে আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের ২৬ পদে ঈশ্বর বলেন, "এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে মানুষ সৃষ্টি করি।" কাজেই আমরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের মহৎ পরিকল্পনা অনুসারেই স্বাধীন মানুষরূপে সৃষ্ট হয়েছি।

স্বাধীনতার মধ্যেই রয়েছে সত্যিকার আনন্দ এবং মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ। স্বাধীনতা মানুষের গঠন ও বিকাশে উৎসাহিত করে; মানব ব্যক্তিত্বকে মহত্ত্ব ও গৌরব দান করে। অন্যদিকে, স্বাধীনতাহীনতা মানব-

জীবনকে পর্যুদস্ত করে, জীবনকে অর্থহীন করে তোলে; জীবনের সৌন্দর্যের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে। এটা যেকোনো মানুষের জন্যে যেমন সত্য, তেমনি কোনো প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের বেলায়ও সত্য।

স্বাধীনতা মানুষের এক অদম্য ক্ষুধা ও আকাঙ্ক্ষা। কেননা, পরাধীনতায় কেউ বাঁচতে চায় না। একটি ছোট্ট শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্যন্ত সকলেই স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে চায়। তার এই স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা বাধাগ্রস্ত হলে বা স্বাধীনতার ক্ষুধা অপূর্ণ থাকলে শুরু হয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত, শুরু হয় স্বাধীন জীবনের জন্যে সংগ্রাম। এই সংগ্রাম সংঘাত হতে পারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে; পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে; কর্তৃপক্ষ ও অধীনস্থদের মধ্যে।

স্বাধীনতার মধ্যে রয়েছে এক পরম আনন্দ। মানুষ স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে চায়, স্বাধীনতার আনন্দকে প্রাণভরে উপলব্ধি করতে চায়। স্বাধীনতার এই আনন্দ তার জীবনকে উচ্ছ্বসিত ও উৎসাহিত করে সুন্দর কিছু সৃষ্টির জন্যে। স্বাধীনতা তাকে অনুপ্রাণিত করে সুন্দর করে বেঁচে থাকার জন্যে, আর এসব তার জীবনে এনে দেয় মহিমা ও গৌরব; উপহার দেয় প্রতিষ্ঠা ও সম্মান। অন্যদিকে, পরাধীনতা কর্মস্পৃহা ও উদ্যমকে নষ্ট করে দেয়; জীবনের প্রাণ-চাঞ্চল্য ও গতিকে বাধাগ্রস্ত করে দেয়; জীবনকে আনন্দবিহীন ও নীরস করে তোলে।

স্বাধীনতা মানবজীবনে দায়িত্বশীলতার সৃষ্টি এবং এর বিকাশ ঘটায়। স্বাধীন ব্যক্তি তার প্রতিটি কাজ কর্ম লেখা ও কথার জন্যে দায়ী থাকে বলে সে আরো চিন্তাশীল হয়। তাকে ভাবতে হয় তার প্রতিটি কাজ, কথা ও লেখা নিজের ও অন্যের জন্যে কতটুকু কল্যাণকর বা অকল্যাণকর; তা নিজের বা অন্যের কতটুকু উপকার বা অপকার করছে। স্বাধীনতা তাই সর্বদা অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। একজন সত্যিকার স্বাধীন ব্যক্তি সর্বদা পরের কল্যাণে ব্রতী; অন্যের অমঙ্গল হয় এমন কিছু করা, বলা বা লেখা থেকে তার চিন্তা চেতনা ও কর্মকাণ্ড দূরে রাখে।

স্বাধীনতা সর্বদা সুন্দর ও পবিত্র। ঈশ্বর নিজেই স্বাধীন থেকে এর পবিত্রতাকে রক্ষা করেছেন। ঈশ্বর চির মঙ্গলময়; তিনি সর্বদা বিশ্বাসীদের মঙ্গল সাধন করেন। কারো কোনোরূপ অনিষ্ট করা স্বাধীনতার সৌন্দর্য ও পবিত্রতাকে নষ্ট করে দেয়। কেননা স্বাধীনতার মুল শিক্ষাই হলো নিজের ও অন্যের কল্যাণ। অসুন্দর ও অনিষ্টকর কিছু করা কখনো স্বাধীনতা হতে পারে না। সেই অধিকার কাউকে দেওয়াও হয়নি।

সত্যিকার স্বাধীনতা সৃজনশীলতার সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটায়। এ যেন নদী বা ঝরনাধারার মতো নিজ গতিতে স্বাধীনভাবে এঁকেবেঁকে বয়ে চলে। নদী বা ঝর্ণার এই বয়ে চলার মধ্যেই রয়েছে মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। যেমন করে নদী বা ঝরনা তার চলার পথের ভূমিকে সৌন্দর্য-গরিমায় ও সম্পদে ঐশ্বর্যশালী করেছে, ঠিক তেমনি স্বাধীনতা মানুষের মধ্যে সৃজনশীলতা সৃষ্টি করে তাকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে। স্বাধীনতা বাধাপ্রাপ্ত হলে সৃজনশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়; ফলে মানব-ব্যক্তিত্বের বিকাশও বাধাগ্রস্ত হয়। মানুষের জীবন তখন এক আজ্ঞাবাহ দাসে পরিণত হয়।

কাজঃ শ্রেণিতে ধর্মীয় আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন এমন কয়েকজন গুরুত্বপুর্ণ ব্যক্তির ছবি প্রদর্শন করা হবে। এর মাধ্যমে আহ্বান এবং আহ্বানে সাড়াদানের মাধ্যমে প্রকৃত স্বাধীন হওয়ার অর্থ ব্যাখ্যাও করা হবে। তোমরা ছবিতে প্রদর্শিত ব্যক্তিদের জীবন থেকে প্রকৃত স্বাধীন হওয়ার বৈশিষ্ট্যগুলোর একটা তালিকা প্রস্তুত করবে।

স্বাধীনতা ও দায়বদ্ধতা

স্বাধীনতা বা মুক্তি বিভিন্ন রকম হতে পারে এবং তা বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সংযুক্ত। নিম্নে আমরা কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, যা স্বাধীন বা মুক্ত ব্যক্তি হওয়ার সাথে সম্পর্কিত।

১. স্বাধীনতা ও আমার আমিত্ব

অন্তরের গভীর থেকেই মুক্ত বা স্বাধীন মানুষ হওয়ার প্রেরণা জেগে ওঠে। আমি আমার মতো করে গড়ে উঠতে চাই; নিজ নামে, নিজ পরিচয়ে বেড়ে উঠতে চাই। আমি আমার নিজের পছন্দ-অপছন্দ, রুচিবোধ, শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে বেড়ে উঠতে চাই। আমি অনেকের ভিড়ে হারিয়ে যেতে চাই না; নিজের পরিচয়ে, নিজের স্বকীয়তায়, নিজের মান-মর্যাদায় বড় হতে চাই। আমি যে রকম সেভাবেই গ্রহণীয় হয়ে উঠতে চাই। অন্যরা আমাকে যা হতে বলে শুধু সেই রকম হওয়ার মাধ্যমেই নয়।

২. স্বাধীনতা ও ভালোবাসা

স্বাধীনতার সাথে ভালোবাসার একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আমি কার সাথে মেলামেশা করব বা কাকে ভালোবাসব সে বিষয়ে আমার স্বাধীনতা রয়েছে। কারো কারো প্রতি আমি হৃদয়ের আকর্ষণ অনুভব করি এবং তাদের সাথে আমি বন্ধুত্ব গড়ে তুলি। আবার কারো কারো প্রতি আমি তেমন কোনো আকর্ষণ অনুভব করি না বলে তাদের সাথে আমার ভালোবাসার সম্পর্কও তেমনভাবে গড়ে ওঠে না। অন্যদিকে, আমি যাদের ভালোবাসি এবং যারা আমাকে ভালোবাসে, তাদের সান্নিধ্য আমাকে আনন্দ দেয়। আমার সম্বন্ধে তাদের মতামতকে আমি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করি।

৩. স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীলতা

স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, আমি আমার খেয়াল-খুশিমতো যা ইচ্ছা তা-ই করব। স্বাধীনতা কতগুলো নিয়ম-কানুনের অধীন যা আমাকে মেনে চলতে হয়। যেমন, ঢাকা শহরে কখনো দেখা যায় পুলিশ লোকজনকে গাড়ি চলার রাস্তা থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে আর বলছে, 'ফুটপাথ দিয়ে হাঁটুন' 'ওভারব্রিজ দিয়ে রাস্তা পার হোন' 'ট্রাফিক সিগ্‌ন্যাল মেনে চলুন।' এছাড়াও আমাদের পরিবারে, সমাজে, মণ্ডলীতে আরও অনেক নিয়ম আছে। যেমন, 'এটা করবে' 'ওটা করবে' ইত্যাদি। আমাকে তা মানতে হচ্ছে, শৃঙ্খলার জন্যে, দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যে। তাই দায়িত্বহীন স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলারই নামান্তর। দায়িত্ব ছাড়া স্বাধীনতা মূল্যহীন।

৪. স্বাধীনতা হলো মন্দতা থেকে মুক্তি

বাংলাদেশে সর্বত্র অন্যায় ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণহীনভাবে চলছে। যেমন: চুরি, ডাকাতি, মারামারি, ঘুষ, যৌতুক, নারী-নির্যাতন, শিশু-নির্যাতন, পারিবারিক কলহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদিসহ আরো কত কী। শুধু দেশে-বিদেশে নয়, আমার নিজের মধ্যেও কত মন্দতা বিদ্যমান। কখনো বাজে কথা বলি, অন্যকে কড়া কথা বলে আঘাত করি, রাগ করি, চুরি করি, মিথ্যা কথা বলি, পিতামাতা ও গুরুজনদের অবাধ্য হই, এছাড়া আরও কত রকমের মন্দ কাজ করি। আমার নিজেকে প্রশ্ন করা প্রয়োজন: আমি কীভাবে নিজেকে সর্বপ্রকার মন্দের হাত থেকে মুক্ত রাখতে পারি এবং একজন স্বাধীন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারি।

৫. মুক্তি ও স্বাধীনতার উৎস ঈশ্বর

সারা বিশ্বে ও দেশের মধ্যে এত মন্দতা ও অশান্তি দেখে কখনো কখনো নিরাশ হয়ে পড়ি। নিজের জীবনের মন্দতা নিয়েও হতাশায় ভুগি। কী করে এসব মন্দতা থেকে মুক্ত হতে পারি? জগতে এমন কে আছেন যিনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন আমার জীবনের মন্দতা থেকে আমাকে মুক্ত করে একটি সুন্দর স্বাধীন জীবন উপহার দিতে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, একমাত্র ঈশ্বরই আমাকে সর্বপ্রকার মন্দতা থেকে রক্ষা করতে পারেন। আমি বরং তাঁরই ওপর নির্ভর করব। কেননা তিনিই আমার শক্তি ও মুক্তি। যীশুর মধ্য দিয়ে তিনি নিজেই এসেছেন আমাকে ও সব মানুষকে পাপ ও সমস্ত মন্দতা থেকে মুক্ত করতে এবং আমাদেরকে স্বাধীন করে তুলতে।

৬. স্বাধীনতা ও যীশুখ্রীষ্ট

যীশু এই জগতে এসেছেন আমাদেরকে মুক্ত স্বাধীন মানুষ হওয়ার পথ দেখাতে, যে-পথ আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়। তাঁর সত্যে যে বাস করে, সে-ই হয়ে ওঠে এক মুক্ত-স্বাধীন মানুষ। তাই যীশু বলেন: "তোমরা যদি আমার বাণী পালনে নিষ্ঠাবান থাক, তাহলেই তোমরা আমার যথার্থ শিষ্য; তাহলেই সত্যকে তোমরা জানতে পারবে আর সত্য তখন তোমাদের স্বাধীন করবে।" (যোহন ৮:৩১-৩২)। হ্যাঁ, একজন খ্রীষ্টান হিসেবে আমি যীশুর সত্যের মধ্যে বাস করতে চাই, তাঁর মতো মুক্ত বা স্বাধীন মানুষ হতে চাই। তাঁর দেখানো সত্য পথই হলো প্রকৃত মুক্তি ও স্বাধীনতার পথ।

এই মুক্তি বা স্বাধীনতার জন্যে অনেকে প্রাণ দিয়েছেন। যীশু নিজে মন্দের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং মানুষকে মন্দের হাত থেকে রক্ষা করতে প্রাণ দিয়েছেন। যীশুর মতো অনেক মহান ব্যক্তিত্ব মানুষের জীবনে মুক্তি বা স্বাধীনতা উপহার দিতে জীবন উৎসর্গ করেছেন। বাংলাদেশের শেখ মুজিবুর রহমান, ভারতবর্ষের মহান নেতা মহাত্মা গান্ধী, আমেরিকার মার্টিন লুথার কিং প্রমুখ মহান ব্যক্তি মানুষকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মন্দতা ও অন্যায় থেকে মুক্ত করতে প্রাণ দিয়েছেন। মন্দ থেকে মুক্ত-স্বাধীন মানুষ হতে চাইলে আমাদের ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

> কাজ: ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রকৃত স্বাধীন জীবনযাপন করছে এমন একজনের জীবন বেছে নিয়ে তার সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ।

সাধু পিতরকে যীশু তাঁর মেষদের দেখাশুনা করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। যোহন লিখিত মঙ্গলসমাচারের ২১:১৫-১৭ আমরা পাঠ করি ও এর অর্থ বুঝতে চেষ্টা করি।

সেদিন তাঁদের এই সকালের খাওয়াটা শেষ হওয়ার পর যীশু সিমোন পিতরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'যোহনের ছেলে সিমোন, তুমি কি আমাকে ওদের চেয়ে বেশি ভালোবাস?' পিতর উত্তর দিলেন: 'হ্যাঁ, প্রভু, আপনি তো জানেন, আমি আপনাকে ভালোবাসি।' যীশু তাঁকে বললেন: 'তাহলে তুমি আমার মেষশাবকদের দেখাশুনা কর!' তারপর দ্বিতীয়বার তিনি পিতরকে একই কথা জিজ্ঞেস করলেন; 'যোহনের ছেলে সিমোন, তুমি কি আমাকে ভালোবাস?' পিতরও উত্তর দিলেন: 'হ্যাঁ, প্রভু, আপনি তো জানেন, আমি আপনাকে ভালোবাসি!' যীশু তাঁকে বললেন: 'তাহলে তুমি আমার মেষদের পালন কর!' তারপর তৃতীয়বার তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: 'যোহনের ছেলে সিমোন, তুমি কি আমাকে ভালোবাস?' যীশু যে তাঁকে তৃতীয়বার

'তুমি কি আমাকে ভালোবাস?' এমন প্রশ্ন করছেন, তার জন্যে পিতর দুঃখ পেলেন। তিনি এবার বলে উঠলেন: 'প্রভু, আপনি তো সবই জানেন! আপনি তো জানেন, আমি আপনাকে সত্যিই ভালোবাসি!' যীশু তাঁকে বললেন: 'তাহলে তুমি আমার মেষদের দেখাশোনা করো।'

তুমি কি আমাকে ভালোবাস? যীশুর এই কথাটির নিচ দিয়ে দাগ দাও। এবার চোখ বন্ধ করো। মনে মনে কল্পনা করো যীশু তোমার কাছে আসছেন। এসে জিজ্ঞেস করছেন সেই একই প্রশ্ন তোমাকেও জিজ্ঞেস করছেন: 'তুমি কি আমাকে ভালোবাস? তুমি যীশুকে কী উত্তর দেবে? যীশু পিতরকে বললেন, আমার মেষদের দেখাশুনা কর। তোমাকেও যদি যীশু একই কাজ দেন তবে তুমি তা কীভাবে করবে? যীশু তোমাকে কী করার জন্য ডাকছেন?

কাজ: ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সহভাগিতা কর, যীশু তোমাকে কী করতে বলছেন?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'স্বাধীনতা' শব্দটি ব্যুৎপত্তিগতভাবে কয়টি শব্দ থেকে আগত?

ক. দুইটি

খ. তিনটি

গ. চারটি

ঘ. পাঁচটি

২. স্বাধীনতার অনুপস্থিতি–

i. কর্মস্পৃহা নষ্ট করে

ii. জীবনের গতিকে বাধাগ্রস্ত করে

iii. জীবনকে নীরস করে তোলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

রাজুর জীবনের লক্ষ্য লেখাপড়া শেষ করে ডাক্তার হবে। মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করবে। এ কারণে সে লেখাপড়ায় খুবই মনোযোগী। প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন করে যেন খুব ভালো রেজাল্ট করতে পারে।

৩. লেখাপড়ায় মনোযোগী হওয়ার মধ্য দিয়ে রাজুর মধ্যে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে?

ক. বাধ্যতা

খ. দায়িত্ববোধ

গ. জীবনাহ্বান

ঘ. বিশ্বস্ততা

৪. রাজুর এরূপ আচরণের ফলাফল হতে পারে–

i. জীবনের প্রতিষ্ঠা লাভ

ii. ভবিষ্যৎ স্বপ্ন পূরণ

iii. সুখী সুন্দর জীবন লাভ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. i ও ii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জীবনাহ্বান বলতে কী বুঝ?

২. জীবনাহ্বানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

৩. আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন ব্যাখ্যা করো।

৪. আহ্বান ও জীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো।

৫. কীভাবে ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুক্ত স্বাধীন মানুষ হওয়া যায়?

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. শিক্ষক মিলন ও রুবেলকে শ্রেণি ক্যাপ্টেন নিযুক্ত করে শ্রেণির শৃঙ্খলা রক্ষা করা, শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, শিক্ষককে ডেকে আনা, শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজের খাতা জমা নেওয়া, ফেরত দেওয়া কাজগুলো করতে বললেন। মিলন শিক্ষকের অর্পিত কাজগুলো যত্ন সহকারে সময়মত সম্পন্ন করে। কিন্তু রুবেল মেধাবী ছাত্র হয়েও সঠিকভাবে ও সময়মত কাজগুলো সম্পাদন করতে পারে না।

ক. মানুষের অদম্য ক্ষুধা ও আকাঙ্ক্ষা কী?

খ. স্বাধীনতা কীভাবে কলুষিত হয়?

গ. শিক্ষকের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মধ্য দিয়ে মিলনের মধ্যে স্বাধীনতা অর্জনের কোন বিষয়টি প্রকাশ পায়? তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. রুবেল তার কাজের মাধ্যমে জীবনের সৌন্দর্যের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে বলে কি তুমি মনে করো? তোমার মতামত দাও।

২. মিতার বাবা মা দুই জনই কর্মজীবী। দুই ভাইবোনের মধ্যে মিতা বড়। ছোটভাইকে সে খুব ভালোবাসে। ভাইয়ের প্রতি সে সর্বদা সচেতন। সে ভাইকে সময়মতো খাবার খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়, লেখাপড়ায় সাহায্য সহযোগিতা করে। দুই ভাইবোনের মধ্যে খুব সুন্দর সম্পর্ক বিদ্যমান।

ক. স্বাধীনতার সাথে কার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে?

খ. দায়িত্বহীন স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলারই নামান্তর বলতে কী বুঝ?

গ. মিতার মধ্যে স্বাধীনতা লাভের কোন বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে– ব্যাখ্যা করো।

ঘ. স্বাধীনতা লাভ করতে মিতার গুণগুলো যথেষ্ট কি না– তোমার মতামত দাও।

নবম অধ্যায়

পিতার সম্মুখে

আজকাল কোনো কোনো যুবক-যুবতী মনে করেঃ "প্রার্থনা করে কী লাভ?" "প্রার্থনা করা মানে সময় নষ্ট করা," "প্রার্থনা হলো কতগুলো বুলি আওড়ানো।" তাই কেউ কেউ প্রার্থনা করতে কোনো আগ্রহ বোধ করে না, উপাসনালয়ে যেতে চায় না। কেউ কেউ আবার তাচ্ছিল্যের সাথে এমনটিও বলেঃ "সত্যিই কি ঈশ্বর আছেন?" "সত্যিই কি স্বর্গ-নরক আছে?" রাশিয়ার নভোচারী গ্যাগারিনও রকেটে আকাশ ঘুরে এসে বলেছিলেন, "কোথাও ঈশ্বর নেই।" অনেক যুবক-যুবতী গির্জা-প্রার্থনায় না গিয়ে বরং বন্ধুদের সাথে গল্প-গুজব করতে এবং ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে।

কিন্তু তারা যদি এই নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করত, এই জীবনের উৎস কোথায়, কে আমাদের সৃষ্টি করেছেন, কোথায় আমরা যাব, কীভাবে সৃষ্টিকর্তাকে দেখা যায়, কোথায় তাঁকে পাওয়া যায় ইত্যাদি, তবে তাদের মন আলোকিত হতো। প্রার্থনার মধ্যেই এসব অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়। বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনা আমাদেরকে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়, তাঁর সাথে আমাদেরকে এক করে তোলে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- প্রার্থনার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- ঈশ্বরের কথা শুনতে পাওয়ার উপায় বর্ণনা করতে পারব;
- প্রার্থনা করার বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব এবং
- নিয়মিত প্রার্থনায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হবো।

প্রার্থনা

সাধারণ অর্থে প্রার্থনা হলো কিছু চাওয়া, যাচনা করা, মিনতি করা, ভিক্ষা করা, কোনো কিছুর জন্যে আবেদন করা বা আকুতি-মিনতি জানানো। আর আমরা প্রার্থনার সময় ঈশ্বরের কাছে অনেক কিছুই চেয়ে থাকি, যাচনা করি, তাঁর কাছে আবেদন জানাই। কিন্তু আমাদের প্রার্থনা শুধু এই 'যাচনা'-র পর্যায়ে সীমিত রাখা মোটেও ঠিক নয়। প্রার্থনার আরেকটি মহৎ দিক রয়েছে, যা চাওয়া-পাওয়ার চেয়ে অনেক বড়। প্রার্থনা যদি শুধু ঈশ্বরের কাছে চাওয়া এবং পাওয়ার ব্যাপার হয় তখন আমি নিজেকে ভিক্ষুকের সমপর্যায়ে নিয়ে আসি, ভিক্ষুক ও আমার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। কেননা একজন ভিক্ষুক বেঁচে থাকার তাগিদে বিভিন্ন মানুষের কাছে শুধু ভিক্ষা চাইতে থাকে। ভিক্ষা পেলে সে খুশি হয়, কিন্তু যখন ভিক্ষা চেয়ে পায় না, তখন সে অসুখী হয়। ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা এরূপ চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপার হলে আমাদের আচরণও ভিক্ষুকের মতো হতে পারে। অর্থাৎ আমরা তুচ্ছ ভিক্ষুক হয়ে যেতে পারি।

প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন, তাঁর পুণ্য উপস্থিতি অন্তরে অনুভব করা এবং বাস্তব জীবনে তাঁর প্রকাশ তুলে ধরা। অন্য কথায় বলা যেতে পারে, প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের উপস্থিতিতে বাস করা বা

তাঁর উপস্থিতি জীবনে উপলব্ধি করা। তাই প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের এক প্রেমময় সম্পর্কের ব্যাপার, যা চাওয়া-পাওয়ার চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। আমরা ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান, ভিক্ষুক নই। প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা প্রেমময় ঈশ্বরের সাথে আমাদের প্রেমের সম্পর্ক গভীর করি। আর তাঁর সাথে আমাদের মধুর সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে প্রার্থনায় আমরা তাঁর প্রতি প্রশংসা, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং আমাদের প্রয়োজনের কথা জ্ঞাপন করি।

প্রার্থনার গুরুত্ব

"প্রার্থনা করে কী লাভ হয়?" এই প্রশ্নের সহজ উত্তর বোধ হয় আরও দুইটি প্রশ্নের মাধ্যমে এভাবে দেওয়া যেতে পারে: "খাবার খেলে কী লাভ হয়?" বা "মানুষ খায় কেন?" এই দুইটি প্রশ্নের উত্তরে আমরা অবশ্যই বলব, মানুষকে বেঁচে থাকার তাগিদেই খাবার খেতে হয়। এর উত্তরে বলব, খাবার ছাড়া মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না, তাই তাকে খেতে হয়।

খাবার বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। শরীরের বিভিন্ন রকম প্রয়োজনের জন্যে মানুষকে বিভিন্ন ধরনের খাবার খেতে হয়। কিন্তু মানুষের জীবনটা শুধু দেহ বা শরীর নিয়ে গঠিত নয়, দেহ ছাড়াও রয়েছে মন ও আত্মা বা হৃদয়। কাজেই দেহকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে খাবারের প্রয়োজন। কেননা শুধু দৈহিক খাবার খেয়ে হৃদয়-মনকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। অনেক মানুষ রয়েছে যারা পেট ভরে খাওয়া সত্ত্বেও অসুখী, মুখে হাসি নেই, মনোকষ্টে ভুগছে, দুশ্চিন্তা-হতাশায় ভুগছে। তাদেরই কেউ কেউ আবার চুরি-ডাকাতি করছে, ঘুষ খাচ্ছে, নানান অন্যায় কাজ করছে। কাজেই শুধু দৈহিক খাবার মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না, তাকে প্রকৃত অর্থে সুখী করতে পারে না।

ঈশ্বরই আমাদের প্রকৃত খাদ্য যিনি আমাদের দেহ, মন ও আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখেন। তাঁকে ছাড়া আমরা বেঁচে থাকতে পারি না। তাই যীশু বলেন, "মানুষ কেবল রুটি (দৈহিক খাদ্য) খেয়েই বেঁচে থাকতে পারে না, বরং ঈশ্বরের বাণীকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করেই সে বেঁচে থাকতে পারে।" (মথি ৪:৮)। প্রার্থনা ও প্রভুর ভোজ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আমাদের আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ঈশ্বরকে সুস্বাদু খাদ্যরূপে গ্রহণ করি, তাঁর সাথে এক হই এবং তাঁর জীবনকে উপলব্ধি করি। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের মধ্যে প্রবেশ করি এবং তাঁকে আমাদের অন্তরে প্রবেশ করতে দিই।

প্রার্থনার জীবন ছাড়া কোনো মানুষ সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। প্রার্থনা হলো জীবনের চালিকাশক্তি। বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনা আমাদের ঈশ্বরের সাথে যুক্ত করে। কাজেই, প্রার্থনাবিহীন জীবন বা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসহীন জীবন মৃত, নিষ্প্রাণ। যেসব মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তাঁকে ডাকে না, তাঁর কাছে প্রার্থনা করে না, তারা অনেক সময় অসুখী, তারা হতাশা-নিরাশায় ভোগে। অনেক সময় তারা অনৈতিক ও অসুন্দর জীবনযাপন করে নিজেকে কলুষিত করে। অন্যদিকে, প্রার্থনা মানুষের জীবনকে সুন্দর করে, জীবনকে পবিত্র করে। প্রার্থনাশীল জীবন মানুষকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়, একেক জনকে সাধু-সাধ্বীর ন্যায় হতে সাহায্য করে।

ঈশ্বরের উপস্থিতি

প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হই ও তাঁর সাক্ষাতে উপস্থিত হই। ঈশ্বর যদিও সবসময় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন, আমরা কিন্তু তা সবসময় উপলব্ধি করি না। এটি যেন আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। আমরা অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারি না, তাই প্রতিনিয়ত আমরা বাতাসের সাথে অক্সিজেন গ্রহণ করে চলছি। আমরা সব সময় এই বিষয়ে সচেতন থাকি না। বরং আমরা অবচেতন মনেই এই অক্সিজেন বা প্রাণবায়ু গ্রহণ করে চলছি।

যখন একটু সচেতন হই, মাত্র তখনই আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, এই অক্সিজেন শ্বাসের সাথে গ্রহণ না করলে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে নির্ঘাত মারা যাবো। জলে বিচরণকারী মাছের দিকে তাকালে লক্ষ করা যায় যে, যখন মাছ ডাঙ্গায় তোলা হয় তখন সেগুলো বাঁচার তাগিদে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে কী লাফালাফিই না করে। অথচ যখন জলের ভিতর ছিল, তখন এই জীবনদায়ী জলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা হয়তোবা ততখানি উপলব্ধি করেনি।

ঠিক তেমনিভাবে আমরাও ঐশ-জীবনের মধ্যে ডুবে আছি, তাঁর জীবন-জল পান করে বেঁচে আছি। কিন্তু আমরা তা সব সময় উপলব্ধি করি না। যখন আমরা শান্ত মন নিয়ে নীরবে বসি এবং প্রার্থনায় প্রবেশ করি, তখন আমরা গভীরভাবে উপলব্ধি করি যে, আমরা তাঁর প্রেমময় উপস্থিতির মধ্যে রয়েছি। ঈশ্বর যেন অসীম এক জীবন-সমুদ্র, আর আমরা সবাই, ধনী-গরিব, পাপী-ধার্মিক সবাই তাঁর জীবন-জল পান করে চলেছি আর বেঁচে রয়েছি। এই জীবন-সমুদ্রেই আমাদের জীবন, অর্থাৎ ঈশ্বরের মধ্যেই আমাদের জীবন। জলের বাইরে যেমন মাছ বাঁচতে পারে না, ঠিক তেমনিভাবে ঈশ্বরকে ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। প্রার্থনার মধ্য দিয়েই আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করি, তাঁর সাক্ষাতে উপস্থিত হই, তাঁর প্রেম, শান্তি ও পবিত্রতা উপলব্ধি করি, যে ব্যক্তি প্রার্থনায় ও ধ্যানে যত বেশি তাঁর উপস্থিতি উপলব্ধি করে, সে তত বেশি তাঁর পবিত্রতা, প্রেম, শান্তি ও আনন্দ উপলব্ধি করে।

ঈশ্বরের কথা শোনা

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে মাদার তেরেজা (মাদার হওয়ার পূর্বে) যখন ট্রেনে চড়ে প্রার্থনা করতে করতে দার্জিলিং যাচ্ছিলেন, তখন তিনি স্পষ্ট শুনতে পেলেন একটি কণ্ঠস্বর: "সব কিছু ছেড়ে আস।" কয়েকবার স্পষ্ট ভাবে শুনতে পেলেন এই কণ্ঠস্বর। হ্যাঁ, এ তো ঈশ্বরেরই কণ্ঠস্বর। ঈশ্বর তাঁকে বলছেন তাঁর লরেটো ধর্ম-সংঘ ছেড়ে নতুন এক অজানা জীবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে। এ যেন আব্রাহামের মতো ঈশ্বরের আদেশে উর দেশ ছেড়ে এক অজানা নতুন এক দেশের দিকে যাত্রা। শুধু আব্রাহাম ও মাদার তেরেজা নন, ইতিহাসে আরো অনেক মানুষ খুঁজে পাব যারা নানাভাবে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনেছেন এবং সেই মতো সাড়াও দিয়েছেন। সাধু পিতর একদিন ছাদে প্রার্থনা করার সময় এমনি এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিলেন যে, একটা বড় চাদরের চারকোণ ধরে কারা যেন যত রকমের প্রাণী, যা ছিল ইহুদিদের কাছে 'অশুচি,' তা-ই তাঁর সামনে নামিয়ে দিচ্ছে আর বলছে, "পিতর, ওঠ, ওদের মেরে ফেল, আর খাও" (প্রেরিত ১০:১০-১৬)। এই অদ্ভুত দর্শনের মধ্য দিয়ে পিতরের কাছে প্রকাশ করা হয়েছিল যে, যীশু শুধু ইহুদি জাতির জন্যে নয়, বরং ইহুদিরা যাদেরকে

'অশুচি' মনে করে, সেই বিজাতি ও পৌত্তলিকদের জন্যেও যীশু এসেছেন। কেননা তিনি সকল জাতির এবং সকল মানুষের মুক্তিদাতা; শুধুমাত্র ইহুদিদের জন্যে নন।

কীভাবে ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কথা বলেন

আমরা বিভিন্নভাবে ঈশ্বরের কথা শুনতে পারি:

১. নীরবে প্রার্থনা ও ধ্যানে বসে আমরা তাঁর কথা শুনতে পাই।

২. পবিত্র শাস্ত্রের বাণী পাঠ ও ধ্যান করে তাঁর কথা শুনতে পাই।

৩. সৎ বিবেক হলো ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর। তাই আমাদের সুন্দর বিবেকের মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর কথা শুনতে পাই।

৪. গুরুজন ও সৎ বন্ধুদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের কাছে কথা বলেন। যখন আমি গুরুজনদের সুপরামর্শ শুনি, তখন আমি ঈশ্বরের কণ্ঠ শুনতে পাই।

৫. বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়েও ঈশ্বর আমাদের কাছে কথা বলেন। ধরি, প্রতিবেশীর কোন ঘরে আগুন লাগল, বা কেউ গাড়ি চাপা পড়ে দুর্ঘটনায় পড়ল। তাদের জন্য কিছু একটা করার জন্যে আমি অন্তরে তাড়না অনুভব করি এবং সাহায্য করতে এগিয়ে যাই। এ তো ঈশ্বরেরই কণ্ঠস্বর, যা আমাকে অন্যের বিপদে সাহায্য করতে তাড়না দিচ্ছে।

৬. মণ্ডলীর নেতৃবর্গ যেমন পোপ, বিশপ, পালক, প্রচারক, পুরোহিত, ব্রাদার, সিস্টার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের মধ্য দিয়েও ঈশ্বর আমাদের কাছে কথা বলেন, বিশেষভাবে তাঁরা যখন শাস্ত্র-বাণীর অর্থ আমাদের কাছে তুলে ধরেন এবং সুন্দর পরামর্শ দান করেন।

যীশু বলেন, যার কান আছে সে শুনুক। এর অর্থ হচ্ছে, ঈশ্বর অবিরত আমাদের জন্য কথা বলছেন। যদি তাঁর কথা শোনার মতো আমাদের ইচ্ছা বা আগ্রহ থাকে তবেই আমরা তা শুনতে পাব।

প্রার্থনার বিভিন্ন পদ্ধতি

আমরা যেসব প্রার্থনা করি তা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। একই ব্যক্তি স্থান-কাল-অবস্থা ভেদে বিভিন্ন রকমের প্রার্থনা করতে পারে। নিম্নে বিভিন্ন ধরনের প্রার্থনা তুলে ধরা হলো।

১. প্রশংসামূলক প্রার্থনা

সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অপূর্ব সৃষ্টি ধ্যান করে, তাঁর মহত্ত্ব ধ্যান করে আমরা এরূপ প্রার্থনা করতে পারি। 'প্রভুর প্রার্থনা'-র প্রথম অংশে যীশু নিজে পিতা ঈশ্বরের প্রশংসা করেছেন, পিতার অপূর্ব প্রেমের জন্যে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করেছেন। পবিত্র বাইবেলের সামসংগীতের অনেকগুলো প্রার্থনাই ঈশ্বরের প্রশংসামূলক কথা দ্বারা রচিত। সামসংগীত ১০০, ১১১, ১১৩, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯ ও ১৫০ আমরা পাঠ করতে পারি। ঈশ্বরের প্রশংসা করে আমরা কখনো বা গান করি:

"জয় প্রভু তোমারি জয়
তুমি আমাদের ভালোবাস...... ॥"

২. কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদমূলক প্রার্থনা

আমরা ঈশ্বরের অসীম ভালোবাসা, দয়া ও নানা আশীর্বাদ পেয়ে তাঁকে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে প্রার্থনা করে থাকি। যেমন, রোগ থেকে সুস্থ হয়ে, বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে, পরীক্ষায় ভালো পাশ করে, ভালো চাকরি পেয়ে ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে থাকি এবং আনন্দে গান করি:

"সকল ধন্যবাদ, মহিমা, গৌরব তোমার, জয় হোক, জয় হোক যীশু, জয় হোক তোমার..... ।
দয়ার উপর দয়া কত পেয়েছি তোমার, জয় হোক, জয় হোক যীশু, জয় হোক তোমার..... ।।"

ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে পবিত্র বাইবেলের সামসংগীতে এ ধরনের অনেক প্রার্থনা রয়েছে। আমরা সামসংগীত ১৩৮ এক সঙ্গে পাঠ করতে পারি।

ওগো ঈশ্বর, মনপ্রাণ দিয়ে গাইব তোমার স্তুতি:
আমার মিনতি ফিরিয়ে দাওনি তুমি!
সকল স্বর্গদূতের সামনে এই সামগান তোমায় শোনাব আমি।
তোমার পুণ্য মন্দির পানে মাথা নিচু করে প্রণাম জানাব আমি,
এবং তোমার বিশ্বস্ততা, তোমার দয়ার জন্যে
গাইব তোমার নামেরই স্তুতিগান।
তোমার নামটি, তোমার অঙ্গীকার
করেছ মহান সবকিছুর চেয়ে।
যখনই ডেকেছি, তুমি তো দিয়েছ সাড়া;
নতুন শক্তি দিয়েছ আমার প্রাণে
ওগো ঈশ্বর, তোমার প্রতিটি অঙ্গীকারের জন্যে
এই পৃথিবীর সমস্ত রাজা গাইবে তোমার স্তুতি।
তারা তো তোমার কর্মনীতির গাইবেই গুণগান;
তারা তো বলবে: "আহা, ঈশ্বর কত না মহিমময়"
ঊর্ধ্বলোকেই যদিও তাঁর আসন
বিনম্র দীন যত মানুষকে দেখেই থাকেন তিনি;
অত দূর থেকে গর্বিতদের চিনেও ফেলেন তিনি।
যখন আমায় পড়তেই হয় বাধাবিপদের মুখে,
তুমিই তখন বাঁচাও আমার প্রাণ;
আমার ক্রুদ্ধ শত্রুর গতি রুদ্ধ করতে তুমি তো বাড়াও হাত;
নিজ বাহুবলে তুমিই তখন আমায় রক্ষা কর!
জানি, ঈশ্বর আমার জন্যে যা-কিছু করতে চান,
সবই তো তিনি করবেন সমাপন;

ওগো ঈশ্বর, তোমার করুণা চিরকালেরই করুণা ।
নিজের হাতেই সৃষ্টি করেছ যাকে,
তাকে একা রেখে দূরে যেয়ো না কো তুমি!

৩. অনুনয়মূলক বা আবেদনমূলক প্রার্থনা

ঈশ্বরের কাছে আমাদের আবেদনের শেষ নেই। কত কিছুর জন্যে, কত কারণেই না আমরা তাঁর কাছে আমাদের নানান আবেদন, আমাদের চাওয়া-পাওয়ার কথা জানিয়ে থাকি। আমরা অসুস্থতাকালে সুস্থতা লাভের জন্য প্রার্থনা করি, বিপদে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করি। পরীক্ষায় ভালো ফল, ভালো চাকরি, ভালো স্বাস্থ্য, সুন্দর ভবিষ্যৎ ইত্যাদি কত কিছুর জন্যেই না আমরা ঈশ্বরের কাছে আবেদন জানিয়ে থাকি। প্রভুর প্রার্থনার দ্বিতীয় অংশে যীশু নিজেই আমাদের সমস্ত আবেদন পিতার কাছে তুলে ধরতে শিখিয়েছেন।

কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারে, "ঈশ্বর তো আমাদের সব প্রয়োজনের কথা জানেন। তাহলে তাঁর কাছে চাওয়ার আবার কী প্রয়োজন রয়েছে?" হ্যাঁ, ঈশ্বর অবশ্যই আমাদের প্রয়োজনের কথা জানেন। কিন্তু আমি যে তা পেতে চাই, কোন কিছু যাচ্‌নার মধ্য দিয়ে তা-ই আমি তাঁর কাছে তুলে ধরি। যীশু নিজেই বলেছেন: "তোমরা চাও, তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে; দরজায় ঘা দাও, তোমাদের জন্যে দরজাটি খুলে দেওয়া হবে। কেননা যে চায়, সে পায়; যে খোঁজে, সে খুঁজে পায়; যে দরজায় ঘা দেয়, তার জন্যে দরজাটি খুলে দেওয়া হয়।" (মথি ৭:৭-৮)।

৪. অনুতাপমূলক প্রার্থনা

মানুষ হিসেবে আমরা সবাই দুর্বল। তাই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, জ্ঞানে-অজ্ঞানে আমাদের নানা ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে। ঈশ্বরের সাথে এবং অন্য মানুষের সাথে আমাদের ভালোবাসার সম্পর্ক রক্ষা করতে অনেক সময় ব্যর্থ হই। কাজেই, আমাদের নানা ভুল-ত্রুটির জন্যে আমরা অনুতপ্ত হই ও অনুশোচনা বোধ করি। সামসংগীত ৫১ অনুতাপের একটি সুন্দর আদর্শ প্রার্থনা। আমরা একসাথে সামসংগীতটির কিছু অংশ পাঠ করি:

আমার প্রতি সদয় হও, ওগো ঈশ্বর, তোমার করুণাগুণে;
তোমার অসীম কৃপায়, ওগো, মুছে ফেল তুমি আমার সকল দোষ।
তুমি আমার সেই অপরাধ ধুয়ে ফেল নিঃশেষে;
আমার পাপের কালিমা থেকে নির্মল কর আমায়।
আমার দোষ, আমার ত্রুটি স্বীকার করি আমি;
আমার সেই পাপের কথা স্মরণে আমার রয়েছে অনুক্ষণ।
তোমারই কাছে পাপ করেছি আমি।
তোমারই চোখে যা অন্যায়, তাই করেছি আমি।
তুমিও তাই রায়বিধানে সত্যি ধর্মময়,
দণ্ডবিধানে সত্যিই ত্রুটিহীন!
তুমি তো জানোই, অপরাধ নিয়ে জন্মেছিলাম আমি;
পাপ নিয়েই তো মায়ের গর্ভে সেদিন এসেছি আমি।

ওগো, তুমি তো চাও, সত্যময় হয়ে উঠুক মানুষের অন্তর:
জ্ঞানের বাণী হৃদয়-গোপনে তাই তো শোনাও তুমি।
ওগো, হিসোপ দিয়ে অভিসিঞ্চিত করে আমাকে এবার পাপমুক্তই কর: নির্মল হবো আমি।
আমাকে ধৌত কর: তুষারের চেয়ে শুভ্র হবো যে আমি!
আমার প্রাণে বাজতে দাও আবার সেই পুলক-ভরা আনন্দেরই সুর।
তোমার হাতে চূর্ণ আমার দেহের অস্থিগুলি, আহা, নাচুক মহোল্লাসে!
আমার কোন পাপের দিকে তাকিয়ে দেখো না আর: মুখ ফিরিয়েই নাও;
ওগো, আমার সব অপরাধ মুছে দিয়ে যাও তুমি!

এক সঙ্গে ধ্যান করি

প্রার্থনা আমাদের আত্মার খাদ্য ও পানীয়; তা আমাদের প্রাণের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মিটায়। প্রার্থনা আমাদের প্রাণে আনে পরম প্রশান্তি ও হৃদয়ে জাগায় আনন্দ। আর এই শান্তি ও আনন্দ আসে স্বয়ং ঈশ্বরেরই কাছ থেকে। প্রার্থনাই আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়; প্রার্থনার মধ্য দিয়েই আমরা তাঁকে দেখি ও তাঁর বাণী শুনি।

কাজ: পাঁচ মিনিটের জন্য নীরব ধ্যানে বস এবং ঈশ্বরের উপস্থিতি তোমার জীবনে উপলব্ধি কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন সামসংগীতে অনুতাপের কথা বলা হয়েছে?

ক. সাম ৫১ খ. সাম ১৩৮
গ. সাম ১৪৮ ঘ. সাম ১৫০

২. প্রার্থনাকে আত্মার খাদ্য বলা হয়েছে, কারণ–

i. প্রাণের ক্ষুধাও তৃষ্ণা মিটায় ii. প্রাণে আনে পরম শান্তি
iii. হৃদয়ে জাগায় আনন্দ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

একজন ভিক্ষুক প্রতিদিন অনলের কাছে টাকার জন্য হাত পাতে। অনল তাকে বলে, 'ভিক্ষা না করে ঈশ্বরকে ডাক ও কাজ কর, দেখবে মন ভালো থাকবে ও সুখী জীবনযাপন করতে পারবে।' ভিক্ষুক প্রতিদিন ঈশ্বরকে স্মরণ করে, কাজ করে এবং তার জীবনে স্বস্তি ফিরে আসে।

৩. ভিক্ষুক তার জীবনে কিসের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে?

ক. সুখের
খ. ধনের
গ. সম্মানের
ঘ. প্রার্থনার

৪. ভিক্ষুক তার কাজের ফলে লাভ করবে–

i. স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন
ii. পবিত্র জীবন
iii. ধনাঢ্য জীবন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কীভাবে মানুষ প্রার্থনায় ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শোনে?
২. প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের উপস্থিতিতে বসবাস–বর্ণনা করো।
৩. প্রশংসামূলক প্রার্থনা বলতে কী বুঝ?
৪. মানুষের জীবনে প্রার্থনা গুরুত্বপূর্ণ কেন?
৫. ঈশ্বর কীভাবে মানুষের সাথে কথা বলেন?

সৃজনশীল প্রশ্ন – ১

দৃশ্যকল্প–১

আন্না এসএসসি পরীক্ষায় A^+ পেয়েছে। আন্নার পরিবারের সবাই খুশি হয়ে প্রার্থনা সভার আয়োজন করে। তারা এত বেশি আনন্দ পেল যে এলাকার গরিব লোকদের জন্য ভোজের আয়োজন করল। পরিবারের সাথে একাত্ম হয়ে সবাই সৃষ্টিকর্তার গৌরব/মহিমা কীর্তন করতে লাগল।

দৃশ্যকল্প–২

মৌসুমী সহপাঠীকে না বলে ব্যাগ থেকে সুন্দর একটি কলম নিয়ে যায়। বিষয়টি শ্রেণির শিক্ষককে জানানো হয়। শিক্ষক আসল দোষীকে ধরতে না পেরে সকল ছাত্রীদের শাস্তি দেন। মৌসুমী নীরব। সে মনে মনে দুঃখ পেল কিন্তু সত্য স্বীকার করতে পারেনি। তাই সে অন্তরে গভীর অনুশোচনা অনুভব করে এবং তার দোষ মুছে ফেলার জন্য ঈশ্বরের কাছে আকুল আবেদন জানায়।

ক. মাদার তেরেজা প্রথম জীবনে কোন ধর্মসংঘের সিস্টার ছিলেন?
খ. মানুষ কেন প্রার্থনা করে?
গ. মৌসুমীর প্রার্থনা তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন প্রার্থনাটি প্রকাশ করে – ব্যাখ্যা করো।
ঘ. আন্না ও মৌসুমীর প্রার্থনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন–২

১ম বন্ধু : তোমার পড়শোনা কেমন চলছে?

২য় বন্ধু : মোটামুটি চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করি আগামী পরীক্ষায় আরও ভালো করতে পারব।

১ম বন্ধু : আচ্ছা বন্ধু ! তুমি কীভাবে পড়া মনে রাখ? আমি তো শেখার সাথে সাথে ভুলে যাই।

২য় বন্ধু : আমি প্রতিদিন সৃষ্টিকর্তার নাম স্মরণ করে বাইবেল থেকে একটি করে অধ্যায় পড়ি। তারপর আমার ক্লাসের পড়া আরম্ভ করি।

১ম বন্ধু : তাই! আমি তো কোনদিন সৃষ্টিকর্তার নাম স্মরণ করি না। টেবিলে গিয়েই পড়তে আরম্ভ করি।

২য় বন্ধু : বন্ধু, তুমি প্রতিদিন আমার মতো প্রার্থনা করে পড়তে বসবে, দেখবে পড়া তাড়াতাড়ি শেখা হবে। পরীক্ষার সময় সহজেই পড়া মনে পড়বে।

ক. একদিন ছাদে প্রার্থনার সময় কে অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিল?

খ. বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনার ফল কী? তা বর্ণনা করো।

গ. ২য় বন্ধু কোন শক্তির উপর বিশ্বাসী বলে তুমি মনে করো? তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ ১ম ও ২য় বন্ধুর মনোভাবের পার্থক্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।

দশম অধ্যায়

অসুস্থ বিশ্বের নিরাময়

প্রত্যেক মানুষ তার জীবনে কোনো না কোনোভাবে অসুস্থ হয়। অসুস্থতা কোনো মানুষের জন্য কাম্য নয়, তবুও তা মানুষের জীবনে আসে। আমাদের জীবনে অসুস্থতা কখনো সামান্য, কখনো বড় আকারের, আবার কখনো বা কারো জীবনে তা মারাত্মক আকার ধারণ করে; এমন কি, তা কারো জীবনে মৃত্যু ডেকে আনে। অসুস্থতা আমাদের জীবনের আনন্দ, শান্তি ও মনের একাগ্রতা নষ্ট করে দেয়; তার ফলে সৃষ্ট হয় নিরানন্দ-ভাব, বিরক্তি, অধৈর্য, নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ব। দীর্ঘ ও গুরুতর অসুস্থতা জীবনে চরম হতাশার জন্ম দেয়। অসুস্থতা মানবজীবনের একাগ্রতা নষ্ট করে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। তাই সব মানুষই চায় তার অসুস্থতা থেকে নিরাময় বা পূর্ণ সুস্থতা এবং অসুস্থতার দ্বারা সৃষ্ট নিরানন্দ ও বিচ্ছিন্ন জীবন থেকে মুক্তি। কেননা সুস্থ জীবনই হলো সুখী, সুন্দর, আনন্দময় ও শান্তিময় জীবন।

শুধু মানুষই নয়, মানুষের মতো পৃথিবী এবং এর পরিবেশও নষ্ট বা দূষিত হয়, যেমন পৃথিবীর প্রাণী, প্রকৃতি, পরিবেশ, বাতাস, আবহাওয়া, নদনদী, সাগর ইত্যাদি। এই অসুস্থতা শুধু বাহ্যিক বা দৈহিক নয়, নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকেও পৃথিবী অসুস্থতায় ভোগে। দৈহিক অসুস্থতার চাইতে অভ্যন্তরীণ অসুস্থতাই বেশি অস্বস্তিকর। মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে অসুস্থ বলেই পৃথিবীও অসুস্থ। তাই মানুষের মতো পৃথিবীরও সুস্থতা বা নিরাময় প্রয়োজন। মানুষগুলো সুস্থ হয়ে উঠলেই পৃথিবীরও নিরাময় হবে। মানুষের ক্ষেত্রে যেমন সুখী-সুন্দর-শান্তিময় জীবনের জন্যে সুস্থতা প্রয়োজন, ঠিক তেমনিভাবে সুন্দর ও শান্তিময় বিশ্বের জন্যে সুস্থ প্রকৃতি ও পরিবেশ অপরিহার্য।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- পাপের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পাপের ফলে বিশ্বের ক্ষতবিক্ষত অবস্থা বর্ণনা করতে পারব;
- খ্রিষ্টের নিরাময়কারী শক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারব;
- পুনর্মিলন সাক্রামেন্তের গুরুত্ব ও পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব;
- পাপ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ হবো এবং
- পুনর্মিলন সাক্রামেন্তে উদ্বুদ্ধ হবো।

পাপ

পৃথিবীর মানুষের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও কৃষ্টিগত মূল্যবোধের অবক্ষয় বা ধ্বংস সাধনই হলো পাপ যার অপর নাম মন্দতা বা অসুস্থতা। ঈশ্বর পরম সুন্দর। তিনি 'অতি সুন্দর' এক পৃথিবী এবং যাবতীয় সবকিছুই অতি সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু পাপের ফলে মানুষ ও পৃথিবীর সবকিছু কলঙ্কিত হলো এবং সুন্দর পৃথিবীর সবকিছুই কলুষিত হলো। ঈশ্বরের সৃষ্ট সুন্দর ও পবিত্র পৃথিবী মানুষের পাপের ফলে এক অসুস্থ রুগ্ন ও ভগ্ন পৃথিবীতে পরিণত হলো।

> কাজঃ দলে ভাগ হয়ে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা, পাপের দিকসমূহ চিহ্নিত করে ও এ থেকে পরিত্রাণের উপায় আলোচনা করো।

পাপ বা মন্দতা কী

অনেকে মনে করে থাকে যে, পাপ হলো কিছু ধর্মীয় বিধি-নিষেধ অমান্য করা, লঙ্ঘন করা বা উপেক্ষা করা। ইহুদিরা মনে করত যে, পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের দ্বিতীয় বিবরণে যে ৬১৩টি ধর্মীয় বিধান রয়েছে, তার কোনো একটি ভঙ্গ করলেই পাপ হয়। অনেক খ্রীষ্টভক্ত মনে করে থাকেন যে, মোশীর কাছে ঈশ্বরের দেওয়া 'দশ আজ্ঞা'-র যে কোনো একটি আজ্ঞা লঙ্ঘন করলেই পাপ হয়। পুরাতন নিয়মের এই দশ আজ্ঞায় সাতটি আজ্ঞাই নিষেধাজ্ঞা অর্থাৎ সেখানে বলা হয়েছেঃ নরহত্যা করবে না, চুরি করবে না, মিথ্যা কথা বলবে না ইত্যাদি। দশ আজ্ঞা অনুসারে মন্দ বা খারাপ কিছু করাই হলো পাপ।

যীশু পুরাতন নিয়মের দশটি আজ্ঞাকে দুইটি আজ্ঞায় প্রতিস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেনঃ তোমার ঈশ্বর স্বয়ং প্রভু যিনি, তাঁকে তুমি ভালোবাসবে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে, আর তোমার সমস্ত মন দিয়ে! আর তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মতোই ভালোবাসবে।" (মথি ২২: ৩৭-৩৯; মার্ক ১২: ২৮-৩৪, লুক ১০: ২৫-২৮)। তাই যীশুর বিধান অনুসারে পাপ বা মন্দতা হলো ঈশ্বর এবং অপরের সাথে প্রেমপূর্ণ সম্পর্ক না রাখা, নষ্ট করা বা ভেঙে ফেলা। পুরাতন নিয়মের বিধান অনুসারে মন্দ কাজ করা, যীশুর বিধান অনুসারে ভালো না বাসা, কারো সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক ভেঙে ফেলাই হলো পাপ। অন্যকথায়, ভালো কাজ না করাই হলো পাপ বা মন্দ। এখানে যীশু পুরাতন নিয়মের ঊর্ধ্বে গিয়েছেন এবং পাপ বা মন্দতা সম্বন্ধে নতুন ধারণাও শিক্ষা দিয়েছেন।

কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক। দয়ালু সমরীয়ের কাহিনিতে পুরাতন নিয়মের দশ আজ্ঞা অনুসারে মনে হতে পারে যে মন্দিরের যাজক এবং সেবক কোনো পাপ করেননি, তারা বরং তাদের ধর্মীয় নিয়ম পালন করেছেন। তাদের পালনীয় ধর্মীয় দায়িত্ব পালন না করলেই তাদের পাপ হতো বলে তারা আহত ব্যক্তির সেবা না করে পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিলেন। যীশুর বিধান অনুসারে ভালোবাসার কাজ না করা, বা ভালো না বাসাই হলো পাপ যা তারা করেছেন। অন্যদিকে সত্যিকার পুণ্যের কাজ করেছিলেন সেই বিজাতীয় সমরীয় লোকটি। তার গভীর ভালোবাসা দিয়ে তিনি আহত ব্যক্তির সেবা করেছিলেন।

মথি লিখিত মঙ্গলসমাচারের ২৫:৩১-৪৬ অনুসারে অন্যকে, বিশেষভাবে তুচ্ছ ও অবহেলিত মানুষের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা হলো পুণ্যের কাজ। অন্যদিকে, তাদের ভালোবাসতে অস্বীকার করা, বা অবহেলা করাই হলো পাপ বা মন্দ–যা ঈশ্বরকে কষ্ট দেয়।

লুক লিখিত মঙ্গলসমাচারের ১৫:১১-৩২ পদে যীশু পাপের ধারণা আরো স্পষ্ট করে তুলেছেন। কাউকে ভালোবাসতে অস্বীকার করা, বা কাউকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করাই হলো পাপ যা বড় ছেলে করেছিল। সে তার অনুতাপী ছোট ভাইকে আর ভালোবাসতে চায়নি এবং তাকে নিজের ভাই বলে গ্রহণ করতেও চায়নি।

দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত ঐশতত্ত্ববিদ ডি. এস. আমালোরপাভাদাস বলেছেন, "ভালোবাসার সম্পর্ককে দুর্বল করে দেওয়া বা নষ্ট করে দেওয়াই হলো পাপ। ঈশ্বরকে এবং অন্যকে ভালোবাসতে অস্বীকার করাও হলো মন্দতা বা পাপ। স্বার্থপরতা, 'আমিত্ব ভাব,' অন্যদের সাথে সহভাগিতা করতে অস্বীকার করা, বিচ্ছিন্ন

হয়ে যাওয়া হলো পাপ। তাছাড়া নিজের একাকীত্ব, নিজের কাছে নিজে বন্দি থাকা, নিজের ভগ্নদশা এবং বিপর্যয় ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন না থাকাটাও পাপ।

ঐশতত্ত্ববিদ বি. হেয়ারিং-এর মতে, পাপ হলো নিজে থেকে নিজে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, নিজের মান-মর্যাদা নষ্ট করা, অন্যের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে হতাশা প্রকাশ ও বাধা সৃষ্টি করা। মানুষের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত ক্ষমতা জন্মলগ্ন থেকেই তাকে দেওয়া হয়েছে, যাতে সে তার সৃষ্টিকর্তা, প্রতিবেশী এবং পৃথিবীর সাথে ভালোবাসার একটি খাঁটি সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে এবং তাদের সাথে একাত্ম হতে পারে। ভালোবাসার এই সম্পর্ক স্থাপন করতে অস্বীকার করা বা আগ্রহ প্রকাশ না করাই হলো পাপ।

পাপের পরিণতি

পবিত্র বাইবেলের আদি পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা লক্ষ করি যে, ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে পাপ করার ফলে আদম ও হবা শাস্তি পেয়েছিলেন এবং স্বর্গীয় সুখের এদেন উদ্যান থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। নোয়ার সময় মানুষ যখন পাপ বা মন্দ কাজে নিয়োজিত হলো, তখন ঈশ্বর মহাজলপ্লাবন দিয়ে তাদের সবাইকে ধ্বংস করলেন (আদিপুস্তক ৭ম অধ্যায়)। পবিত্র বাইবেলের দ্বিতীয় রাজাবলি গ্রন্থে আমরা লক্ষ করি যে, ঈশ্বরের মনোনীত ইস্রায়েল জাতি যখন একমাত্র সত্য ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করে অন্য জাতির দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা শুরু করল, তখন তারা শত্রুদের হাতে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তাদের দাসত্ব করল। এখানে আমরা পবিত্র বাইবেল থেকে আরও কিছু কাহিনি উল্লেখ করতে পারি যেখানে দেখতে পাব মানুষ তাদের পাপের ফলে শাস্তি পেয়েছিল।

আমরা এবার অসুস্থ ও ভগ্ন পৃথিবীর কিছু সাম্প্রতিক কাহিনি শুনব। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর একজন বিদেশি স্বেচ্ছাসেবীর অভিজ্ঞতা এখানে তুলে ধরা হলো।

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর একজন বিদেশি কলেজ শিক্ষক তার কিছু শিক্ষার্থী নিয়ে বাংলাদেশে আসেন স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করার জন্যে। তারা দল বেঁধে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত একটি প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকায় চলে গেলেন। সেখানে তারা দেখতে পেলেন যুদ্ধে চরম ক্ষতিগ্রস্ত দালান কোঠা, হাসপাতাল, ভাঙা রাস্তাঘাট, আগুনে পোড়া গ্রামের ঘরবাড়ি, প্রায় জনশূন্য গ্রাম, মাঠ ও প্রান্তর। তারা আরো দেখতে পেলেন যুদ্ধে আহত অনেক মানুষ, অনেক অবিবাহিত নারী, অনেক এতিম শিশু, অনেক সন্তানহারা মাতাপিতা, স্বামীহারা মহিলা। দেশের সর্বত্রই যেন এক জঘন্য ধ্বংসযজ্ঞের ছাপ, চারিদিকে ব্যথা বেদনা, বঞ্চনা, দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্যের করুণ চিত্র, যা একদল মানুষের লোভ-লালসা, চরম ঘৃণা ও যুদ্ধের বিভীষিকার ফল।

বিভিন্ন সাহায্য সংস্থার পাশাপাশি ঐ স্বেচ্ছাসেবীও তার শিক্ষার্থীদের নিয়ে এই দুঃখ কষ্টে ভারাক্রান্ত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তারা লোকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের দুঃখ-কষ্ট সরেজমিনে দেখতে লাগলেন; যুদ্ধে পোড়ানো বাড়িঘরগুলো নতুন করে তৈরি করতে লাগলেন, গ্রামের অসুস্থ মানুষের চিকিৎসার জন্যে অস্থায়ী চিকিৎসা সেবাকেন্দ্র গড়ে তুললেন, পানীয় জলের জন্যে গ্রামে নলকূপ স্থাপন করলেন। তারা ছেলেমেয়েদেরকে লেখাপড়া শিখাতে লাগলেন এবং গ্রামের কৃষকদের কৃষিকাজে সাহায্য দিতে শুরু করলেন।

ধীরে ধীরে কয়েক মাসের মধ্যেই গ্রামে একটা পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা গেল। হতাশা ও বেদনাগ্রস্ত মানুষের মধ্যে একটা আশা জেগে উঠল। জীবনযাত্রা পরিবর্তনের দৃশ্যগুলো স্পষ্টই দৃশ্যমান হলো। তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হলো, পোশাক-আশাক পরিধানে আরো মার্জিত হলো ও শিক্ষাক্ষেত্রে আগ্রহ বৃদ্ধি পেল। ফলে দেখা গেল, অনেক ছেলেমেয়ে সুন্দর পোশাক আর স্কুল-ব্যাগ নিয়ে লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে স্কুলে যেতে শুরু করল। গ্রামের সবার মুখে হাসি ফুটে উঠতে শুরু করল। তাদের হৃদয়-মন এক নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরে উঠল।

বিশ্বের ক্ষত-বিক্ষত অবস্থা

সারা বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা একই ধরনের একটি ক্ষত-বিক্ষত ও ভগ্ন পৃথিবী দেখতে পাই:

- দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জনসংখ্যা বিস্ফোরণ
- বিশ্বের শতকরা ৮০ জন মানুষ দরিদ্র
- কোটি কোটি মানুষ ক্ষুধার্ত, তারা অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটায়
- লক্ষ লক্ষ মানুষ কারাবন্দি
- অন্যায় ও অন্যায্যতার প্রবল প্রভাব ও প্রসার
- ধনী ও গরিবের বিরাট ব্যবধান ও শ্রেণিবৈষম্য
- দরিদ্র দেশগুলোর উপর ধনী দেশগুলোর আধিপত্য
- গণমাধ্যমগুলোর অনৈতিক লাগামহীন প্রচার ও তার নেতিবাচক প্রভাব
- ধনী দেশগুলোর রমরমা অস্ত্র ব্যবসা
- দুর্নীতির প্রসার লাভ
- স্বার্থপর রাজনীতির খেলা
- প্রকৃতির চরম পরিবেশ দূষণ
- চরম বিপর্যয়মুখী পৃথিবী

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের ব্যক্তিজীবনে, সমাজজীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে এবং সারা বিশ্ব জগতে মন্দতা আমাদের ঘিরে রয়েছে। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবীর কেউ মন্দের এই প্রভাব ও ছোবল থেকে মুক্ত নয়। কী করে আমরা এসব মন্দতা বা পাপের অভিশাপ থেকে মুক্ত হবো এবং সুস্থ-সুন্দর জীবনযাপন করব?

বিশ্বের পাপময় চিত্র

যুদ্ধ মানেই পাপ। কারো না কারো পাপের জন্যে যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে কত মানুষ, জীবজন্তু মারা যায়, কত বাড়িঘর, জানমাল, ধনসম্পদ, প্রতিষ্ঠান, জনপদ, গাছপালা, ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর্থিক মন্দা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়,

২০২৫

নানা সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দেড় কোটি লোক মৃত্যুবরণ করেছিল। জাপানের হিরোসিমা-নাগাসাকি শহর দুইটিতে আমেরিকার আণবিক বোমার আঘাতে হাজার হাজার মানুষ করুণ মৃত্যুবরণ করে এবং আরও বহু মানুষ আণবিক বোমার বিষাক্ত তেজস্ক্রিয়ায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পঙ্গুত জীবনযাপন করে আসছে।

তাছাড়া বর্তমানে সারা পৃথিবীতে মুষ্টিমেয় ধনী লোকের (শতকরা ১০জন) লাগামহীন সম্পত্তি লিপ্সার কারণে কোটি কোটি লোক সর্বহারা হচ্ছে, বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে, শহরের বস্তিতে, রাস্তার ফুটপাতে অমানবিক জীবনযাপন করছে অগণিত মানুষ, গরিব মানুষের সংখ্যা আতঙ্কজনকভাবে বেড়ে চলছে। দারিদ্র্যের কষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে লক্ষ লক্ষ নারী ও শিশু ঘৃণ্য ও পাপময় পতিতা বৃত্তিতে নিয়োজিত হচ্ছে। শক্তিশালী ও ধনশালীদের অন্যায়-অত্যাচারের শিকার হচ্ছে অগণিত মানুষ। গণপ্রচার মাধ্যমগুলো এবং আকাশ-সংস্কৃতির নৈতিকতাহীন প্রচারের ফলে অনৈতিক জীবনযাপন, যেমনঃ অবৈধ যৌন সম্পর্ক, বিবাহ-বিচ্ছেদ, পিতৃ-মাতৃ-পরিচয়হীন এতিম শিশু, পারিবারিক ভাঙন, অসহায় ও পরিত্যক্ত বৃদ্ধ পিতামাতা, ভ্রূণ হত্যা, মানব পাচার ইত্যাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথিবীর গাছপালা, নদীনালা ও পাহাড়-পর্বত তথা প্রকৃতির উপর মানুষের অত্যাচার অবিচারের ফলে বন্যা, পাহাড় ধস, নদীনালার মৃত্যু, নদী-সাগরের জল বিষাক্ত হওয়া, বহু প্রাণী ও উদ্ভিদের বিলুপ্তি, বায়ু দূষণ, আবহাওয়ার বিরূপ প্রতিক্রিয়া, সবুজ ভূমি মরুভূমিতে রূপান্তর ইত্যাদি পাপময় অবস্থা বা মন্দতা মারাত্মক আকার ধারণ করছে।

নিরাময়কারী খ্রীষ্ট

আমরা যখন পাপ করি তখন আমাদের মধ্যে একটা অপরাধবোধ জাগ্রত হয়। যার সুস্থ-সুন্দর বিবেক আছে, তার মধ্যে এই উপলব্ধি নিশ্চিতভাবে হবেই। কিন্তু যে ব্যক্তি তার বিবেককে হত্যা করে এর কণ্ঠকে রোধ করে দিয়েছে, সে শত পাপ অন্যায় করলেও তার মধ্যে কোনো অপরাধবোধ বা অনুতাপ আসে না। ঈশ্বরের সাথে মিলন হলো মানুষের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। পাপ করার ফলে মানুষ তার সেই অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয় এবং ঈশ্বরের মহান ভালোবাসা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়। একই সাথে পাপের কারণে সে নিজের অন্তর থেকে, অপরের কাছ থেকে এবং অন্য সব সৃষ্টি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

মহান ঈশ্বর কিন্তু পাপী ও দুর্বল মানুষকে কখনো দূরে ঠেলে দেন না। পবিত্র বাইবেল আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, পাপী দুর্বল মানুষকে উদ্ধার করতে করুণাময় ও প্রেমময় ঈশ্বর নিজেই হাত বাড়িয়ে দেন। তাই আদম হবা যখন পাপ করে নিজেদেরকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিলেন এবং লুকিয়ে রইলেন, তখন ঈশ্বর নিজেই তাদের খুঁজলেন এবং পৃথিবীতে তাদের জীবন ও বন্দিদশা থেকে উদ্ধারের জন্যে একজন ত্রাণকর্তাকে পাঠাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। ঈশ্বর তাঁর পুত্র যীশুকে পাঠালেন সেই প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তারূপে। যীশু ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে পাপের শক্তিকে নির্মূল করেছেন ও ক্রুশীয় মৃত্যুর গুণে পতিত মানুষকে ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে এনেছেন (এফিসীয় ২: ১৬)। তাই যোহন তাঁর মঙ্গলসমাচারের শুরুতেই উল্লেখ করেন যে, মানুষের পাপের অন্ধকারে যীশু আসেন তাদের জীবনকে আলোকিত করতে। পাপের অন্ধকারেই আলোর উদ্ভাস। যেন যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে, তার যেন বিনাশ না হয়, বরং সে যেন লাভ করে শাশ্বত জীবন।

যীশু হলেন ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সেতু বন্ধন। তিনি এই জগতে এসেছেন মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত করতে, মানুষকে তার ভগ্ন দৈন্যদশা থেকে সুস্থ করে তুলে সমগ্র মানবজাতি ও সৃষ্টির সঙ্গে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করতে। যীশু তাঁর প্রকাশ্য প্রচার জীবনকালে তাঁর ত্রি-বিধ কর্মধারা তথাঃ প্রচার, শিক্ষাদান, এবং নিরাময়করণ-এর মধ্যে দুর্বল ও পাপী মানুষের প্রতি ঈশ্বরের মহান ভালোবাসা ও অপার দয়ার কথাই প্রচার করে গেছেন। খ্রীষ্ট যীশু নিজে সমস্ত মন্দতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুর শক্তিতে পাপের শক্তিকে পরাজিত করেছেন। অসুস্থদের সুস্থ করে যীশু প্রকাশ করেছেন যে তিনি মানুষকে দেহ, মন ও আত্মায় সুস্থ করতে চান যেন মানুষ পিতা ঈশ্বরের পূর্ণ সন্তান হতে পারে। অসুস্থতা মানুষকে দুর্বলতা ও মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। পিতা ঈশ্বর যীশুকে পাঠালেন মানুষকে পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে পরিপূর্ণ রূপে জীবন দিতে। তাই যীশু বলেন, "আমি এসেছি, যাতে মানুষ জীবন লাভ করে এবং পরিপূর্ণভাবেই তা লাভ করে।" (যোহন ১০: ১০খ)।

পুনর্মিলন সাক্রামেন্ত

বাংলায় 'সংস্কার' কথাটির অর্থ হলো মেরামত করা, সংশোধন করা। আমাদের দেহ-মন-আত্মার অসুস্থতা বা মন্দতার অবস্থা সারিয়ে তোলার জন্যে খ্রীষ্ট-মণ্ডলীতে সংস্কারীয় (সাক্রামেন্তীয়) ব্যবস্থা রয়েছে। যীশু তাঁর পুনর্মিলন ক্ষমতা ও নিরাময়কারী ক্ষমতা তাঁর শিষ্যদের সাথে সহভাগিতা করেছেন (লুক ৯: ১,২,৬)। তিনি তাঁর মুক্তিদায়ী ও নিরাময়কারী কাজসমূহ খ্রিষ্টমণ্ডলীর সাক্রামেন্তের মধ্য দিয়ে সম্পাদন করে চলেছেন।

অনুতাপ ও পুনর্মিলন (পাপস্বীকার) সংস্কারের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের পাপের ক্ষমা লাভ করি। রোগীলেপন সংস্কারের মধ্য দিয়ে আমরা অসুস্থতা থেকে নিরাময় লাভ করি। আর পবিত্র খ্রিষ্টযাগ (প্রভুর ভোজ)-এর মধ্য দিয়ে যীশু নিজেকে আমাদের জীবনের পরম খাদ্যরূপে দান করেছেন, যেন আমরা দেহ-মন-আত্মায় পূর্ণ সুস্থ-সবল ও সজীব থাকি। পবিত্র খ্রীষ্টযাগ ও মণ্ডলীর মাধ্যমে তিনি তাঁর বাক্য, দেহ ও রক্ত দিয়ে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত মানুষের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মিটান এবং তাদেরকে নতুন জীবন দান করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অসুস্থতা মানব জীবনের কী নষ্ট করে?

ক. নিঃসঙ্গতা

খ. একাগ্রতা

গ. সহভাগিতা

ঘ. আন্তরিকতা

২. মানুষ সব সৃষ্টি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে–

i. পাপের কারণে

ii. দুর্বলতার কারণে

iii. সহিংসতার কারণে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. i ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জিম ও জেরী এক সঙ্গে খেলা করার সময় একটি ঘড়ি দেখতে পেল। জিম ঘড়িটি দেখে তাড়াতাড়ি তার পকেটে ঢুকালো। জেরী বলল, 'অন্যের জিনিস নেওয়া ঠিক নয়। ওটা তুমি রেখে দাও।'

৩. জেরী কী ধরনের পাপ থেকে জিমকে বিরত থাকতে বলেছে?

ক. চুরি করা

খ. লোভ করা

গ. হিংসা করা

ঘ. মিথ্যা কথা বলা

৪. জিমের পাপের ফলে যে অবক্ষয় হচ্ছে, তা হলো–

ক. দৈহিক

খ. সামাজিক

গ. নৈতিক

ঘ. অর্থনৈতিক

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পাপ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা দাও।

২. পাপের ফলে বিশ্ব কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে? ব্যাখ্যা দাও।

৩. পাপের পরিণতি কী হতে পারে? ব্যাখ্যা দাও।

৪. পাপ থেকে বিরত থাকতে হবে কীভাবে?

৫. আমাদের দুর্বলতায় ঈশ্বর কীভাবে আমাদের শক্তি দেন?

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সাইমন খুবই দরিদ্র পরিবারের সন্তান। পিতার রেখে যাওয়া পৈত্রিক ভিটা ছাড়া তার আর কিছুই নেই। পাশের বাড়ির জমিদার রঞ্জন বাবুর কাছ থেকে জমি চাষ করার জন্য টাকা ধার নেয় সে। কিন্তু তার অজ্ঞতা ও অশিক্ষার কারণে রঞ্জন বাবু টিপসই নিয়ে সে পৈত্রিক ভিটাটুকুও নিয়ে যায়। সাইমন তা বুঝতে পারে না। একদিন জমিদার এসে তাকে বলেন, 'তুমি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাও। এটা আমার বাড়ি।' সাইমন বলে, 'আমার বাড়ি ছাড়ব কেন?' জমিদার উত্তর দেয়, 'এই যে কাগজে লেখা ও তোমার টিপসই। তুমিই এটা লিখে দিয়েছ।' সাইমনের হঠাৎ মনে পড়ে গেল টাকা ধার নেওয়ার কথা।

ক. পাপ কী?

খ. নিরাময়কারী যীশু এ জগতে এসেছেন কেন?

গ. রঞ্জন বাবুর কাজের মাধ্যমে কী প্রকাশ পায়?

ঘ. রঞ্জন বাবুর কাজের পরিণতি কী হতে পারে? তা বিশ্লেষণ করো।

২. দীনা মেধাবী তবে চঞ্চল প্রকৃতির। তার চঞ্চলতায় রয়েছে ছলনা। দুষ্টামির ছলে মিথ্যা কথা বলে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করে। এমনকি ফাদারের নামে মিথ্যা কথা বলে। সহপাঠীরা ফাদারের কাছে সব কথা বলে এবং মণ্ডলীর সদস্য পদ বাতিল করার আবেদন করে। ফাদার দীনাকে কাছে নিয়ে মাথায় হাত রেখে অনেক বোঝায়, ঈশ্বরের বাণী শোনায়, ঈশ্বরের মহান ভালোবাসা ও অপার দয়ার কথা বলে। পরামর্শ দেন, প্রার্থনা কর যেন যীশু তোমাকে বোঝার শক্তি দেন। ফাদার তাকে ক্ষমা করে নতুন জীবনের সন্ধান দেখান।

ক. বাংলার সংস্কার কথাটির অর্থ কী?

খ. খ্রীষ্টযোগ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা দাও।

গ. কার অনুপ্রেরণায় ফাদার দীনাকে কাছে টেনে নিয়েছেন? বর্ণনা দাও।

ঘ. ফাদারের অনুপ্রেরণায় দীনা শাশ্বত জীবন পেয়েছে বলে কি তুমি মনে করো? মূল্যায়ন করো।

একাদশ অধ্যায়

বিবেকের নীরব কণ্ঠস্বর

সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে দেহ-মন-আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সেই সাথে প্রতিটি মানুষকে তিনি দিয়েছেন একটি সত্যময় বিবেক যা হলো ঈশ্বরেরই কণ্ঠস্বর। যে ব্যক্তি তার বিবেকের লালন-পালন ও সুষ্ঠু গঠনে যত বেশি যত্নবান, তার বিবেক তত বেশি সুস্থ ও পবিত্র। যার বিবেক যত বেশি সুস্থ ও পবিত্র, সে তত বেশি স্পষ্টভাবে তার অন্তরে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। বিবেক হলো মানুষের অন্তরের গোপন অন্তস্তল এবং ঈশ্বরের পবিত্র মন্দির। সেখানে সে ঈশ্বরের সাথে একান্ত নীরবে নিভৃতে বাস করে, সেখানে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়। সেখানে বিবেক অতি সুন্দর করে ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলো প্রকাশ করে, যা ঈশ্বর-প্রেম ও মানব-প্রেমে পরিপূর্ণ। আমাদের ঈশ্বর জীবন্ত ও প্রাণবন্ত, তিনি আমাদের অন্তরে থাকেন এবং তাঁর বাণী আমাদের কাছে প্রকাশ করেন। আমাদের প্রতিদিনকার জীবনের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহে, কাজে-কর্মে, চিন্তা-ভাবনায় তিনি নীরবে আমাদের কাছে কথা বলেন।

তাই ঈশ্বরের কথা শোনার জন্যে আমাদের চাই সুন্দর ও সুস্থ বিবেক এবং অন্তর-আত্মার গভীরে নীরবতা। ঈশ্বর কখনো চিৎকার করে বা উচ্চস্বরে কথা বলেন না, বরং তিনি নীরবে স্পষ্ট করে কথা বলেন। সুন্দর-সুস্থ বিবেক ঈশ্বরের বাণী নীরবে শ্রবণ করে এবং সেই বাণী আমাদের বলে দেয় কোনটি করা, বলা ও কোন চিন্তা করা আমাদের জন্য সঠিক, আর কোনটি সঠিক নয়, কোন্‌টি ন্যায় এবং কোন্‌টি অন্যায়। কেননা আমাদের বিবেক হলো ঈশ্বরের নীরব কণ্ঠস্বর।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- মূল্যবোধের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নৈতিক মূল্যবোধের উৎস ও আবিষ্কারের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব;
- বিবেক গঠনের উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারব;
- পরিপক্বতায় বিকাশ লাভের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব;
- এইডস, ধূমপান, মাদকাসক্তির ক্ষতিকর প্রভাব এবং এগুলো থেকে মুক্ত থাকার উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারব;
- মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধসমূহ বর্ণনা করতে পারব;
- বিবেকের কণ্ঠস্বর শুনে তা মেনে চলব এবং
- মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধসমূহ অনুসারে জীবনযাপন করব।

মূল্যবোধ

মূল্যবোধ বলতে এমন কিছুকে বোঝায় যার বিশেষ মূল্য বা গুরুত্ব রয়েছে–যা আকর্ষণীয়, প্রশংসনীয়, সমর্থনযোগ্য–যাকে পাবার জন্যে আমাদের হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং যা জীবনের সুন্দর লক্ষ্য অর্জনে মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে। তাই জীবনে মূল্যবোধ থাকা প্রতিটি মানুষের জন্যেই একান্ত প্রয়োজনীয়।

মূল্যবোধহীন মানুষের জীবন মূল্যহীন ও অর্থহীন। মূল্যবোধহীন মানুষকে কেউ সম্মান করে না, সে নিজেকে ইতর প্রাণীতে পরিণত করে। যে মানুষের সুন্দর মূল্যবোধের জ্ঞান আছে এবং সেই অনুসারে জীবনযাপন করে, সে সকলের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র/পাত্রী হয়।

মূল্যবোধ মানুষের জীবনে নৈতিক জীবন গঠনে সাহায্য করে যা তার বিচার-বিবেচনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং সেই অনুসারে জীবন পরিচালনা করতে ব্যক্তিকে সাহায্য করে।

মূল্যবোধ ও বিবেক

মূল্যবোধের সাথে আমাদের বিবেকের একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এই দুইটি একে অপরকে প্রভাবিত করে। যে ব্যক্তির সঠিক ও উন্নত মূল্যবোধ রয়েছে, তার বিবেকও সঠিক ও মহৎ হয়। অন্যদিকে, যার বিবেক সঠিক ও পবিত্র, তার মূল্যবোধগুলোও সঠিক ও উচ্চমানের হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে ব্যক্তি পবিত্রতা, সততা ও সৌজন্যবোধকে নিজ জীবনের মূল্যবোধ হিসেবে গ্রহণ করে মর্যাদা দেয় সেই ব্যক্তি সঠিক বিবেকের অধিকারী হয়। অন্যদিকে, যে ব্যক্তির বিবেক সুস্থ, সঠিক ও পবিত্র, সে পবিত্রতা, সততা, সবার সাথে সুসম্পর্ক ইত্যাদি মূল্যবোধকে জীবনের মানদণ্ড ও চালিকাশক্তি হিসেবে স্থান দেয়।

আবার এর বিপরীতে যে ব্যক্তির মূল্যবোধ সঠিক ও উন্নত নয়, তার কাছ থেকে সুন্দর বিবেক আশা করা যায় না। অন্যদিকে দেখা যায়, যার বিবেক সঠিক নয়, তার মূল্যবোধসমূহও ভ্রান্ত ও অমার্জিত। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যাদের জন্ম ও বসবাস কলুষিত পরিবেশে এবং যারা ঐ পরিবেশে ঝগড়া-বিবাদ, গালাগালি ও বিভিন্ন অপরাধের মধ্যে বাস করছে তাদের কাছ থেকে সৌজন্যবোধ, নম্রতা, সুন্দর আচরণ খুব বেশি আশা করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে অনেকে মন্দকে মন্দ বলে মনে করে না।

আমরা এবার দুইটি কাহিনি শুনব এবং লক্ষ করব কারা সুন্দর বিবেকের মানুষ এবং কারা অসুন্দর বিবেকের মানুষ, কাদের জীবনে উন্নত ও সুন্দর মূল্যবোধ রয়েছে এবং কাদের জীবনে এগুলো অনুপস্থিত।

উদাহরণ ১

বাবু সুজন এবং তার স্ত্রী তেরেজা তাদের তিন মেয়ে ও দুই ছেলে নিয়ে সুখের সংসার করে আসছেন। ভালো খ্রিষ্টান হিসেবে গ্রামে এবং মণ্ডলীতে তাদের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। গ্রামের সবার সাথে তাদের সদ্ভাব রয়েছে। তাঁরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় সন্তানদের নিয়ে প্রার্থনা করেন, প্রতি রোববার তারা গির্জায় যান। যীশুর মঙ্গলসমাচার প্রচারের উদ্দেশ্যে তাদের এক মেয়ে সিস্টার এবং এক ছেলে পুরোহিত হয়েছে, এবং মানবসেবায় নিজেদের সমর্পণ করেছে। অন্য সন্তানেরাও পড়াশোনা করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে। অনেকে মন্তব্য করেছে, এটি একটি আদর্শ পরিবার।

উদাহরণ ২

প্রেম ঘটিত তুচ্ছ ঘটনায় গ্রামের টনি নামের এক যুবকের সাথে এক পরিবারের বিবাদ হয়। বিবাদের এক পর্যায়ে টনি তার মাস্তান বন্ধুদের নিয়ে ঐ পরিবারের কয়েকজনকে মারধর করে। ঐ ঘটনার জের ধরে

পুলিশ টনিকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় এবং পরে জেলে দেয়। টনির বিরুদ্ধে গ্রামের অনেকের কাছ থেকে বিভিন্ন রকমের অভিযোগ শোনা গেল। তার পরিবার সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল যে, টনির বাবা-মার অবস্থা তেমন সচ্ছল নয় এবং তাদের পারিবারিক পরিবেশও ভালো নয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নানান কারণে প্রায়ই ঝগড়াঝাটি হয়, তারা সন্তানদেরকে এবং পাড়া প্রতিবেশীদেরকেও বিশ্রী বিশ্রী ভাষায় গালাগালি করে। গির্জা-প্রার্থনায় খুব একটা যায় না, বাড়িতেও সান্ধ্য-প্রার্থনা খুব কমই হয়। বাবা অনেক সময় রাতে মদ খেয়ে এসে স্ত্রীকে ও ছেলেমেয়েদেরকে খুব গালাগালি করে এবং তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। গ্রামের সবাই ভাবে, "এই পরিবারের ভবিষৎ কী?"

এভাবে অনেক মানুষের জীবনে আমরা দেখতে পাই ভালো মূল্যবোধ আছে বলে তাদের আচরণগুলো ভালো। কিন্তু যাদের মূল্যবোধগুলো খারাপ তাদের আচরণগুলোও খারাপ হয়ে থাকে।

কাজঃ সঠিক বিবেক ও ভ্রান্ত বিবেকের জন্ম, কারণসমূহ, প্রকাশ ও পরিণতি বা ফলাফল সম্পর্কে দলে আলোচনা করো।

মূল্যবোধের উৎস

মানুষের মধ্যে মূল্যবোধের দুইটি উৎস রয়েছেঃ অন্তর্নিহিত উৎস এবং বহিরাগত উৎস।

ক. অন্তর্নিহিত উৎস

ঈশ্বর মানুষকে তার নিজের মতো করে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র বাইবেলের আদিপুস্তকে বলা হয়েছেঃ "এসো আমরা নিজ প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে মানুষ সৃষ্টি করি" (আদি ১:২৬)। কাজেই আমাদের প্রত্যেকের নিজ সত্তার গভীরে রয়েছে ঈশ্বরের রোপিত উত্তমতা ও সৌন্দর্য। আলোয়-ভরা চোখ দিয়ে আমরা ঈশ্বরের দেওয়া উত্তমতা ও সৌন্দর্যকে দর্শন করতে পারি। ঈশ্বরের গভীর ভালোবাসায় আমরা সৃষ্ট হয়েছি যা আমাদের হৃদয়-গভীরে উৎসারিত হতে থাকে পুণ্য-কর্ম ও সুন্দর কর্ম সাধনের সাধনায়।

এই যে অন্তর্নিহিত উত্তমতা, যা সর্বোপরি ঈশ্বরকে পাবার জন্যে ধাবিত হয়, তা আমাদের পাপের কারণে মলিন ও নিস্প্রভ হতে পারে; কিন্তু এর বীজ কখনো ধ্বংস হয় না। তা আমাদের সত্তার মধ্যে থেকে ঈশ্বরের ভালোবাসায় বাস করতে থাকে। সুযোগ পেলেই তা আলোকিত জীবনের উদ্দেশ্যে ফুটে ওঠে।

খ. বহিরাগত উৎস

দুইভাবে মানুষের মধ্যে বহিরাগত মূল্যবোধসমূহ কাজ করে। তা হলোঃ পারিপার্শ্বিক সমাজ এবং ঐশ প্রত্যাদেশ। কোনো মানুষই একাকী বাস করতে পারে নাঃ সে একটি পরিবারে ও সমাজে বাস করে। কাজেই সে তার পরিবার ও সমাজের প্রচলিত ও কৃষ্টিগত মূল্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত। যেমন– গুরুজনদের শ্রদ্ধা করা, পরিবার ও সমাজের নিয়ম-কানুন মেনে চলা, মিলেমিশে থাকা ইত্যাদি। অন্যদিকে, প্রতিটি মানুষ কোনো না কোনো ধর্ম বা মতবাদে বিশ্বাসী। ধর্মীয় শিক্ষা ও বিধানসমূহ বা ঐশ প্রত্যাদেশসমূহ মানুষের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ গঠনে প্রভূত সাহায্য করে।

বিবেকের গঠন

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূল্যবোধ ও বিবেকের মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে। এই দুইটি একে অপরকে প্রভাবিত করে, মানুষের নৈতিকতাবোধ ও ব্যক্তিত্ব গঠনে অবদান রাখে। যেহেতু মানুষের মূল্যবোধ দুইভাবে গঠিত হয় অর্থাৎ সে অন্তর্নিহিত ও বহিরাগত মূল্যবোধের সৃষ্টি করে, তাই মানুষের বিবেক গঠিত হয় প্রধানত দুইটি উপায়ে: অন্তর্নিহিত নৈতিক মূল্যবোধ এবং বহিরাগত মূল্যবোধ দ্বারা।

ক. অন্তর্নিহিত বিবেক

ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে তার উত্তমতা ও সৌন্দর্য দান করেছেন (আদিপুস্তক ৩:২৬)। ফলে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর প্রদত্ত বিবেচনা শক্তি রয়েছে, যার ফলে সে চিনে নিতে পারে নৈতিক মূল্যবোধসমূহ; বিচার করতে পারে কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ; বুঝতে পারে কোনটি করা তার উচিত, কোনটি উচিত নয়, আর সে অনুসারে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। নিজের বিবেকের সিদ্ধান্ত অনুসারেই সে কাজ করে। এই ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি যত বেশি ঈশ্বর ভীরু, ধর্মপরায়ণ ও পবিত্র হয়, তার বিবেক তত সুন্দর হয়। রাজা সলোমনকে এই ক্ষেত্রে একজন বড় আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে (১ রাজাবলি ৩:৪-১৪)।

খ. বহিরাগত বিবেক

মূল্যবোধের মতোই আমাদের বিবেকের গঠনে অপরের প্রভাব অপরিসীম। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, দেশীয় ও বিশ্ব-সংস্কৃতির মূল্যবোধ চেতনা এবং নৈতিক মানদণ্ডসমূহ আমাদের বিবেকের গঠন প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। পারিবারিক ও সামাজিক ধর্মীয় চর্চা, ঈশ্বর প্রেম ও মানব প্রেম, সুন্দর বিবেক গঠনে সাহায্য করে। অন্যদিকে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব সংস্কৃতির নেতিবাচক নিয়ম-নীতি মানুষের সুন্দর ও পবিত্র বিবেক গঠন বাধাগ্রস্ত করে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কন্যা শিশুর প্রতি নেতিবাচক মনোভাবের কারণে অনেক গর্ভস্থ কন্যাশিশুকে হত্যা করা হচ্ছে। অনেক রাষ্ট্রে গর্ভপাতের মাধ্যমে নরহত্যার অপরাধকে আইনসিদ্ধ করা হয়েছে। চীন দেশের এক-সন্তান নীতির কারণে প্রতি বছর কোটি কোটি মানব-ভ্রূণ হত্যা করা হচ্ছে। পতিতাবৃত্তির মতো ঘৃণ্য মন্দ কাজকে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই রাষ্ট্রীয় আইনে বৈধতা দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি। ফলে এসব পাপ কাজকে অনেকে আজ আর মন্দ কাজ বা পাপ কাজ বলে মনে করছে না। বহিরাগত ইতিবাচক এবং নেতিবাচক নৈতিক মানদণ্ড আমাদের বিবেকের গঠনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে।

ব্যক্তিগত বিবেক

বলা হয়ে থাকে যে, "প্রত্যেক মানুষ তার কাজের জন্যে দায়ী।" কথাটা মেনে নেবার জন্যে কখনো কখনো প্রশ্নের উদ্ভব ঘটতে পারে। পরিপক্ক মানুষ যখন স্বাধীনভাবে তার নিজের সিদ্ধান্ত অনুসারে কোনো কাজ করে, তখন সে সম্পূর্ণরূপে সেই কাজের জন্যে দায়ী থাকে। কিন্তু কখনো কখনো কিছু মানুষ স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে কিছু কাজ করে না। হয় সে কর্তৃপক্ষের বা গুরুজনের আদেশের বশবর্তী হয়ে কোনো কাজ করছে নতুবা কারো প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি বা কারো মনতুষ্টির জন্যে সে কাজ করছে। এরূপ ক্ষেত্রে কোনো কাজের জন্যে সেই ব্যক্তিকে পুরোপুরি দায়ী করা যায় না।

শিশুরা অনেক সময় অনেক কাজই করে থাকে তাদের পিতামাতা ও গুরুজনদের আদেশ মেনে নিয়ে; স্কুলে তারা অনেক কিছু করে স্কুলের নিয়মকানুনের জন্যে এবং শাস্তির ভয়ে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবারের ও স্কুলের শেখানো মূলবোধগুলো নিজের করে নিয়ে সুন্দর বিবেক গঠন একান্ত প্রয়োজন। যে ব্যক্তি সব সময় অন্যের আদেশ শুনে বা নিয়মের বশবর্তী হয়ে কাজ করে তার মধ্যে কখনো জীবনের পরিপক্কতা আসে না। পরিপক্ক মানুষমাত্রই স্বাধীনভাবে এবং নিজের সিদ্ধান্তে তার কাজ-কর্ম করে থাকে। তাই সে তার ভালো-মন্দ সব কাজের জন্যে দায়ী থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লক্ষ লক্ষ ইহুদি নারী-পুরুষকে হত্যার দায়ে এই জঘন্য অপরাধের জন্যে আইচম্যান নামে কুখ্যাত এক ব্যক্তিকে দায়ী করা হয়। যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে যখন তাকে বিচারের জন্যে আদালতে উপস্থিত করানো হয় তখন এই বলে সে নিজেকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করল যে, সে যা কিছু করেছে সবই করেছে কর্তৃপক্ষের আদেশের কারণে। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের সময় যে-সব পাকিস্তানি সেনা ত্রিশ লক্ষ বাংলাদেশিকে হত্যা করেছে, বহু নারীকে ধর্ষণ করেছে এবং হাজার হাজার বাড়িঘর আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে, তাদেরও যদি প্রশ্ন করা যেত কেন তারা তা করেছে, তারাও হয়ত উত্তরে বলত যে, কর্তৃপক্ষের আদেশেই তারা তা করেছে।

অন্যদিকে, অতিরিক্ত স্বাধীন চেতনার বিবেকবান মানুষেরও একটা বিপদজনক দিক রয়েছে। এরূপ ব্যক্তি সহজেই ভাবতে পারে: "আমি যা করেছি, ভেবে চিন্তেই করেছি"; "আমি যা ঠিক মনে করেছি, তাই করেছি। আমি কারো মতামতের ধার ধারি না।" এই ধরনের মনোভাব এবং বিবেকবোধ সেই ব্যক্তিকে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এক্ষেত্রে সমাজের অন্য মানুষের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, প্রত্যাশা, অনুভূতি এবং পছন্দ-অপছন্দকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা হয়। এই পৃথিবীতে আমরা কেউই 'একা' নই, অন্যের সান্নিধ্যে ও সাহচর্যেই আমরা বাস করি এবং বেড়ে উঠি।

এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র দীপ হঠাৎ করে তার পড়াশোনা বন্ধ করে দিলো। অন্যের প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল যে, পড়াশোনা তার ভালো লাগে না। দীপ বেশি করে তার বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে শুরু করল, আস্তে আস্তে সে নেশায় জড়িয়ে পড়ল। বাড়ি থেকে টাকা পয়সা এবং মূল্যবান সামগ্রী চুরির অভ্যাসে পরিণত হলো। বাবা-মা দীপকে ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য দীপের ছোটবেলা থেকেই তেমন ফলপ্রসূ কোনো ভূমিকা পালন করেনি। পুলিশ দীপকে কয়েকবার বিভিন্ন অপরাধে জেল হাজতে দিলো। কিন্তু প্রতিবারই তার পিতামাতা তাকে ছাড়িয়ে আনল। এই ঘটনায় দীপ ও তার পিতামাতা উভয়েরই ত্রুটিপুর্ণ বিবেক লক্ষ করা যায়।

পরিপক্কতায় বৃদ্ধিলাভ

পরিপক্ক বিবেকসম্পন্ন মানুষরূপে বেড়ে ওঠার জন্যে নিম্নোক্ত দুইটি বিষয় অতি গুরুত্বপূর্ণ:

ক. পরিপক্ক বিবেকবান মানুষরূপে বেড়ে ওঠা

পরিপক্ক বিবেকবান মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠা হলো সারা জীবনের কাজ। এটা প্রতিটি মানুষের সারা জীবনের ধ্যান ও সাধনা। জ্ঞান হওয়া থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত এই সাধনা চলে। ব্যক্তিগত ও দলীয় চিন্তা ধ্যান আমাদের নিজেদেরকেই বুঝতে সাহায্য করে, "আমার জীবনের মূল্যবোধ কেমন হওয়া প্রয়োজন।"

এরূপ ব্যক্তিগত ও দলীয় চিন্তা-ধ্যান আমাকে বুঝতে সাহায্য করে যে, আমি জন্মলগ্ন থেকেই একটি সমাজে বাস করে আসছি যার ধ্যান-ধারণা আমার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বর্তমান বিশ্ব হয়ে উঠেছে একটি পরিবার, একটি সমাজ। এটি দ্রুত পরিবর্তনশীল। ফলে প্রতিদিন নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হচ্ছে। এই আবিষ্কারমুখর ও দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে নতুন কোনো কিছুকে সচেতনভাবে দেখা ও গ্রহণ করার জন্য আমাদের বিবেকের নব জাগরণ প্রয়োজন।

খ. ব্যক্তি ও সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টা

মানুষ ও সমাজ পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রতিটি মানুষের জন্ম-জীবন-মৃত্যু সমাজের মধ্যেই। সমাজের মধ্যেই তার বৃদ্ধি লাভ এবং তার বিবেক ও মূল্যবোধের স্বীকৃতি। অন্যদিকে ব্যক্তি ছাড়া সমাজ অকল্পনীয় ও অস্তিত্বহীন। কাজেই প্রত্যেক মানুষকে সচেতনভাবে লক্ষ রাখতে হয় যেন সে নিজের ব্যক্তিগত বিবেক ও সমাজ এই দুইয়ের পরস্পরের সাথে সম্মিলনে তার মূল্যবোধসমূহ গড়ে তুলতে পারে। কাজেই আমাদের মূল্যবোধগুলোর পুনর্মূল্যায়ন একান্ত প্রয়োজন এটি জানার জন্যেই যে, সেগুলো কতটুকু আমার ও সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধুমাত্র নিজের বিবেক অনুযায়ী মূল্যবোধগুলো নির্ধারণ করলে সমাজকে যেমন অগ্রাহ্য করা হয়, তেমনিভাবে শুধু সমাজের মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হলে মানুষের নিজস্ব বলে আর কিছু থাকে না; সে হারিয়ে যায়। তাই ব্যক্তিকে সমাজের মূল্যবোধগুলো থেকে নিজের বিচার-বিবেচনায় ভালোগুলোকে যাচাই-বাছাই করে নিতে হয়। যেমনঃ বর্তমান সমাজে ভালো-মন্দ বিচিত্র ধরনের সংবাদ মাধ্যম পত্র-পত্রিকা ও আকাশ-সংস্কৃতি প্রচলিত রয়েছে। ব্যক্তি মানুষকে ভেবে-চিন্তে বাছাই করে নিতে হয়। কোন মূল্যবোধগুলো তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ, উন্নত জীবন এবং সঠিক নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে সহায়ক। তখনই মাত্র একজন মানুষ সঠিক ও সুন্দরভাবে তার জীবনকে পরিচালনা করতে পারবে।

এইডস, ধূমপান ও মাদকাসক্তি

মূল্যবোধগুলো রেল লাইনের মতো। রেল লাইন যেমন করে রেলগাড়িকে সঠিক স্থানে পৌঁছাতে সহায়তা করে তেমনি সঠিক মূল্যবোধ মানুষকে সঠিক লক্ষ্যের দিকে চালিত করে। কিন্তু যার জীবনে সঠিক মূল্যবোধ থাকে না, সে অনায়াসে মন্দ দিকে আসক্ত হয়ে জীবনের গতিপথ থেকে হারিয়ে যেতে পারে। এরকম ব্যক্তি নানা রকম মন্দ নেশায় আসক্ত হয়ে যেতে পারে, খারাপ বন্ধুর পাল্লায় পড়ে মারাত্মক মরণব্যাধি এইডস-এর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যেতে পারে। সেজন্য তারুণ্যের এই বয়সে আমাদের ধূমপান ও মাদকাসক্তির খারাপ প্রভাব এবং এইডস্ ও এইচআইভি সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা আবশ্যক। এগুলোর বিষয়ে জেনে আমরা মন্দ জীবনযাপন থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করব।

মারাত্মক মরণ-ব্যাধি এইডস্ ও এইচআইভি

বর্তমান বিশ্বে এইডস্ একটি মারাত্মক মরণ-ব্যাধি হিসেবে বিবেচিত। কোনো কোনো দেশে বিশেষভাবে, আফ্রিকা মহাদেশে এটির প্রকোপ ও বিস্তার এত বেশি যে, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাসহ আমাদের সকলের জন্যে এটি একটি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশেও এর মারাত্মক প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে এবং দিন দিন এইডস্ আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এইডস্ ও এইচআইভি (AIDS ও HIV) কতগুলো ইংরেজি শব্দসমষ্টির প্রথম অক্ষর দ্বারা তৈরি। শব্দ দুইটি এখন সারা বিশ্বে প্রচলিত।

AIDS শব্দটির উৎপত্তি: Acquired Immuno Deficiency Syndrome

HIV শব্দটির উৎপত্তি: Human Immunodeficiency Virus

সাধারণত AIDS এবং HIV পাশাপাশি লেখা হয়। এর দ্বারা বুঝানো হয় এমন একটি রোগকে, যে রোগে আক্রান্ত হলে মানবদেহ রোগ সংক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা হারায় এবং আক্রান্ত ব্যক্তি প্রায়শ মারা যায়।

এইডস্ রোগ ও এইডস্ আক্রান্ত মানুষের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি

আমাদের সমাজের লোকেরা এইডস্ রোগে আক্রান্ত রোগীকে দারুণ ভয় ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে থাকে। এইডস্ সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান না থাকায় অনেকে এটাকে অবৈধ যৌন সম্পর্কের দ্বারা সৃষ্ট পাপের ফল ও পাপের শক্তি হিসেবে বিবেচনা করে ধর্মীয় ও নৈতিক দিক থেকেও এইডস্কে একটি মারাত্মক পাপ ও নৈতিক অবক্ষয় এবং এইডস্ আক্রান্ত মানুষকে 'পাপী' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফলে এইডস্ আক্রান্ত মানুষ হয়ে ওঠে সকলের ঘৃণার পাত্র/পাত্রী এবং সমাজে সে হয় 'এক-ঘরে'। তার পক্ষে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা হয়ে ওঠে অসম্ভব। তাই এইডস্ আক্রান্ত মানুষ জীবিত থেকেও যেন মৃত। তার যেন কোনো মানবীয় মর্যাদা নেই, সম্মান নেই, কোনো ধর্মীয় উৎসব, বিবাহ ও সামাজিক অনুষ্ঠানে তার কোনো স্থান নেই।

কীভাবে এইডস্-এর বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা যায়?

বর্তমান বিশ্বে চিকিৎসাবিদগণ ও ধর্মীয় চিন্তাবিদগণ এইডস্ রোগের বৃদ্ধি প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে A-B-C পদ্ধতির কথা জোর দিয়ে প্রচার করছেন।

A=Abstain/Avoid বা বিরত থাক/এড়িয়ে চল: অবিবাহিত যুব-কিশোরীদের পবিত্র বিবাহ বন্ধন ব্যতীত যৌন সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা; বিবাহিত নারী-পুরুষের জন্যে জীবন সঙ্গী-সঙ্গিনী ব্যতীত যেকোনোরূপ যৌন সম্পর্ক সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলা। B=Be Faithful বিশ্বস্ত থাক: যুবকযুবতী বা কিশোর-কিশোরী হিসেবে জীবনের পবিত্রতা সতীত্বের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা; বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী হিসেবে মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকা। C=Change of Behaviour বা আচরণের পরিবর্তন: জীবনের মন্দ অভ্যাসের পরিবর্তন হলো জীবনের শুচিতা ও খ্রিষ্টীয় মুক্তি লাভের উত্তম পথ।

তবে এইডস্ রোগের বৃদ্ধি প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের আরও মনে রাখতে হবে যে, কেবলমাত্র শারীরিক সম্পর্কের দ্বারাই এ রোগ ছড়ায় না। রোগীর ব্যবহৃত ইনজেকশনের সুঁচ ব্যবহার করলে, এইডস্ রোগীর রক্ত গ্রহণ করলে, এইডস্ আক্রান্ত মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করলে ও সেই মায়ের দুধ পান করলে, এইডস্ রোগীর কাছ থেকে অঙ্গ নিয়ে তা প্রতিস্থাপন করলে ইত্যাদি কারণেও এইডস্ রোগ ছড়াতে পারে। তাই এ সব ব্যাপারে আমাদের সাবধান থাকতে হবে।

নেশায় জীবন ধ্বংস

"আমার ছেলে আমাদের সর্বনাশ করেছে, আমাদের সংসার ধ্বংস করে দিয়েছে...।" কাঁদতে কাঁদতে কথাগুলো বলছিলেন বিলাসের মা এবং চোখের জল মুছছিলেন। কী হয়েছে, জানতে চাইলে তিনি বলতে

লাগলেন: "আমার ছেলে খুব ভালো ছিল। ছোটবেলা থেকেই সে আমাদের বাধ্য হয়ে চলত। ওর নামে কোনদিন কোন অভিযোগ কারো কাছ থেকে শোনা যায়নি। ওকে নিয়ে আমরা কত গর্ব করতাম। ওকে নিয়ে আমাদের কত বড় স্বপ্ন ছিল। কিন্তু সব শেষ হয়ে গেছে। সে আমাদের সমস্ত আশা, আমাদের সব স্বপ্ন ধ্বংস করে দিয়েছে গত প্রায় দুই বছর ধরে ওকে নিয়ে আমরা অনেক কষ্টের মধ্যে রয়েছি। ওর কিছু বন্ধুদের সাথে ও নেশায় জড়িয়ে যায়। কত মিথ্যা বলে বলে ও আমার কাছ থেকে কত বার টাকা নিয়েছে। ওর বাবা এই নিয়ে আমার ওপর কতবার রাগারাগি করেছে। আমি ছেলেকে ভালোবাসি বলে ওর সব কথা সত্য বলেই মনে করতাম। কিন্তু আস্তে আস্তে দেখছি ঘরের অনেক জিনিস হারিয়ে যেতে লাগল। একদিন হয়তো দেখছি টেবিল ঘড়িটা নেই; অন্যদিন দেখছি মোবাইল ফোনটা নেই; আরেকদিন হয়তো দেখছি আমার জমানো টাকাগুলো নেই; হয়তো আরেকদিন দেখছি চাল নেই। আলমারির অনেক জিনিসই এখন আর নেই।"

নেশার শুরু ছোট্ট পদক্ষেপ দিয়ে

একদিন বিকেল বেলা সুমন তার বন্ধুদের সাথে ঘুরতে বের হলো। মাঠের এক কোণায় এসে তারা জড়ো হলো। তারপর একজন সিগারেট বের করল এবং তারা ধূমপান করতে শুরু করল। তারা সুমনকে একটা সিগারেট দিল আর সে-ও ধূমপান করতে শুরু করল। আস্তে আস্তে তার বেশ ভালো লাগছে বলেই মনে হলো। আর এভাবেই সে ধীরে ধীরে হিরোইনের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ল। তারপর যা হবার, তা-ই হলো। পড়াশুনা বন্ধ হলো: ঘরের নানান জিনিসপত্র চুরি হতে শুরু হলো: মিথ্যা বলা অভ্যাসে পরিণত হলো। পাড়ার মানুষ ছিঃ ছিঃ করতে শুরু করল। শেষে তার স্থান হলো মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে।

নেশার পরিণতি

আজ সারা বিশ্বে বিলাস আর সুমনের মতো অনেক শিশু-কিশোর ও যুবক-যুবতীর সুন্দর জীবন কুৎসিত-ঘৃণিত জীবনে পরিণত হচ্ছে। নেশার কারণে যে সব মন্দ পরিণতিগুলো লক্ষ করা যায়, সেগুলো নিম্নরূপ :

১. মিথ্যা বলা অভ্যাসে পরিণত হওয়া

২. চুরি করার প্রবণতা

৩. পিতামাতা ও গুরুজনদের অবাধ্য হওয়া এবং তাঁদের সাথে অশোভন আচরণ করা

৪. পরিবারিক প্রার্থনা ও গির্জা-উপাসনায় অনুপস্থিতি

৫. নৈতিক জীবনে অধঃপতন ইত্যাদি।

এসো নেশাকে 'না' বলি

বিলাস আর সুমনের মতো আজ অনেক মা-বাবার চোখে জল: তাদের আদরের সন্তানকে নিয়ে গর্ব করা তো দূরের কথা, লজ্জায় সমাজে আজ মুখ দেখানোই দারুণ কষ্ট। প্রত্যেক পিতামাতাই চান তাদের সন্তানদের সুন্দর জীবন। তাদের একান্ত কামনা ও প্রার্থনা সন্তানেরা প্রতিষ্ঠিত হোক, পরিবার ও বংশের সুনাম বয়ে আনুক। কাজেই প্রত্যেক শিশু-কিশোর ও যুবক-যুবতীর কর্তব্য তাদের পিতামাতার মতো নিজেদের জীবনের জন্যে সুন্দর স্বপ্ন দেখা এবং সেইভাবে জীবন যাপন করা। তাই সুন্দর জীবন গড়ার মন্ত্রে প্রত্যেক শিশু-কিশোর ও যুবক-যুবতী নিজেরাই নিজেদের কাছে এই শপথ করুক: "আমি কখনো কোনোরূপ নেশা করব না।" এটা হোক তাদের জীবনের একটা মহান ব্রত।

মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধ

পবিত্র মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধসমূহই হলো প্রত্যেক খ্রিষ্টভক্তের মূল্যবোধের উৎস ও আদর্শ। যীশু নিজেই এই মূল্যবোধগুলো তাঁর শিষ্যদের শিখিয়েছেন এবং তাদের আদেশ দিয়েছেন অন্যদের তা শিক্ষা দিতেঃ "তোমরা জগতের সকল মানুষের কাছে যাও . . . এবং আমি তোমাদের যা কিছু করতে নির্দেশ দিয়েছি, তা তাদের পালন করতে শেখাও।" (মথি ২৮: ১৯-২০)।

পবিত্র মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধগুলোই আমাদের জীবনের নৈতিক মূল্যবোধ ও পবিত্র সুন্দর জীবনের ভিত্তি ও চালিকাশক্তি। খ্রিষ্টভক্তকে তাই বিশ্বস্তভাবে যীশুর বাণী পাঠ ও অনুধ্যান করে যীশুর শেখানো মূল্যবোধগুলোর সাথে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং সেই অনুসারে জীবনযাপন করা একান্ত প্রয়োজন। আমরা যেন যীশুর শেখানো মূল্যবোধগুলো আমাদের নিজের করে নেই এবং সেগুলো দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জীবন যাপন করি। এ বিষয়ে যীশু বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। যীশুর শেখানো মূল্যবোধগুলোই হলো আমাদের জন্যে একমাত্র সত্য পথ ও পূর্ণ মুক্তির পথ। তাই যীশু বলেনঃ "আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন।" (যোহন ১৪: ৬)।

প্রার্থনা

সঠিক বিবেক ও যথাযথ মূল্যবোধ লাভের জন্যে আমাদের কর্তব্য হলো প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে এর জন্যে প্রার্থনা করা। রাজা সলোমনের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা প্রতিদিন এভাবে প্রার্থনা করতে পারি :

হে প্রভু, আমাকে তোমার জ্ঞান দান কর যেন আমি সঠিক ও স্পষ্টভাবে ভালো ও মন্দের ব্যবধান চিনতে পারি এবং সত্য সঠিক পথে প্রতিদিন জীবনযাপন করি।

কাজ : "নেশা সর্বনাশা জীবন বিনাশকারী" এ শিরোনামের ওপর একটি প্রতিবেদন লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আমাদের বিবেককে কী বলা যায়?

ক. আমাদের গোপন অন্তস্তল
খ. আমাদের অধ্যবসায়
গ. আমাদের সুপ্ত প্রতিভা
ঘ. আমাদের ধার্মিকতা

২. অতিরিক্ত স্বাধীনচেতা মানুষ কেমন হয়?

ক. ত্যাগস্বীকার করে না
খ. অল্পতেই ভেঙে পড়ে
গ. অন্যের মতামত গ্রাহ্য করে না
ঘ. অন্যের সমালোচনা করে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

রমেশ খুব ধার্মিক কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তিনি বেকার। কোনো চাকুরি তিনি পাচ্ছেন না। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় স্ত্রী-সন্তানদের সাথে প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করেন না। তার চাকুরি হচ্ছে না, হচ্ছেই না। আর্থিক অনটনের কারণে তার মন খারাপ, তাই তিনি অনেক রাতে বাড়ি ফিরেন। স্ত্রী-সন্তানের মন পান না। অবশেষে তিনি তার ভুল বুঝতে পেরে তার আচরণ পরিবর্তন করেন। তার একটি ভালো চাকরি হলো।

৩. কিসের তাড়নায় রমেশ তার আচরণ পরিবর্তন করেন?

ক. অভাবের

খ. বিবেকের

গ. অনুভূতির

ঘ. আবেগের

৪. নিজের ভুল বুঝে ভালো পথে ফিরে না আসলে রমেশের–

i. মূল্যবোধের অবক্ষয় হতো

ii. ধার্মিকতা হ্রাস পেত

iii. সামাজিক দায়বদ্ধতা বাড়ত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. i ও iii

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মূল্যবোধ বলতে কী বুঝ?

২. মূল্যবোধের অন্তর্নিহিত উৎস বলতে কী বোঝায়?

৩. বিবেকের গঠন কীভাবে করা সম্ভব?

৪. এইডস্ কী?

৫. নেশাকে 'না' বলতে হয় কেন?

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. দৃশ্যকল্প-১

আব্রাহাম ও তেরেজার সংসার। তাঁদের পরিবারটি হলো একটি খ্রীষ্টীয় পরিবার। গ্রামের লোকদের সাথে তাঁদের সম্পর্ক খুবই সুন্দর। তাঁরা প্রতি রবিবার গির্জায় যান এবং সন্ধ্যায় বাড়িতে সবাইকে নিয়ে প্রার্থনা করেন। সন্তানদের সুশিক্ষা দিয়ে বড় করছেন। গ্রামের হতদরিদ্র লোকদের বিপদে আপদে তারা পাশে দাঁড়ান।

দৃশ্যকল্প-২

বিধান ও প্রমিলা ভালোবেসে সংসার সাজালেও কিছুদিন পরই তাদের মধ্যে ঝগড়া, মনোমালিন্য ও অবিশ্বাস শুরু হয়। সামান্য ভুল বোঝাবুঝি নিয়ে প্রায়ই তাদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হয়। তাঁদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদের কারণে বিধান তার স্ত্রী প্রমিলাকে ভীষণ মারধর করেন।

ক. মূল্যবোধের সাথে কিসের গভীর সম্পর্ক রয়েছে?

খ. মানুষের জীবনে মূল্যবোধসম্পন্ন জ্ঞানের প্রয়োজন কেন?

গ. কোন শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আব্রাহাম ও তেরেজা সুখী সংসার গঠন করেন – ব্যাখ্যা করো।

ঘ. বিধান ও তার স্ত্রীর মধ্যে সুন্দর বিবেকের কি সমন্বয় ঘটেছে বলে তুমি মনে কর? তোমার মতামত তুলে ধরো।

২. পায়েলের শৈশবকাল ছিল খুবই সুন্দর। বরাবরই সে শ্রেণিতে ভালো ফল করত। মা-বাবা তাকে নিয়ে খুবই গর্বিত ছিলেন এবং ভবিষ্যতে সে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে বলে তাদের ধারণা ছিল। নবম শ্রেণিতে অধ্যয়নাবস্থায় তার পিতামাতা লক্ষ করছেন যে পায়েল বাজে ছেলেদের সাথে চলাফেরা করে, পরীক্ষায় খারাপ ফল করছে। সন্ধ্যার পূর্বে সে বাড়ি ফিরেই না বরং মাঝে মাঝে অনেক রাতে নেশা করে বাড়ি ফিরে। তার পিতামাতা তাকে নিয়ে অনেক চিন্তিত। তাকে ভালো পথে ফিরিয়ে আনতে তারা অনেক চেষ্টা চালাচ্ছেন কিন্তু প্রতি পদক্ষেপই তারা ব্যর্থ হন। পরিশেষে পায়েল অনেক জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং বলা যায়, 'নেশাই পায়েলের জীবনকে কুরে কুরে ধ্বংস করে দিচ্ছে।'

ক. বর্তমান বিশ্বে এইডস্ কী হিসেবে পরিচিত?

খ. এইডস্ আক্রান্ত ব্যক্তি সমাজের ঘৃণার পাত্র হয়ে ওঠে কেন?

গ. কোন শিক্ষাকে আয়ত্ত করে পায়েল জীবন পরিচালনা করতে পারত? – ব্যাখ্যা করো।

ঘ. পায়েল তার পথ থেকে ফিরে আসতে কী পদক্ষেপ নিতে পারে? – মূল্যায়ন করো।

দ্বাদশ অধ্যায়
হৃদয়ের তীব্র যন্ত্রণা

একটি প্রচলিত প্রবাদে বলা হয়েছে: "জীবন ফুলসজ্জা নয়।" কথাটা চিরন্তন সত্য। এই পৃথিবীতে কোনো মানুষেরই জীবন কোনোরূপ দুঃখ-কষ্টবিহীন আরামের নরম ফুলসজ্জা নয়। এই পৃথিবীতে যেমন রয়েছে দিন-রাত্রি ও আলো-আঁধারের খেলা, ঠিক তেমনিভাবে মানুষের জীবনেও রয়েছে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার রহস্যময় খেলা। দুঃখ-যন্ত্রণার কষ্ট-জ্বালা থেকে কেউ রেহাই পায়নি কখনো, রেহাই পায়নি পৃথিবীর প্রথম নরনারী আদম হবা, এমন কি, বড় বড় প্রবক্তা, ধর্ম প্রবর্তক এবং সাধু-সাধ্বীগণও। তাঁরা বরং জীবনের দুঃখ-কষ্ট যন্ত্রণাকে বরণ ও সহ্য করেছেন মহত্তর কর্মসাধনের উদ্দেশ্যে। কেননা তাঁরা বলেছিলেন যে, কষ্ট-যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই জীবনের প্রতিষ্ঠা, গৌরব ও সাফল্যের জন্ম। তাই আরেকটি প্রবাদে বলা হয়েছে: "কষ্ট ছাড়া গৌরব নেই"।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- কষ্টের ধারণা ও বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- কষ্টযন্ত্রণা সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব অর্জনের উপায় বর্ণনা করতে পারব;
- কষ্টভোগ সম্পর্কে বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব;
- কষ্টযন্ত্রণা সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব অর্জন করব এবং
- কষ্টযন্ত্রণা সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকব।

কষ্টের বিভিন্ন ধরন

মানুষের জীবনে বিভিন্ন ধরনের কষ্ট লক্ষ করা যায়। সেগুলোকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যেতে পারে:

ক. **দৈহিক কষ্ট:** রোগ-যন্ত্রণা, দীর্ঘকালীন অসুস্থতা, ক্লান্তি, স্বাস্থ্যহীনতা, প্রসব-বেদনা, কঠোর পরিশ্রম, মৃত্যুযন্ত্রণা ইত্যাদি।

খ. **মানসিক কষ্ট:** দৈহিক কষ্টের মতো মনের কষ্টও কম নয়। দুশ্চিন্তা, হতাশা, নিরাশা, ব্যর্থতা, একাকীত্ববোধ, পরিত্যক্তবোধ, ভুল বোঝাবুঝি, নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক সমালোচনা ইত্যাদি ভীষণ মনোকষ্টের জন্ম দেয়।

গ. **হৃদয়ের কষ্ট:** আনন্দহীনতা, অশান্তি, ভালোবাসার অভাব, গ্রহণীয়তার অভাব, বন্ধুত্বের অভাব, হৃদয়ের দুঃখ-কষ্টের কথা কাউকে বলতে না পারা ইত্যাদি হৃদয়ের মধ্যে গভীর কষ্ট ও বেদনা সৃষ্টি করে। অনেক সময় গরিব মানুষ কষ্ট পায় তার দরিদ্রতা বা নানা অভাব অনটনের কারণে, অন্যদিকে ধনী মানুষ অনেক সময় কষ্ট পায় সম্পদের জন্যে দুশ্চিন্তা এবং প্রত্যাশা অপূর্ণ থাকার কারণে।

ঘ. **জাগতিক কষ্ট:** জগতের নেতিবাচক ঘটনাপ্রবাহ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মানুষের মনে কষ্ট জাগায় এবং হৃদয়কে ব্যথিত করে। যেমনঃ দারিদ্র্য, বেকারত্ব, মহামারি, যুদ্ধ, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, দুর্ভিক্ষ, আর্থিক মন্দাভাব ইত্যাদি মানুষের মনে কষ্ট জাগায় এবং অশান্তি সৃষ্টি করে।

একজন যুবতীর আত্মকথা

আমি আমার মা-বাবার একমাত্র সন্তান। প্রাচুর্যের মধ্যেই আমি বড় হয়েছি। জীবনে যা কিছু প্রয়োজন মনে করেছি, তার সবই পেয়েছি, কোনোকিছুর অভাব কখনো বোধ করিনি, যদিও আমি একটি ভালো খ্রীষ্টান পরিবারে জন্মেছি ও বড় হয়েছি, তবু কেন জানি ধর্ম-কর্ম আমার ভালো লাগত না। গির্জায় প্রার্থনা আমার ভালো লাগত না। ঈশ্বরকে আমি ভালোবাসতাম না, চেষ্টা করতাম তাঁকে ভুলে যেতে এবং তাঁকে বিশ্বাস না করতে। কিন্তু আমি তা পারিনি। যতই তাঁকে ভুলে থাকতে চেষ্টা করেছি, ততই মনে হয়েছে তিনি আমার অন্তরে এসে হানা দিয়েছেন। অন্তরের মধ্যে আমি কী যে ভীষণ জ্বালার মধ্যে রয়েছি। উহ্ঃ কী কষ্ট! এর কি কোনো চিকিৎসা আছে, যার দ্বারা আমি অন্তরের এই জ্বালা থেকে মুক্তি পেতে পারি?

কাজঃ ১. এই যুবতী মহিলা কোন্ ধরনের কষ্টে ভুগছেঃ দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক না কি জাগতিক?

কাজঃ ২. তুমি কি কোনো কষ্টভোগী মানুষের কাহিনি উল্লেখ করতে পার?

কাজঃ ৩. যখন তুমি মানুষের দুঃখ কষ্ট স্বচক্ষে দেখ, তখন তোমার ভিতরে কী ধরনের অনুভূতি জাগে? দলে এই প্রশ্নগুলো আলোচনা করো।

কষ্ট-যন্ত্রণা কি অপরিহার্য?

শত সহস্র বছর ধরে বিশ্বের বৈজ্ঞানিকগণ চেষ্টা করে আসছেন কী করে মানুষের কষ্ট-যন্ত্রণা দূর বা লাঘব করা যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা তা করতে পারেননি। এই যে বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞান উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছে, চাঁদ ছেড়ে এখন মানুষ মঙ্গলগ্রহে এবং অন্যান্য গ্রহে পাড়ি জমাতে চেষ্টা করছে। এই উন্নত বিশ্বে মানুষের কষ্ট-যন্ত্রণা কোনো দিকে কমেনি। একটু গভীর দৃষ্টি নিয়ে বিশ্বের দিকে তাকালেই মানুষের বিভিন্ন রকমের কষ্ট-দুঃখ-যন্ত্রণা আমাদের নজরে পড়ে।

কেউ কেউ এমন প্রশ্নও করতে পারেঃ এতসব দুঃখ-কষ্টের মধ্যে কী করে আমরা ঈশ্বরকে প্রেমময় ও করুণাময় পিতা বলে ডাকতে পারি? বিশেষভাবে যখন দেখি, নিরপরাধ ও ভালো মানুষ কষ্টে ভুগছে; নিষ্পাপ শিশুরা অভাবে ও ক্ষুধার তাড়নায় কাঁদছে এবং নিরীহ মানুষ যুদ্ধে মারা যাচ্ছে। এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া এত সহজ নয়। পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে প্রবক্তা যোবের কাহিনি পড়লে একই ধরনের প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে। তিনিও তাঁর জীবনের নানা কষ্ট-যন্ত্রণার কোন সঠিক উত্তর খুঁজে পাননি। তাঁর বন্ধুদের এবং অনেকের প্রশ্ন ছিলঃ "ধার্মিক-নিরপরাধ মানুষ জীবনে কষ্ট ভোগ করে কেন?" মানুষের জীবনে কষ্টের আগমন একটি রহস্য। অর্থাৎ ভালো, নির্দোষ ও ধার্মিক মানুষ কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করে কেন—এই রহস্যাবৃত প্রশ্নের সঠিক উত্তর একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। শুধু এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, কর্মফলে ধার্মিক-অধার্মিক, ঈশ্বরে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী—সকলের জন্য দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা অনিবার্য, কেউ তা এড়াতে পারে না।

কষ্টের কারণসমূহ

ধার্মিক মানুষের জীবনে কষ্ট আসে কেন, যদিও এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়, তবুও কিছু কষ্টের ক্ষেত্রে আমরা কিছু উত্তর খুঁজে পেতে পারি।

১. **প্রকৃতির নিয়ম ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ:** প্রকৃতির নিয়মের মধ্যেই মানুষের জন্যে কিছু কষ্ট লুকিয়ে রয়েছে। যেমন: ভূমিকম্প, সাইক্লোন, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মানুষকে কষ্ট পেতে হয়। তাছাড়া প্রকৃতির নিয়মের কারণেই মানুষকে বৃদ্ধ হতে হয় এবং মৃত্যুবরণ করতে হয় যা মানুষকে কষ্ট দেয় ও কাঁদায়। বিজ্ঞানের অভাবনীয় আবিষ্কারের ফলে মানুষ অনেক কষ্ট জয় করতে পারলেও কিছু কষ্টদায়ক মন্দতাকে এখনো জয় করতে পারেনি।

২. **মনুষ্য-সৃষ্ট কষ্ট:** অনেক কষ্ট রয়েছে, যা মানুষ নিজেই সৃষ্টি করে তাদের অবহেলা, অজ্ঞানতা, স্বার্থপরতা, অতিরিক্ত চাহিদা, নানারকম পাপ ও বিভিন্ন রকম দুষ্টতা দ্বারা। যেমন: গাড়ি-ঘোড়ার দুর্ঘটনা–যা খামখেয়ালি ও অসাবধানতার জন্যে ঘটে নরহত্যা, ব্যভিচার, যুদ্ধ, রোগব্যাধি ও অকাল মৃত্যু যা অনেক অপরিচ্ছন্ন ভেজাল ও ময়লাযুক্ত খাবারের জন্যে ঘটে, দারিদ্র্য, অভাব ইত্যাদি।

কাজ: তোমার পরিচিত কোন ভালো মানুষ রোগযন্ত্রণা বা অন্য কোনোভাবে কষ্ট পেয়েছে এরকম জানা থাকলে তা দলে অন্যদের সাথে সহভাগিতা করো।

কষ্ট-যন্ত্রণার ইতিবাচক মনোভাব

দৈহিক প্রতিবন্ধী জনী জীবনের চরম হতাশার কারণে নিজেকে নিরুপায় ভেবে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তা করল না। পরে সে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে চেষ্টা করল এবং তার সুস্থতার জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল। তাতেও কোনো ভালো ফল না পেয়ে তার হতাশা রয়েই গেল।

অনেক বন্ধু-বান্ধব আর গুরুজনদের প্রার্থনা আর সৎ পরামর্শে এক দীর্ঘ সংগ্রামের পর জনী একদিন তার প্রতিবন্ধী অবস্থার জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলো। সে তার জীবনে ঈশ্বরের একটি সুন্দর পরিকল্পনা খুঁজে পেল। জনী মুখে পেন্সিল নিয়ে লিখতে ও ছবি আঁকা শিখতে শুরু করল। এখন তার আঁকা চমৎকার ছবিগুলো শুভেচ্ছা কার্ড ও বড়দিনের কার্ড হিসেবে সারা দেশের বিভিন্ন বইয়ের দোকানে বিক্রির জন্যে শোভা পাচ্ছে। ছবিগুলোর পেছনে ট্রেডমার্ক হিসেবে লেখা রয়েছে: "Joni-PTL" – যার অর্থ হলো "Praise The Lord" ('প্রভুর প্রশংসা করো')।

প্রতিবন্ধী হওয়ার যে কষ্ট জনীর কাছে পূর্বে অতি বেদনাদায়ক মনে হয়েছে, সে কষ্টই এখন ঈশ্বরের প্রশংসায় পরিণত হয়েছে।

উপরে বর্ণিত জনীর জীবনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখন চিন্তা করব কীভাবে দুঃখকষ্টের প্রতি আমরা ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে পারি। সাধু পিতরের কাছ থেকে আমরা দুঃখকষ্ট সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব সম্পর্কে শিখতে পারি। তিনি বলেন: "প্রীতিভাজনেরা, তোমাদের যাচাই করার

জন্যে এখন যে অগ্নিকাণ্ড চলছে, তাতে তোমরা আশ্চর্য হয়ো না; মনে করো না, তোমাদের ওপর অদ্ভুত কিছু ঘটছে। বরং এতে তোমরা খ্রীষ্টের দুঃখযন্ত্রণার যতখানি অংশীদার হয়ে উঠছ, তোমরা ততখানি আনন্দিতই হও, যাতে তাঁর সেই মহিমা প্রকাশের দিনেও তোমরা গভীর আনন্দেই আনন্দিত হতে পার। মানুষ যদি খ্রীষ্টের নামের জন্যে তোমাদের অপমান করে, তাহলে ধন্য তোমরা, কেননা তখন তোমাদের ওপর যে অধিষ্ঠিত রয়েছেন সেই মহিমাময় আত্মা, স্বয়ং ঈশ্বরেরই আত্মা। তোমাদের কেউ যদি দুঃখযন্ত্রণা পায়, তবে সে যে তা পাচ্ছে খুনী, চোর, অনাচারী বা পরাধিকারচর্চাকারী বলেই, এমনটি যেন কখনো না হয়। কিন্তু কেউ যদি খ্রীষ্টান বলেই দুঃখযন্ত্রণা পায়, তাহলে সে যেন তার জন্যে কোনো লজ্জা অনুভব না করে; বরং সে যে খ্রীষ্টান নামে পরিচিত, তার জন্যে সে যেন পরমেশ্বরের স্তুতি-বন্দনাই করে। আসলে এই তো সেই বিচার শুরু হওয়ার সময়; আর তা শুরু হচ্ছে, পরমেশ্বরের আপনজন যারা, তাদেরই বিচার দিয়ে। আমাদের বিচার দিয়েই যখন বিচারের কাজ শুরু হলো, তখন যারা পরমেশ্বরের মঙ্গলসমাচার মানতে চায় না, না জানি কী হবে তাদের পরিণাম। শাস্ত্রে তো লেখাই আছে: ধার্মিকের পক্ষে পরিত্রাণ পাওয়া যদি এত কঠিন হয়, তাহলে ভক্তিহীন পাপী মানুষের কী দশাটাই না হবে। তাই পরমেশ্বরের ইচ্ছায় যারা দুঃখযন্ত্রণা পায়, তারা সৎ জীবন যাপন করে চলুক আর এভাবে তারা, সেই পরম বিশ্বস্ত স্রষ্টা যিনি, তাঁরই হাতে সঁপে দিক নিজেদের প্রাণ" (১ পিতর ৪:১২-১৯)।

সাধু পিতরের এ কথা থেকে চারটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে:

১. আনন্দিত হওয়া: আমাদের নিজেদেরকে খ্রীষ্টের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে। কারণ আমরা ঈশ্বরের পুত্রের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরসন্তানের মর্যাদা লাভ করেছি। সন্তান হতে গিয়ে আমাদের কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। এখন আমরা বুঝতে পারি, কেন যীশুর শিষ্যগণ যীশুর নামে কষ্ট ভোগ করতে পেরে আনন্দিত হতেন। কষ্ট ভোগ করতে পেরে তাঁরা খ্রিষ্টের কষ্টের সাথে অংশগ্রহণ করতেন।

২. ব্যথার পর আসে গৌরব: স্বর্ণকে যেমন আগুনে পুড়িয়ে এর খাঁটিত্ব প্রমাণ করতে হয়, তেমনি কষ্টের কারণে প্রাপ্ত ব্যথার দ্বারা আমরা পরিশোধিত হই। এই ব্যথাই আমাদেরকে পিতা ঈশ্বরের যোগ্য সন্তানে পরিণত করে। এভাবে আমরা খ্রিষ্টের গৌরবে অংশগ্রহণ করতে পারি। তাই কবি বলেছেন, কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে, দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

৩. নিজের আত্মপরিচয়ের কথা স্মরণে রাখো: ঈশ্বর নিজেই আমাদের মধ্যে বসবাস করেন। কারণ সাধু পল বলেন, আমাদের দেহ হচ্ছে পবিত্র আত্মার মন্দির। কাজেই আমরা যখন কষ্টভোগ করি তখন ঈশ্বর নিজেই আমাদের মধ্যে অবস্থান করেন এবং তিনি আমাদের কষ্টভোগ করতে দেখেন। এই কারণে আমাদের দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই।

৪. ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ: আমরা যখন উপলব্ধি করতে সক্ষম হই যে, ঈশ্বর নিজেই আমাদের মধ্যে আছেন, তখন আমরা আর নিজের ওপর ভরসা করি না। আমরা তখন পুরোপুরি ভরসা করি ঈশ্বরের ওপর। আমরা তখন এই ভরসা করতে পারি যে, তিনিই কষ্টের সময় আমাদের শক্তি জোগাবেন এবং ভালো কাজ ক্রমাগত করে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন।

কষ্টভোগ সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা

কষ্টভোগ সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মে দুই রকমের দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলোঃ

ক. পুরাতন নিয়মের দৃষ্টিভঙ্গি

পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে কষ্টভোগকে খুবই নেতিবাচক হিসেবে দেখা হয়েছে। সেখানে কষ্টভোগকে মানবজীবনের একটি অভিশাপ ও কলঙ্ক হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এমনকি, কষ্টভোগকে কারো জীবনে পাপের শাস্তি হিসেবে দেখা হতো। সাধু পিতরও একবার পুরাতন নিয়মের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখে যীশুকে প্রশ্ন করেছিলেনঃ "এটা কার পাপের জন্যে হয়েছে?" যীশু বলেছিলেন, কারো পাপের জন্যে নয়; বরং ঈশ্বরের গৌরবের জন্যে।

পুরাতন নিয়মে যদিও কষ্টভোগী মানুষের প্রতি যথেষ্ট সমবেদনা সহানুভূতি দেখানো হয়েছে, তবুও কষ্টভোগকে একটি মন্দতা হিসেবেই দেখা হতো। দুষ্ট লোক জগতের মন্দের কবলে পড়ে বলতঃ "ঈশ্বর বলে কোনো কিছুই নেই" (সাম ১০:৪)। আবার কিছু কিছু দুষ্টলোক এ-ও মনে করত যে, এসব কষ্ট-যন্ত্রণার কারণ স্বয়ং ঈশ্বরের কাছেও অজানা (সাম ৭৩:১১)।

যোব (ইয়োব)-এর চরম কষ্টভোগের সময় তাঁর স্ত্রী তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেনঃ "তুমি ঈশ্বরকে অভিশাপ দাও" (যোব ২:৯)। যোবের বন্ধুদেরও একই মনোভাব ছিল, যা পুরাতন নিয়মের সমস্ত মানুষেরই মনোভাব প্রকাশ করে।

পুরাতন নিয়মে মানুষ মনে করত প্রতিটি কষ্ট বা মন্দের পেছনে কোনো না কোনো কারণ রয়েছে। তারা বিশ্বাস করত যে, হয় কোনো প্রাকৃতিক শক্তির কারণেই তা ঘটছে, না হয় সেই মন্দের পেছনে কোনো না কোনো মন্দ শক্তি বিশ্বের কোথাও রয়েছে।

খ. নতুন নিয়মে যীশুর দৃষ্টিভঙ্গি

নতুন নিয়মে যীশু নিজেই কষ্ট-যন্ত্রণাকে ধারণ করেছেন এবং মানুষের কষ্টভোগ সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। তিনি স্বয়ং ঈশ্বর হলেও আমাদের মতোই মানবরূপ ধারণ করলেন এবং পাপ ব্যতীত সকল বিষয়েই আমাদের মতোই দুর্বল স্বভাবের মানুষ হলেন। "তিনি মানুষের মতো হয়েই জন্ম নিলেন। আকারে প্রকারে মানুষের মতো হয়ে... আমাদেরই একজন হলেন তিনি (ফিলিপ্পীয় ২:৭-৮)।" আমাদের মতোই তাঁর জীবনেও ছিল অনেক স্বপ্ন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা–যা তিনি পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। আবার আমাদের মতোই তিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ক্লান্তি, সমস্যা, বিরোধিতা, ব্যর্থতা, হতাশা, বাধা এবং অন্যান্য সীমাবদ্ধতা এমনকি, মৃত্যুর অভিজ্ঞতাও গ্রহণ করেছেন।

যীশু কখনোই শুধু নিজের দুঃখ-কষ্টকে বড় করে দেখেননি; বরং অন্যের দুঃখ-কষ্টে তিনি তাদের সমব্যথী হয়েছেন। তাই যখনই তিনি অন্যের দুঃখ-কষ্ট দেখেছেন, তখনই তিনি দয়া ও করুণায় পূর্ণ হয়েছেন; ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন (মথি ৯:৩৬; ১৪:১৪; ১৫:৩২; লুক ৭:১৩; যোহন ১১:৩৩-৩৭)।

কষ্ট-যন্ত্রণার উপর যীশুর বিজয়

যীশু তাঁর প্রকাশ্য-জীবনকালে স্বর্গরাজ্যের সুখবর প্রচারের সময় বহু রোগীকে সুস্থ করে, মৃতকে জীবন দান করে, নানা অলৌকিক কর্ম সাধন করে, সর্বোপরি তিনি নিজে মৃত্যুর পর কবর থেকে পুনরুত্থিত হয়ে প্রমাণ করেছেন যে, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা, যাঁকে স্বয়ং ঈশ্বর এই জগতে পাঠিয়েছেন (মথি ১১:৪-৫)। এইসব কিছুই ছিল তাঁর চূড়ান্ত বিজয়ের পূর্বাভাষ বা সূচনামাত্র। তিনি জগৎকে জয় করেছেন। রোগ-ব্যাধি, দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-যন্ত্রণা, মৃত্যু—এই সবকিছুই তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছে। চরম কষ্টকর ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের জন্যে মুক্তি বা পরিত্রাণ অর্জন করেছেন। তিনি সর্বজয়ী মহাবিজয়ী ও সর্বকালের সর্ব-মানবের মহান মুক্তিদাতা। যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে কষ্ট-নিরাময়ের শক্তি—তথা মানুষকে দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে দেবার শক্তি দান করেছেন। তাঁর পবিত্র 'যীশু'-নামের শক্তিতেই তাঁরা সেই কষ্ট নিরাময়ের কাজ করতে পারবেন। আজও যীশু তাঁর সেই নিরাময়কারী শক্তি তাঁর শিষ্যদের সাথে সহভাগিতা করে চলেছেন।

কষ্টভোগকে যীশু আশিসধন্য করেন

এটা সত্যি যে, যীশু দুঃখ-কষ্ট বা মৃত্যু– এর কোনোটাই দূরে সরিয়ে দেন না কিন্তু সেইগুলোর সামনে সৎ-সাহসের সাথে দাঁড়াবার এবং মোকাবিলা করার শক্তি তিনি আমাদের দান করেন। যীশু বলেন: "দুঃখ-শোকে কাতর যারা, ধন্য তারা—তারাই পাবে সান্ত্বনা।" (মথি ৫:৪)। শোকে কাতর মানুষের চোখের জল তিনি দূর করে দেন না; কিন্তু জীবনের চলার পথে তিনি মানুষের চোখের জল মুছিয়ে দেন (লুক ৭:১৪)। এটি কষ্টভোগী মানুষের সাথে ঈশ্বরের মিলনের একটি আনন্দময় চিহ্ন, তিনি "তাদের চোখ থেকে মুছিয়ে দেবেন সমস্ত অশ্রুজল।" (প্রত্যাদেশ/প্রকাশিত ২১:৪)।

দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ আমাদের জন্যে হয়ে উঠতে পারে একটি আশীর্বাদ। কেননা তা ঈশ্বরের রাজ্যে আরও মহৎ গৌরব ও আনন্দের জন্যে আমাদেরকে প্রস্তুত করে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মানসিক কষ্ট কোনটি?

ক. অশান্তি

খ. ক্লান্তি

গ. হতাশা

ঘ. বেকারত্ব

২. কে মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠেছেন?

ক. লাসার

খ. কুমারী মারীয়া

গ. যোসেফ

ঘ. যীশু

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাদল খুবই ধনী লোক। তার পর্যাপ্ত সম্পদ রয়েছে। তবুও তিনি মানুষকে ঠকান এবং অবৈধ উপার্জন করেন। একাধিক বাড়ি, গাড়ি ও অজস্র সম্পদ করেছেন। এরপরও আরও সৌখিন ও ব্যয়বহুল জিনিস করার চাহিদা প্রকাশ পায়। তিনি কোনো প্রকারে নিজের ক্ষতি মেনে নিতে পারেন না।

৩. বাদলের মধ্যে কোন ধরনের কষ্ট বিদ্যমান?

ক. মনুষ্য সৃষ্ট

খ. দেবতা সৃষ্ট

গ. প্রকৃতি সৃষ্ট

ঘ. অলৌকিক সৃষ্ট

৪. বাদলের কষ্টের কারণ–

i. অতিরিক্ত চাহিদা

ii. সম্পদের মোহ

iii. ত্যাগের মনোভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জাগতিক কষ্ট বলতে কী বুঝ?

২. কষ্ট মানুষের জীবনে অপরিহার্য কেন?

৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলতে কী বোঝায়?

৪. কষ্ট ভোগ সম্পর্কে নতুন নিয়মের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল?

৫. দুঃখ-যন্ত্রণাভোগ আমাদের জন্য আশীর্বাদ কেন?

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জর্জ একজন বিশ্বাসী ঈশ্বরভক্ত। শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে খুবই দৃঢ়তা সম্পন্ন। সামান্য অসুস্থতায় তিনি ভেঙে পড়েন না। দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান তাই তিনি সবার সাথে একাত্ম হয়ে চলতে চেষ্টা করেন। এভাবে সহ্য করতে করতে এক সময় পরীক্ষা করে দেখা গেল তার ডায়াবেটিসই হয়েছে। তিনি জানেন এই রোগ মৃত্যু পর্যন্তই থাকবে তবু তিনি হতাশ না হয়ে ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে খুশি মনে গ্রহণ করেন। তিনি জানেন ঈশ্বর কষ্টের মধ্য দিয়ে মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ করেন।

ক. মানুষের হয়ে কে সবচেয়ে বেশি কষ্ট স্বীকার করেছেন?

খ. দুঃখ-কষ্ট সবার জন্য অনিবার্য কেন? বর্ণনা করো।

গ. দুঃখ-যন্ত্রণার ক্ষেত্রে জর্জের মনোভাব ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'জর্জের মনোভাব যেন পিতরের শিক্ষারই প্রতিফলন' উক্তিটির বিশ্লেষণ করো।

২. রাজু সাহেব একজন শিল্পপতি। তিনি তার প্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক লোকদের সাথে কিছুসংখ্যক অস্বাভাবিক লোকদের নিয়োগ দেন। যাকে দারোয়ান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তার স্বাস্থ্য খুবই দুর্বল। গেইটে বসে অনেক সময় ঘুমাতে থাকেন। ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করতে পারে না। ফলে তাকে সহকর্মীদের কাছ থেকে তিরস্কার পেতে হয়। টেলিফোন অপারেটর চন্দন চুপচাপ থাকেন; দেখলে মনে হয় খুবই চিন্তিত। জনগণ তার কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করলে একটির বেশি দুইটি কথা বলেন না। অন্যমনস্কভাবে থাকেন; ফলে জনগণ তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পায় না।

ক. পুরাতন নিয়মে কষ্টভোগকে কেমন দৃষ্টিতে দেখা হতো?

খ. সাধু-সাধ্বীগণ কেন দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করেছেন?

গ. দারোয়ানের মধ্যে কোন ধরনের কষ্ট বিদ্যমান– ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'কষ্ট সম্পর্কে যীশুর শিক্ষা চন্দনের মনোভাব পরিবর্তন করতে পারে' – মূল্যায়ন করো।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সহিংসতা ও শান্তি

বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, প্রায় সর্বত্র মানুষে মানুষে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হিংসা-বিদ্বেষ, দলাদলি, মারামারি, কাটাকাটি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি লেগেই আছে। কেউ যেন কাউকে সহ্য করতে পারছে না। কাকে ছোট করে কে বড় হবে, কে কাকে মেরে নিজের অবস্থান গড়বে এমনই প্রতিযোগিতায় যেন অগণিত মানুষ মেতে উঠেছে। আমাদের দেশের চিত্রও কম ভয়াবহ নয়। প্রতিদিনের খবরের কাগজ বা রেডিও-টেলিভিশনের খবর দেখে বা শুনে হত্যা, ভাঙচুর, ধ্বংস, জ্বালাও-পোড়াও-এর যে প্রতিহিংসামূলক চিত্র আমরা দেখতে পাই, তা উপলব্ধি করে সত্যি আমাদের মর্মাহত হতে হয়। এসবের ফলে আমাদের মনে নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। এ অবস্থা থেকে আমরা সবাই মুক্তি চাই। চাই একটু শান্তি বা একটু সান্ত্বনা।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- বিভিন্ন প্রকারের সহিংসতার বর্ণনা দিতে পারব;
- সহিংসতার কুফলসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- শান্তির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- শান্তি প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার্থীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব;
- সহিংসতা বর্জন করব এবং
- শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করব।

সহিংসতা

কাজঃ খবরের কাগজ থেকে সহিংসতার কিছু সমসাময়িক চিত্র উপস্থাপন করা হবে। তা দেখে নিম্নলিখিত প্রশ্নের আলোকে তোমরা বিশ্লেষণ করবে।

ক. চিত্রগুলোতে কী দেখতে পাচ্ছ?

খ. তা দেখার পর তোমার প্রতিক্রিয়া কেমন হচ্ছে?

গ. সহিংসতা কি সমস্ত সমস্যার সমাধান দিতে পারে?

ঘ. এ পরিপ্রেক্ষিতে কার কী করণীয় লিপিবদ্ধ করো।

সহিংসতা বিষয়টি অনেক ভয়াবহ। প্রগতিশীল ও কল্যাণকামী পৃথিবীর বিপরীত হলো সহিংসতা। এটি হচ্ছে ভালোবাসার বিকৃতরূপ। সাধারণভাবে যা-কিছু বৈধ নয় বা বৈধভাবে করা হয় না, তাকেই সহিংসতা বলা হয়। বলপূর্বক, শক্তি বা ক্ষমতা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে জানমালের ক্ষতি সাধন করাই হলো সহিংসতা। সহিংসতা হলো বর্বরতামূলক কোন কাজ যেখানে জড়িত থাকে অমানবিকতা, অনৈতিকতা,

ঘৃণা, ছলচাতুরি, ভণ্ডামি, অসাধুতা, অন্যায় বিচার ইত্যাদি। সংক্ষেপে বলা যায়, প্রকৃত মানবিকতার অপমৃত্যু বা বিবেক-দংশিত রূপই হলো সহিংসতা।

ধ্বংস করা বা ধ্বংসের মধ্য দিয়ে আনন্দ পাওয়া অনেক মানুষের অভ্যাস। প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে মানুষ যে দমন বা নিপীড়নের পথ বেছে নেয় তা-ই সহিংসতা। এর ফলে মানুষ তার মনুষ্যত্ববোধ বিসর্জন দিয়ে অবৈধ বা আইনবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কোন পরিবার, সমাজ, জাতি, দেশ যখন দুর্নীতির চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যায় অর্থাৎ হানাহানি, মারামারি, অরাজকতায় পর্যবসিত হয়, তখন সেখানে বিরাজ করে সহিংসতা। বর্তমানে ধৈর্য ও সহনশীলতার অভাবে মানুষের মাঝে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হচ্ছে তা-ই সহিংসতার রূপ নিচ্ছে। ব্যক্তি, সমাজ তথা দেশের ক্ষতি সাধন করে সহিংসতা। সহিংসতা কখনো কোনো দেশ, কাল, সমাজ বা ব্যক্তিজীবনে কাম্য নয়।

আধ্যাত্মিক অর্থে সহিংসতা হলো ভালোবাসার মৃত্যু। কেননা যখনই ভালোবাসার মৃত্যু হয় তখন অমানবিক স্বভাব মানুষকে প্রভাবিত করে। তখন মানুষ সৃষ্টিকর্তার সেই সৃষ্টিশীল রূপকে ঘৃণা করে, অমানবিক রূপটি উন্মোচিত হয়। আর এই অমানবিক স্বভাবের প্রভাবে বিপদগ্রস্ত হয় সমগ্র জাতিসত্তা।

তবে সহিংসতা শুধু শারীরিকভাবে নির্যাতনকে বোঝায় না। অন্যকে হুমকি দেওয়া, ব্ল্যাকমেইল করা, অন্যের অধিকার অস্বীকার করা ইত্যাদি সব এই সহিংসতার মধ্যে পড়ে। শারীরিক আঘাত বা শাস্তি মানুষকে মানবিক মর্যাদা দেওয়া থেকে বঞ্চিত করে। তা আমাদের অনেক ক্ষেত্রে হীনম্মন্য করে তোলে।

কাজঃ বাস্তব জীবনে কোথায় কোথায় সহিংসতা ঘটতে দেখা যায়, নিচে সেগুলোর কারণ ও প্রভাব লেখ।

সহিংসতা	কারণ	প্রভাব

সহিংসতার কুফল

বিশ্বের সর্বত্রই আজ সহিংসতা বিরাজ করছে। সহিংস ব্যক্তিরা সবাই জানে যে, সহিংসতার মধ্য দিয়ে কেউ কখনো জগতের উন্নতি সাধন করতে পারেনি। বরং সহিংসতা দ্বারা মানসিক, আধ্যাত্মিক ও শারীরিক নানাবিধ ক্ষতিকর প্রভার বিস্তৃত হয়। এটা অনেকটা সংক্রামক ব্যাধির মতো। এটা যদি কখনো কোনো পরিবার, সমাজ বা দেশে বাসা বাঁধতে শুরু করে, তবে তা অচিরেই সংক্রমিত হয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে এর প্রসার ঘটতে থাকে ও শক্তি বৃদ্ধি হয়। এর ফলে পরিবার, সমাজ বা দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভয়াবহ প্রভাব পড়ে। সহিংসতার কুফলগুলোকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে এর একটা স্পষ্ট চিত্র আমাদের কাছে ধরা পড়বে এবং এর ভয়াবহ পরিণতি বুঝতে সুবিধা হবে।

কাজঃ প্রামাণ্য চিত্র বা খবরের কাগজ থেকে বিভিন্ন ছবির ওপর আলোচনা করবে। এর মাধ্যমে সহিংসতা ও এর বিভিন্ন কুফল বর্ণনা করবে।

পরিবারের ওপর সহিংসতার ক্ষতিকর প্রভাব

পরিবার হলো সমাজের মৌলিক উপাদান। এই পরিবার থেকেই মানব জীবনের যাত্রা শুরু। আর সহিংসতার কারণে পরিবার নামক ক্ষেত্রটি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে দেখা যায় পরিবারে একে অপরের প্রতি সন্দেহ, সম্পর্কের ফাটল এবং এরকম আরও অনেক অপ্রীতিকর পরিস্থিতি। এর পরিণতি গিয়ে দাঁড়ায় ঝগড়া, মারামারি, হানাহানি ইত্যাদিতে। অনেক সময় জীবনও দিতে হচ্ছে অনেককে।

সমাজের ওপর সহিংসতার ক্ষতিকর প্রভাব

সহিংসতার ফলে পরিবারের ক্ষতিকর দিকগুলোর প্রভাব গিয়ে পড়ে সমাজের ওপর। ফলে দেখা যায় সমাজের মধ্যে যে একতা বা সম্পৃক্ততা থাকার কথা তার অবক্ষয় ঘটে। ছোট ছোট সমাজেও দলাদলি শুরু হয়। তা থেকে নানারকম কোন্দল সৃষ্টি হয়। ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে। এর ফলে অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়, যা সামাজিক উন্নয়ন ও গতিশীলতার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

রাষ্ট্রের ওপর সহিংসতার ক্ষতিকর প্রভাব

পরিবার ও সমাজের ক্ষতিকর প্রভাবগুলোর রেশ গিয়ে পড়ে দেশ বা রাষ্ট্রের ওপর। সহিংসতা যখন দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তখন দেশের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে; দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়; দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাধার সম্মুখীন হয়। ফলে দেখা যায় মিটিং, মিছিল, ভাঙচুর, জ্বালাও-পোড়াও, বোমাবাজি, নিখোঁজ ও গুম হওয়া, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ, খুন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দেশের শান্তি বিনষ্ট হয় ও কোটি কোটি টাকার সম্পদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

সহিংসতা বনাম ভালোবাসা

সহিংসতার বিপরীত দিক হলো অহিংসা অর্থাৎ ভালোবাসা। যদি আমরা অহিংসায় বিশ্বাস করি তাহলে আমরা আমাদের শত্রুকে ভালোবাসব। তখন একই নীতি আমরা সবার ওপর প্রয়োগ করব। যারা আমার বন্ধু তাদের প্রতি যেমন, তেমনি যারা আমার শত্রু তাদের প্রতিও তেমনি ব্যবহার করব। এই কারণে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন, তোমরা তোমাদের শত্রুকেও ভালোবাসবে। একথা তিনি শুধু মুখেই বলেননি, তাঁর আপন জীবনে শত্রুদের প্রতি ভালোবাসা দেখিয়েছেন। গেৎসিমানি বাগানে যখন শত্রুরা বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাঁকে ধরতে এল তখন পিতর তরবারি দিয়ে একজন সৈনিকের কান কেটে ফেলেছিলেন। সেই মুহূর্তে যীশু বলেছেন, যে অস্ত্র ব্যবহার করে অস্ত্রের আঘাতেই তার বিনাশ ঘটে। কথায় বলে 'সহিংসতা সহিংসতার জন্ম দেয়'। এই কারণে তিনি ভালোবাসার কথা বলেছেন। কারণ সমস্ত দানের মধ্যে মহৎ দান হলো ভালোবাসা। এই ভালোবাসা মানুষকে সাহসী ও উদ্যমী করে তোলে। এই ভালোবাসা সমস্ত কিছুকে জয় করতে সাহায্য করে। একমাত্র ভালোবাসাই সহিংসতাকে দূর করতে পারে এবং সহিংসতার কুফল থেকে পরিবার, সমাজ বা দেশকে রক্ষা করতে পারে।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার্থীর ভূমিকা

শান্তি সবাই চায়! সমাজের সর্বস্তরের মানুষ শান্তি চায়। আমরাও সকলে নিশ্চয়ই শান্তি চাই বা শান্তিতে জীবন যাপন করতে চাই। একটু শান্তির পরশ পাওয়ার জন্য মানুষ কত কী-না করে। সমাজ ও দেশের কিছু সংখ্যক মানুষের ওপর কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করা হয়ে থাকে। যেমন, শিক্ষাকাজে

নিয়োজিত শিক্ষক, দেশ রক্ষার কাজে নিয়োজিত সেনাবাহিনী, পুলিশ, বেসরকারি কর্মকর্তা ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তারা শান্তির জন্য কাজ করে থাকেন। পৃথিবীতে আবার এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যারা শান্তির জন্য তাদের নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিচ্ছেন। পোপ দ্বিতীয় জন পল সহিংসতা বন্ধের জন্য জোরালো আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বশান্তি দিবসের মূলভাব হিসেবে 'সহিংসতা নয়, শান্তি চাই' স্লোগানের মধ্য দিয়ে সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন করেছিলেন।

শান্তি কী?

প্রথমত শান্তি হচ্ছে উৎকণ্ঠাহীনতা–একটা মানসিক প্রশান্তিপূর্ণ অবস্থা। সমাজের মানুষের মানসিক শান্তি চারিদিকে বিস্তৃত হয়। আবার শান্তি হচ্ছে এমন একটি পারিপার্শ্বিক অবস্থা, যেখানে সর্বদা বিরাজ করে একতা। অর্থাৎ বলা যায়, শান্তি হচ্ছে অরাজকতা, যুদ্ধ, হিংসা, ক্রোধ, কলহ, অপরাধবোধ ইত্যাদি না থাকার অনুভূতি। এসবের পরিবর্তে শান্তির অবস্থা হচ্ছে এমন অবস্থা যেখানে আছে একতা, গভীর নীরবতা যা মানুষকে তার প্রকৃত সত্তা বা অস্তিত্বকে বুঝতে বা জানতে শেখায়, নাগরিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে, সেবার মনোভাব গড়ে ওঠে, ন্যায়পরায়ণতা বিরাজ করে এবং বন্ধুত্বের মনোভাব গড়ে ওঠে। তাই বলা যায় শান্তি হচ্ছে মনুষ্যত্ব বিকাশের একটি উত্তম বা সর্বোকৃষ্ট মাধ্যম।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হলেন শান্তিরাজ। তিনি এই জগতে মানুষের মাঝে শান্তি দিতে এসেছেন। তাই তো তিনি তাঁর পুনরুত্থানের পর 'তোমাদের শান্তি হোক' বলে শিষ্যদের ওপর তাঁর শান্তি ছড়িয়ে দিয়েছেন। খ্রীষ্টের দেখানো পথে চলে ও তাঁর দেওয়া শান্তি গ্রহণ করে আমরা শান্তির মানুষ হয়ে উঠতে পারি।

বর্তমানে শান্তি প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার্থীদের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের এটা এমন একটা সময় যে, এ সময় সে তার জীবনে ভবিষ্যৎ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ঠিক করে এবং জীবনকে সুন্দর দিক নির্দেশনা দানের মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। এই বয়সের শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা ধরনের বাধা ও প্রলোভন আসে যা তাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এর ফলে ব্যক্তির মনে আসতে পারে অশান্তি। শান্তি প্রতিষ্ঠায় যে বিষয়গুলো মূলত নির্ভর করে তা হচ্ছে ব্যক্তিগত মূল্যবোধ, সামাজিক মূল্যবোধ, এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ। তাই শিক্ষার্থী হিসেবে আমরা যদি নিজেদের মধ্যে প্রকৃত মূল্যবোধ গড়ে তুলতে পারি তবে পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি বিরাজ করবে। শান্তি প্রতিষ্ঠায় মূল্যবোধগুলোর পাশাপাশি নিম্নোক্ত বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ:

দুর্নীতি দমনে একত্রিত হওয়া: সারা বিশ্বে দুর্নীতি এখন চরমে পৌঁছেছে। প্রতিটি দেশে উন্নতি বা শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রধান অন্তরায় হচ্ছে দুর্নীতি। তাই দুর্নীতি দূর করার জন্য এসময় থেকেই শিক্ষার্থীরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে এ ব্যাধি দূর করা সম্ভব হবে এবং দেশ ও সমাজের মধ্যে শান্তি বিরাজ করবে। কারণ আজকের শিক্ষার্থীরাই হবে ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তাই আমরা জনসচেতনতামূলক সমাবেশ বা সভা-সেমিনার করে দুর্নীতি দমনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে চেষ্টা করব।

মাদক সেবন দূরীকরণ: এই সময় দেখা যায় অনেক শিক্ষার্থী বিভিন্ন ধরনের নেশায় আসক্ত হয়ে তাদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে ফেলে। কিন্তু এ সময়টি হলো নিজেকে গঠন করার, ভালো-মন্দ বোঝার এবং সেই অনুসারে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার। শিক্ষার্থীরাই পারে ব্যক্তিগতভাবে মাদক বা অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্যকে 'না' বলতে এবং অন্যকেও তা সেবনে নিরুৎসাহিত করতে।

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি: শিক্ষার্থীদের এই সময়টি হলো নিজের ব্যক্তিত্ব বিকশিত করার সময়। তাই সবকিছুর মধ্যে একটা ইতিবাচক মনোভাব থাকা দরকার। মূলত তাদের এই নীতির বিরুদ্ধে না গিয়ে বরং যা ভালো তা গ্রহণ করা ও সেই অনুসারে জীবনযাপন করাই শ্রেয়।

সৃজনশীলতা: এই সময়টিতে শিক্ষার্থীরা পারে অসম্ভবকে সম্ভব করতে, অজানাকে জানার কৌতূহল সৃষ্টি করতে এবং নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবন করতে। তাই এটাই সৃজনশীলতা প্রকাশের প্রকৃত সময়।

সময়ানুবর্তিতা: শান্তি প্রতিষ্ঠায় সময়ানুবর্তিতার গুরুত্ব অনেক বেশি। এই সময় যদি তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয় তবে ভবিষৎ জীবনকে তারা সঠিক ও সুন্দরভাবে গোছাতে পারবে। এর ফলশ্রুতিতে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা দেখা দেবে।

আত্মবিশ্বাস: আত্মবিশ্বাসের অর্থ হচ্ছে নিজেকে ও নিজের সামর্থ্যকে বিশ্বাস করা। মানব চরিত্র সমৃদ্ধ-করণে এর অবদান অতুলনীয়। নিজের প্রতি যে যেমন আত্মবিশ্বাসী হয়, অন্যের প্রতিও তার ঠিক তেমনি হওয়া উচিত। তাই এই সময়টি আত্মবিশ্বাস সৃষ্টির উত্তম সময়।

ন্যায্যতা: যার যা পাওনা তাকে তা দান করাই হচ্ছে ন্যায্যতা। ন্যায্যতা মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করে। তাই ন্যায্যতা শিক্ষার মধ্য দিয়ে এ সময় শিক্ষার্থীরা ন্যায্যতার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হলে শান্তি আসবে।

বন্ধুত্ব: বন্ধুত্ব হচ্ছে দুইজন ব্যক্তির ভালোবাসাপূর্ণ অঙ্গীকার বা গৃহীত দায়িত্ব। এটি পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্নেহ-ভালোবাসার ওপর নির্ভরশীল। বন্ধুত্ব আমাদের একতা সৃষ্টিতে সহায়তা করে যা শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায়।

আলোচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে এক একটি গুণ যা শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যম। এ মাধ্যমগুলো অনুশীলন ও চর্চার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা শান্তি প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। শান্তি হচ্ছে সকল সুখের মূল। আর এই শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের সকলেরই এগিয়ে আসা একান্ত কর্তব্য।

একক কাজ: শান্তি প্রতিষ্ঠায় তুমি তোমার পরিবার, পাড়া, বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থানে কী ভূমিকা রাখতে পার তার একটা তালিকা তৈরি করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সহিংসতার বিপরীত দিক কোন্‌টি ?

ক. প্রশংসা

খ. ভালোবাসা

গ. শান্তি

ঘ. ন্যায্যতা

২. শিক্ষার্থীরা শান্তি প্রতিষ্ঠায় কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে ?

ক. খেলাধুলার মাধ্যমে

খ. বই পড়ার মাধ্যমে

গ. ন্যায্যতার মাধ্যমে

ঘ. মিটিং মিছিল করে

নিচের চিত্রটি দেখে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

৩. উদ্দীপকের ছবির মাধ্যমে কী প্রকাশ পায় ?

ক. সহিংসতা

খ. সহনশীলতা

গ. অহিংসা

ঘ. অনুশাসন

৪. উদ্দীপকের কাজের প্রভাব–

i. মূল্যবোধের অবক্ষয় হবে

ii. দুর্নীতি বৃদ্ধি পাবে

iii. সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সহিংসতা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।
২. শান্তি বলতে কী বোঝায়?
৩. শান্তি প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার্থীর ভূমিকাগুলো লেখ।
৪. কীভাবে আমরা ভালোবাসার মাধ্যমে সহিংসতাকে দূর করতে পারি?
৫. সৃজনশীলতা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

ক. শান্তি কী?

খ. ন্যায্যতা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানে কী হবে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের তথ্য থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র অবলম্বন ভালোবাসা – মূল্যায়ন করো।

২. আনন্দপুর উচ্চ বিদ্যালয় একটি আদর্শ বিদ্যালয়। প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়টি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা এই বিদ্যালয়ে খুব বেশি লেখাপড়া করতে পারে। লেখাপড়ার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে তাদের। এছাড়াও বিদ্যালয়ের চারদিকে ফুল, ফল ও ঔষধি গাছ লাগিয়ে বিদ্যালয়ের পরিবেশকে মনোরম করেছে। তারা একে অন্যের সমস্যায় এগিয়ে যায় এবং দরিদ্রদেরও বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। শিক্ষকমণ্ডলীও শিক্ষার্থীদের ফলাফল ও ব্যবহারে খুবই আনন্দিত। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকেই যেন একই পরিবারে মিলেমিশে বাস করছে।

ক. আধ্যাত্মিক অর্থে সহিংসতা কী?

খ. ন্যায্যতা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের বিদ্যালয়টিতে কী বিরাজ করছে? বর্ণনা দাও।

ঘ. উদ্দীপকে এ ধরনের পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের ভূমিকা মূল্যায়ন করো।

চতুর্দশ অধ্যায়

পরিবর্তিত বিশ্ব চাই

বর্তমান জগতের বাস্তবতা দেখে আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে, সমাজ আজ অমানবিক কার্যকলাপে ভরপুর। মানুষের বিবেক যেন পরাধীন হয়ে গেছে। সেই কারণে অন্যায্য কার্যকলাপ করলেও মানুষের বিবেক বাধা দেয় না। ধর্মকর্মের চেয়ে খাওয়া-পরাই যেন মানুষের কাছে বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। আধ্যাত্মিকতার চেয়ে জাগতিকতার মোহে মানুষ বেশি আবিষ্ট হয়ে আছে। ফলে অরাজকতা, অন্যায্যতা, অশান্তি চারদিকে ছেয়ে আছে। আমরা এই পরিবর্তন করে সুস্থ ও সুন্দর বিশ্ব গড়তে চাই। আমরা আজ যারা শিক্ষার্থী, আমরা যদি পরিবর্তিত হই, তবেই বিশ্ব পরিবর্তিনের দিকে অগ্রসর হবে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- সমাজের অনাকাঙ্ক্ষিত অন্যায় কাঠামোর চিত্র বর্ণনা করতে পারব;
- সমাজ পরিবর্তনে সহিংস বিপ্লবের কুফল ব্যাখ্যা করতে পারব;
- সমাজ পরিবর্তনে খ্রিষ্টের দেখানো পথের ব্যাখ্যা দিতে পারব এবং
- সমাজ পরিবর্তনে সহিংসতা বর্জন করব ও খ্রিষ্টের দেখানো পথে চলব।

সামাজিক অন্যায়ের চিত্র

তিলক একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তার রুটিনমাফিক প্রাতঃভ্রমণে বের হয়েছেন। একটা বড় পাঁচ-তারা হোটেলের কাছে একটা ডাস্টবিন। সেখানে রাতের বেলায় হোটেলের উচ্ছিষ্ট কিছু খাবার ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছিল। একটা ময়লা ও তালি দেওয়া শাড়ি পরিহিতা একজন মা তার দুই বছরের শিশু পুত্রকে নিয়ে ঐ ডাস্টবিন থেকে খাবার নিয়ে একটু দূরে বসে খাচ্ছে। কাছেই একটা কুকুর এসে একই ডাস্টবিন থেকে খাবার খাচ্ছে। এত সকালে এমন একটা দৃশ্য দেখে তিলকের ভিতরে নাড়া দিয়ে উঠল।

কাজঃ কয়েকজন করে দলে গোল হয়ে বসো। উপরের অবস্থাটি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করোঃ

- ঘটনাটি শুনে তোমার কেমন লাগল?
- ঘটনাটির জন্য কে বা কারা দায়ী?
- এর মানবিক ও আবেগীয় দিকগুলো তুমি কীভাবে বর্ণনা করবে?
- তোমার অভিজ্ঞতা থেকে এরূপ আরো কোনো অমানবিক ঘটনা জানা থাকলে সহভাগিতা করতে পার। সবার অভিজ্ঞতা একের পর এক নিজেরাই বিশ্লেষণ করো। তোমাদের সহভাগিতা করা এসব অমানবিক ও অসামাজিক অবস্থাগুলোর কারণ কী কী হতে পারে বলে মনে করো? দলে বিভিন্ন ঘটনা বিশ্লেষণ করার পর সমাজ সম্পর্কে যেসব বিষয় বের হয়ে আসবে, সেগুলো পোস্টারে বা ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা হবে যেন সবাই দেখতে পায়।

বর্তমান সমাজের এই চিত্র ভয়ানক। সারা দেশেই আজ মানুষের মনে নানা রকম ভয়-ভীতি, কুসংস্কার, মাদকাসক্তি, বোমাবাজি, ভণ্ডামি, ঘৃণাবিদ্বেষ, চুরি-ডাকাতি, স্বার্থপরতা ইত্যাদি বিরাজমান।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'দুই বিঘা জমি' নামক একটি কবিতা লিখেছেন। তিনি সেখানে দেখিয়েছেন, কী করে এক রাজা তার গরিব প্রজার কাছ থেকে দুই বিঘা জমি দখল নিয়ে নিল। গরিব লোকটার দুর্দশার কথা রাজা চিন্তা করলেন না। কবিগুরু ঐ কবিতার এক জায়গায় বলেছেন:

"এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি,
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি"।

ভোগবাদী জগতে মানুষ ত্যাগে নয় বরং ভোগে বেশি সুখের অন্বেষণ করছে। যার প্রচুর আছে, সে আরও বেশি চায়। একটি অতৃপ্ত বাসনা মানুষকে তাড়া করে বেড়ায় আরও পাওয়ার জন্য। আর তাই একজন গরিব লোকের এক টুকরো সম্বল বিশাল রাজ্যের অধিকারী রাজার চোখ এড়াতে পারেনি। প্রায় নিঃস্ব লোকটির শেষ সম্বলটুকুও রাজার চাই।

আমাদের দেশে প্রচুর সম্পদ আছে। কিন্তু সম্পদের সমবণ্টন হচ্ছে না। সমাজের শতকরা ২০ ভাগ মানুষ আজ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করছে। আর ৮০% মানুষ ভোগ করছে মাত্র শতকরা ২০ ভাগ সম্পদ। আর শতকরা ২০ ভাগ মানুষ ভোগ করছে শতকরা ৮০ ভাগ সম্পদ। কেউ কেউ পাহাড়সম সম্পদ ভোগ করছে আর কেউ কেউ সর্বস্ব হারিয়ে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে রাস্তায় ভিক্ষা করছে। ধনী আরও ধনী হচ্ছে, গরিব আরও গরিব হচ্ছে। এভাবে দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার বৃদ্ধি পেয়েই চলছে। ধনীরা নিজেদেরকে সকল ক্ষেত্রে মহাশক্তিধর মনে করে। অর্থাৎ তারা মনে করে তারাই সকল ক্ষমতা ও সম্পদের অধিকারী। তারা বিলাসিতায় জীবনযাপন করে আর দরিদ্রদের অবহেলা করে। ফলে দরিদ্রতা প্রকট আকার ধারণ করছে।

মানুষ রাজা হওয়ার পিছনে বা ক্ষমতা লাভের জন্য ছুটছে। সবাই পাওয়ার অতৃপ্ত বাসনায় ছুটে চলছে অজানা পথে। এই ছুটতে গিয়ে ভুলে যাচ্ছে আপন ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীকে। হয়ে যাচ্ছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর। কেবল নিজের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির সন্ধান করছে। এতে অসৎ পথ বেছে নিতেও সে কুণ্ঠাবোধ করছে না। ফলে দেখা দিচ্ছে দ্বন্দ্ব, রেষারেষি, মারামারি, হানাহানি, রাহাজানি, ধর্ষণ ও খুন।

সামাজিক অবকাঠামোর মধ্যেও একটি বৈষম্য দৃশ্যমান। কেউ কেউ সকল সুবিধা ভোগ করছে, আবার কেউ কেউ বঞ্চিত হচ্ছে। শ্রেণিভেদ, গোত্রভেদ, বর্ণবাদ ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিন্নতা মানুষের মাঝে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে যা অনেক সময় যুদ্ধে পরিণত হয়। সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করছে। সমাজের সকল ক্ষেত্র দুর্নীতিতে ছেয়ে যাচ্ছে।

চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাসী, যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ ও বোমাবাজি সারা বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি। রাতে নারী, শিশু বা অন্য একাকী কেউ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে না। রাস্তাঘাটে কেউ নিরাপদ নয়। যেকোনো সময় ছিনতাই হতে পারে টাকা-পয়সা, মোবাইল ফোন কিংবা হাতের ব্যাগ। এমনকি গুম হয়ে যেতে পারে যেকোনো মানুষ। বখাটেরা ভয়ঙ্কর ব্যক্তি। তাদের দ্বারা মহিলা ও যুবতী মেয়েরা নিগৃহীত ও ইভটিজিং-এর শিকার হচ্ছে।

সম্পত্তির উত্তরাধিকার সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করছে। সামান্য ব্যাপারে মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে যাচ্ছে পরিবারের লোকজন। ভাড়াটে মাস্তান লেলিয়ে দিচ্ছে আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে। এসিডে দগ্ধ হচ্ছে মেয়েরা। কেউ কেউ ধর্ষিত হচ্ছে স্বামী বা পিতার সামনেই। প্রেমিকের হাতে টুকরো টুকরো হচ্ছে প্রেমিকার দেহ। ঘরবাড়ি, জায়গা-জমি তো আজ একটি বড় সমস্যা ও নিত্যদিনের প্রধান আলোচনার বিষয়।

কাজঃ সমাজের বিভিন্ন অন্যায্যতার তালিকা, এগুলোর কারণ ও বিভিন্ন কুফল পোস্টার পেপারের মাধ্যমে উপস্থাপন করো।

সহিংস বিপ্লবের কুফল

একবার একজন হিন্দু ভদ্রলোক মহাত্মা গান্ধীর কাছে এসে বললেন যে, তিনি নরকে যাচ্ছেন। গান্ধীজি জিজ্ঞেস করলেন, কেন? লোকটি বললেন, ব্রিটিশরা ভারত থেকে চলে যাবার পর যে হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ শুরু হয়েছে, সে যুদ্ধে একজন মুসলিম একজন হিন্দুর পুত্র সন্তানকে হত্যা করেছে। হিন্দু লোকটি কষ্টে ও রাগে সেই মুসলিম লোকটির পুত্র সন্তানকেও পাথরে আঘাত করে হত্যা করেছেন। একথা শুনে গান্ধীজী বলেছেন, তুমি যাও, এই যুদ্ধে মা-বাবা হারিয়েছে এমন একজন মুসলিম ছেলেকে খুঁজে নিজের ঘরে লালনপালন করো এবং তাকে মুসলিম হিসেবেই বড় হতে সাহায্য করো। এই অহিংস পরামর্শ শুনে যে লোকটি অস্থিরতা নিয়ে গান্ধীজির কাছে এসেছিল, সে শান্তিপূর্ণ মন নিয়ে বাড়ি চলে গেল।

সমাজ থেকে অন্যায্যতা, দুর্নীতি, সন্ত্রাস দূর করার জন্য এবং সমাজে শান্তি স্থাপনের জন্য অনেকেই ভিন্ন ভিন্নভাবে কাজ করেছেন। কেউ শান্তিপূর্ণভাবে আর কেউ বা সহিংস বিপ্লবের মাধ্যমে। ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনার উদাহরণ রয়েছে। আমরা হয়তো ফরাসি বিপ্লবের কথা ইতিহাসে পড়েছি। এটি ঘটেছিল ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে। অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য, ধনীদের অত্যাচার থেকে দরিদ্রদের রক্ষার জন্য, ধর্মীয় অনুশাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য ঐ সময় ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটেছিল। তাছাড়া, সারা ইউরোপ-আমেরিকায়ও ঐ ধরনের বিপ্লব শুরু হয়েছিল। এতে যেমন অনেক সুফল ছিল, তেমনি অনেক কুফলও ছিল। অনেক মানুষ এতে প্রাণ হারিয়েছে। এসব বিপ্লব ধীরে ধীরে জাতিকে বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। ফলে পৃথিবীতে পর পর দুইটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। আমরা নিশ্চয়ই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ঘটে যাওয়া জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকির ঘটনার কথা শুনেছি। আমরা জানি সেখানে কীভাবে পারমাণবিক বোমায় দুইটি শহর ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, আর কত মানুষ জীবন্ত দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

দাসত্ব থেকে মুক্তি, শ্রেণিভেদ দূর করা, জাতিগত দ্বন্দ্ব ও দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য জাতিতে জাতিতে দেশে দেশে এরূপ কত যে বিপ্লব ও যুদ্ধ হয়েছে তার হিসেবে নেই। প্রতিনিয়ত এক দেশ অন্য দেশের সাথে, এক জাতি অন্য জাতির সাথে এমনকি এক ধর্ম অন্য ধর্মের সাথে যুদ্ধ করছে।

চীন, ভিয়েতনাম, যুগোস্লাভিয়া, আফ্রিকা, লিবিয়া, মিশর, মধ্যপ্রাচ্য, আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক ও কুয়েতের ভয়াবহ যুদ্ধের কথা নিশ্চয় আমাদের মনে আছে। দক্ষিণ আমেরিকা ও পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে দরিদ্রতা, ধর্মান্ধতা, অন্ধবিশ্বাস, প্রাচীন পদ্ধতির রাজনীতি এবং মানবমুক্তির জন্য বিভিন্ন বিপ্লব ঘটেছে।

এসব যুদ্ধ-বিপ্লবে কত মানুষ যে প্রাণ হারিয়েছে তার হিসেব নেই, কত সম্পদ যে বিনষ্ট হয়েছে তার পরিমাপ করা যাবে না। তাছাড়া ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব হবে না। এসব যুদ্ধে সুফলের চাইতে কুফলই এসেছে বেশি। কারণ আমরা জানি, সহিংসতা দিয়ে কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

মহাত্মা গান্ধী ভারত উপমহাদেশে উজ্জ্বল এক উদাহরণ। তিনি অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে রক্তপাত ছাড়া ভারতবর্ষকে ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন। তিনি যুদ্ধ নয়, অহিংসা দিয়ে শুধু দেশই জয় করেননি; বরং মানুষের হৃদয়কে জয় করেছেন। আজ তিনি চির অমর হয়ে আছেন।

কাজ : রাজাবলির প্রথম গ্রন্থে উল্লিখিত নাবোথের আঙুর ক্ষেতের কাহিনিটি (১ রাজাবলি ২১তম অধ্যায়) অভিনয়ের মাধ্যমে দেখাও।

সমাজ পরিবর্তনে খ্রীষ্টের পথ

"তোমরা শুনেছ, প্রাচীনকালের মানুষদের এই কথা বলা হয়েছিল: তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসবে আর তোমার শত্রুকে ঘৃণা করবে! কিন্তু আমি তোমাদের বলছি: তোমরা তোমাদের শত্রুদেরও ভালোবাস।" প্রাচীনকালের প্রবর্তিত এই নিয়মটি হয়তো অপরাধকে দমিয়ে রাখার জন্য করা হয়েছিল। কারণ তখনকার সমাজে অনেক অনাচার, অত্যাচার ও অবিচার বিরাজ করছিল।

নাবোথের আঙুর খেতের কাহিনিটি অভিনয় করে আমরা সামাজিক অন্যায্যতা সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করেছি। এই সমস্ত অনাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্য তখন কঠিন কঠিন নিয়ম জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হতো। তার মধ্যে একটি নিয়ম ছিল কেউ একজনের ক্ষতি করলে তার সেই শত্রুর সমপরিমাণ ক্ষতি করে প্রতিশোধ নেওয়া। উদাহরণস্বরূপ, কেউ ঝগড়া করে একজনের একটা দাঁত ভেঙে ফেললে, বিচারে সে-ও তার শত্রুর একটা দাঁত ভেঙে দিতে পারত। এই নিয়ম তখন করা হয়েছিল এজন্য যে, নিজের সমপরিমাণ ক্ষতি করা হবে, এই ভয়ে যেন মানুষ অন্যের ক্ষতি না করে। এই নিয়ম থাকা সত্ত্বেও অপরাধ, অসামাজিকতা, অন্যায্যতা সমাজ থেকে দূর করা সম্ভব হয়নি।

প্রাচীনকালের এইসব নিয়মের মধ্যে ক্ষমা ও ভালোবাসার কথা বলা হয়নি। বরং শত্রুতা বৃদ্ধি পেয়েছে, শত্রুর ক্ষতি করা হয়েছে এবং শত্রু-মিত্রের দ্বন্দ্ব সমাজে যুগ যুগ ধরে স্থায়ী হয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র আমাদের মুক্তিদাতা প্রভু যীশুখ্রিষ্ট এ জগতে আসেন। তিনি পুরাতন সব নিয়ম বাতিল বা পরিবর্তন করতে আসেননি, বরং সেগুলোর পূর্ণতা দিতে এসেছেন। পূর্ণতার জন্য তিনি সর্বপ্রথমে মন পরিবর্তনের আহ্বান জানান, "তোমরা পাপ থেকে মন ফেরাও আর মঙ্গলসমাচারে বিশ্বাস করো।"

মন পরিবর্তনের এই বিপ্লব তিনি হঠাৎ করে শুরু করেননি। কেননা, কেউ হঠাৎ করে কোনো কিছু শুরু করলে সমাজে তার প্রতিক্রিয়া হয়। অনেক সময় তা গ্রহণযোগ্যতা হারায়। বিপ্লবকারী বা আন্দোলনকারীর পরিচয় নিয়ে তখন প্রশ্ন ওঠে। তাই যীশু তাঁর প্রচারকাজ শুরু করার পূর্বে ৪০ দিন নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। পর্বতের উপর নির্জনে, একাকী তিনি দিনরাত প্রার্থনা করেছেন। ধ্যান-প্রার্থনা, উপবাস ও ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে

নিজেকে প্রস্তুত করে তুলেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি পাপী না হয়েও ৪০ দিন পর মরুপ্রান্তরে যাওয়ার পূর্বে তিনি দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেছেন। জনসম্মুখে তাঁর শুচিতা ও পবিত্রতাকে প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বর হয়েও তিনি নিজেকে নম্র করেছেন যেন তিনি সবাইকে নম্রতা ও পবিত্রতার পথে আহ্বান করতে পারেন।

তিনি মন্দিরে গিয়ে সেই শাস্ত্রাংশটি পাঠ করেছেন, যেখানে তার নিজের সম্বন্ধে বলা আছে (লুক ৪:১৮-১৯)। তিনি এসেছেন বন্দির কাছে মুক্তি আর অন্ধের দৃষ্টি খুলে দেওয়ার জন্য। তাঁর এ কথা সত্য হয়েছে তখনই যখন লোকেরা তাঁর মুখ থেকে তা শুনতে পেয়েছে (লুক ৪:২১)। এভাবে তাঁর নিজের পরিচয় মানুষের কাছে তুলে ধরে তিনি তাঁর মুক্তির কাজ শুরু করেছেন। যারা দরিদ্র, অভাবী, অত্যাচারিত, অবহেলিত, সমাজের চোখে ঘৃণিত, অবাঞ্ছিত তাদেরকে রক্ষা করতেই তিনি এসেছেন।

ইহুদি সমাজে যেসব নিয়মের বাড়াবাড়ি ছিল যীশু তা চ্যালেঞ্জ করেছেন। যেসব অনাচার, অত্যাচার, অবিচার ছিল তিনি তার প্রতিবাদ করেছেন। মন্দির থেকে তিনি ব্যবসায়ীদের তাড়িয়ে দিয়েছেন। ধর্ম ব্যবসায়ীদের তিনি ধিক্কার দিয়েছেন। আর শিষ্যদের শিখিয়েছেন তারা যেন খ্রীষ্টের উপস্থিতিতে শান্তি ও মুক্তির আস্বাদ লাভ করে। কারণ তাঁর আগমন মুক্তির ও পরিত্রাণের জন্য। যারা বিশ্বাস করবে তারা মুক্তিলাভ করবে ও অনন্তকাল বেঁচে থাকবে।

তিনি দরিদ্রদের 'ধন্য' বলে সম্বোধন করেছেন, কারণ 'স্বর্গরাজ্য' তাদেরই। তিনি এসেছেন স্বর্গরাজ্যের পথ দেখাতে। দরিদ্ররাই সে পথে সবার পূর্বে যেতে পারবে। তিনি বলেছেন, ধনীর পক্ষে স্বর্গে যাবার চেয়ে বরং সূচের ছিদ্র দিয়ে একটি উটের যাওয়া সহজ। তিনি আরও বলেছেন, সুস্থ-সবল যারা তাদের চিকিৎসকের প্রয়োজন নেই। দরকার শুধু তাদেরই যারা ব্যাধিগ্রস্ত। একদিকে তিনি দরিদ্রদের বন্ধু হয়েছেন অন্যদিকে যত অসুস্থ, বিকলাঙ্গ, ব্যাধিগ্রস্ত ও অপদূতে পাওয়া ব্যক্তিদের তিনি কাছে টেনে নিয়েছেন।

যীশু বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে ঐশরাজ্যের বাণী প্রচার করতেন। তিনি দরিদ্র ও পাপীদের বাড়িতে যেতেন এমনকি তাদের সাথে খাওয়া-দাওয়াও করতেন। তাদেরকে তিনি বন্ধু হিসেবে দেখতেন। তিনি বলতেন, "বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালোবাসা মানুষের আর নেই।" তোমরা আমার বন্ধু, অবশ্য আমি তোমাদের যা করতে বলছি যদি তা-ই করো। আমি তোমাদের আর দাস বলছি না, কারণ প্রভু যে কী করছেন, দাসের তো তা জানার কথা নয়। তোমাদের আমি এই জন্যেই বন্ধু বলছি যে, আমার পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি, সবই তোমাদের জানিয়েছি।" (যোহন ১৫:১৩-১৫)। যীশু শুধু মুখেই এই শিক্ষা দেননি বরং নিজের জীবন দিয়ে তা বাস্তব করে তুলেছেন। ক্রুশের উপর নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে তিনি আমাদের প্রতি তাঁর চরম ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন।

যীশু শুধু ধনী-দরিদ্রের সম্পর্ক উন্নয়নের কথাই বলেননি; বরং প্রতিটি মানুষকে মানুষ হিসেবে মূল্য ও গুরুত্ব দিতে আহ্বান করেছেন। আমাদের প্রতি যীশুর আহ্বান "আমি যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি, তেমনি তোমরাও পরস্পরকে ভালোবাস।" তিনি সেবা পেতে আসেননি বরং সেবা করতে এসেছেন। তিনি বলেছেন, বড় হতে হলে সকলের দাস হতে হবে, প্রধান হতে হলে সকলের সেবক হতে হবে (লুক ২২:২৬)। সামনের সম্মানিত আসনে বসতে চাইলে আগে পিছনের সারিতে বসতে হবে। এসব কথা বলার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের আহ্বান করেছেন যেন আমরা নিজেদের বড় মনে না করি। নিজেদেরকে অন্যদের চাইতে বেশি গুরুত্ব না দেই। সর্বক্ষেত্রে নিজেদেরকে যেন প্রধান না ভাবি। বরং অন্যকে যেন আগে

সুযোগ দিই, অন্যের জন্য চিন্তা করি, অন্যের সেবা করি, অন্যের সামনে নিজেদেরকে বিনীত করি। তিনি তো ঈশ্বর ছিলেন। তাঁর সেই ঈশ্বরত্বকে তিনি ধরে রাখেননি বরং তিনি নমিত হলেন, মানুষের মাঝে বাস করতে আসলেন। তাঁর নম্রতার চরম প্রকাশ তিনি করেছেন কোনো প্রতিবাদ না করে ক্রুশের উপর থেকে শত্রুকে ক্ষমা করে দিয়ে।

যীশু বিবেক ও মূল্যবোধের শিক্ষা দিয়েছেন, যার মধ্য দিয়ে তিনি নতুন পৃথিবী গড়ার আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর আন্দোলন ছিল অন্য সকল আন্দোলনের চেয়ে ভিন্ন। তাঁর কথা, কাজ ও শিক্ষায় গোটা পৃথিবীটাই যেন বদলে গিয়েছে, পরিবর্তিত হয়েছে, নতুন হয়ে উঠেছে। কারণ তাঁর আন্দোলন ছিল সত্য, সুন্দর, ক্ষমা, সেবা ও ভালোবাসার আন্দোলন। তাঁর এই আন্দোলনে তিনি যুদ্ধ করে জয়ী হননি, বরং মানুষ ও জগতের জন্য পিতার ভালোবাসা প্রকাশের উদ্দেশ্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করে জয়ী হয়েছেন। তিনি আমাদের আত্মত্যাগের পথ দেখিয়ে গেছেন।

প্রভু যীশু চেয়েছেন যেন আমরা তাঁর দেখানো পথে চলি। আর তাঁর দেখানো পথ হলো বিশ্বাস, দরিদ্রতা, ভালোবাসা, ক্ষমা, বন্ধুত্ব, নম্রতা, সেবা, পবিত্রতা এবং সর্বোপরি আত্মত্যাগের পথ। তিনি বলেছেন, স্বর্গরাজ্যের জন্য যে নিজের জীবন হারাবে সে তার শতগুণ ফিরে পাবে। তিনি শুধু মন নয় বরং আমাদের হৃদয় পরিবর্তনের আহ্বান জানান। এরজন্য দরকার আত্মত্যাগ, সংলাপ, পুনর্মিলন, একতা ও ভালোবাসা। প্রতিজন খ্রীষ্টানের দায়িত্ব খ্রীষ্টের দেখানো পথে চলা। একই সাথে খ্রীষ্টের সৎ ও সাহসী সৈনিক হিসেবে অসামাজিকতা দূর করা এবং ন্যায্যতা ও শান্তি স্থাপনে কাজ করা। তবেই সত্য, সুন্দর, শৃঙ্খল ও মনোরম বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

কাজঃ ১. 'যীজাস ক্রাইস্ট সুপার স্টার' সিনেমাটি ক্লাসে দেখানো যায় যেখানে যীশুকে দেখা যাবে অভাবী ও অত্যাচারিত দরিদ্রদের মাঝে।

কাজঃ ২. খ্রীষ্টের শিক্ষা অনুসরণ করে কী কী উপায়ে পরিবর্তিত বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়? তার তালিকা প্রস্তুত করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. যীশু দরিদ্রদের কী বলে সম্বোধন করেছেন?

ক. দয়ালু

খ. দীন

গ. পীড়িত

ঘ. ধন্য

২. কেন যীশুখ্রীষ্টের জন্ম হয়েছিল?

ক. পুরাতন নিয়ম বাতিল করতে

খ. পুরাতন নিয়ম পরিবর্তন করতে

গ. পুরাতন নিয়মের পূর্ণতা দিতে

ঘ. ঈশ্বরের গৌরব করতে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি মি. জেমস এলাকার উন্নয়নে সর্বদা সচেষ্ট। এলাকার দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত পরিবারের লোকদের সব সময় খোঁজ খবর নেন, তাদের সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে যান। গত বছর বড়দিন পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান সবাই তাকে প্রথমেই খাবার খেয়ে নিতে বলল। কিন্তু তিনি প্রথমে খাবার না খেয়ে সবাই ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করল কি না তা লক্ষ করলেন। সবাইকে খাইয়ে তারপর তিনি খেলেন।

৩. মি. জেমস এর মধ্যে কেমন মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে–

i. বিনয়ী

ii. নম্র

iii. আত্মত্যাগের

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. মি. জেমসের এরূপ আচরণের ফলাফল কী হতে পারে–

ক. শান্তি স্থাপন খ. গর্ববোধ

গ. ক্ষমতা লাভ ঘ. আত্মঅহংকার

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সমাজে প্রচলিত ৩টি অন্যায্যতা উল্লেখ করে তার কুফল লেখ।

২. সমাজ পরিবর্তনে সহিংস বিপ্লবের কুফল ব্যাখ্যা করো।

৩. সমাজ পরিবর্তনে খ্রিষ্টের দেখানো পথ এক–ব্যাখ্যা করো।

৪. খ্রীষ্টের শিক্ষা অনুসরণ করে কীভাবে পরিবর্তিত বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়?

৫. মহাত্মা গান্ধী অহিংসা দিয়ে শুধু দেশই জয় করেননি মানুষের হৃদয়কেও জয় করেছেন–কথাটি বুঝিয়ে লেখো।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জীবন ও সুজন একই শ্রেণিতে পড়ে। কিন্তু একে অন্যের সাথে কথা বলে না, একসাথে বসে না, কেউ কাউকে কোনো কাজে সাহায্য সহযোগিতা করে না। একদিন সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে দুইজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এক পর্যায়ে মারামারির পর্যায়ে চলে গেল। কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন সুজন খবর পেল জীবন দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তখন সুজন জীবনকে দেখতে হাসপাতালে ছুটে গেল। জীবন সুজনকে দেখে খুব খুশি হলো।

ক. যীশু ক্রুশের উপর জীবন বিসর্জন দিয়ে মানুষের প্রতি কী প্রকাশ করেছেন?

খ. প্রাচীনকালে অন্যায্যতাকে সমাজ থেকে দূর করা সম্ভব হয়নি কেন?

গ. যীশুর কোন শিক্ষা সুজনকে প্রভাবিত করেছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সুজনের কর্মকাণ্ড সমাজে কী ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে? মূল্যায়ন করো।

২. শতাব্দী হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করে। প্রতিদিন সকালে সে গির্জায় যায়, হোস্টেলের নিয়মকানুন মনে চলে। একদিন সকালে গির্জায় যাবার সময় সে দেখতে পেল হোস্টেলের যে দিদি রান্না করে তার প্রচণ্ড জ্বর। তখন সে তার কাছে গিয়ে তাকে ঔষধ খাওয়ালো, মাথা ধুয়ে দিলো। ধীরে ধীরে সে সুস্থ হয়ে উঠল।

ক. যীশু বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে কী প্রচার করতেন?

খ. সহিংসতার কুফল সম্পর্কে লেখা।

গ. শতাব্দীর মধ্যে সমাজ পরিবর্তনে খ্রিষ্টের দেখানো কোন দিকটির প্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. শতাব্দীর আচরণে প্রকাশ পেয়েছে যীশুর পথ অনুসরণ–কথাটি বিশ্লেষণ করো।

পঞ্চদশ অধ্যায়

আমাদের মুক্তির পথ

প্রতিটি মানুষের জীবনে কিছু নির্ধারিত লক্ষ্য থাকে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তারা জীবন পথে এগিয়ে চলে। অনেকে লক্ষ্যচ্যুত বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও বেশিরভাগ মানুষই লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়। যারা লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না তাদের জীবন অর্থহীন হয়ে যায় কিন্তু যারা লক্ষ্যের সন্ধান পেতে পারে তাদের জীবন হয় অর্থবহ। খ্রীষ্টভক্ত হিসেবে আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো অনন্ত জীবন লাভ করা ও স্বর্গে চিরকাল সুখী হওয়া। অনন্তকাল সুখী হওয়ার একমাত্র মাধ্যম হলেন যীশু খ্রীষ্ট। প্রভু যীশুই আমাদের মুক্তির পথ ও জীবনের পূর্ণতা। কারণ তিনিই পথ, সত্য ও জীবন। তাঁর মধ্য দিয়ে গেলে অনন্ত মুক্তির স্বাদ লাভ করা যায় ও পিতা ঈশ্বরের শ্রীমুখ দর্শনে চিরকাল সুখী হওয়া যায়।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- জীবনের অর্থবহ লক্ষ্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা বর্ণনা করতে পারব;
- সব সময় অর্থপূর্ণ জীবনের সন্ধান না পাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- খ্রীষ্টের দেখানো পথই আমাদের পথ, এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারব এবং
- খ্রীষ্টের দেখানো পথে চলব।

অর্থবহ লক্ষ্যের সন্ধানে

সন্তানদের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে পিতামাতা কথা ও ভাষা শিক্ষা দেন, ছড়া বা গান শিক্ষা দেন, বই কিনে দেন, ছবি আঁকতে শেখান, স্কুলে পাঠান। এসব কিছুর পিছনে কারণ কী? আমরাই বা কেন স্কুলে যাই ও পড়াশোনা করি? প্রথম দিকে হয়তো পিতামাতা আমাদেরকে স্কুলে পাঠিয়েছেন, তাই আমরা স্কুলে গিয়েছি। পরে আমরা বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছি? তারই বা কারণ কী? হয়তো আমরা তা করেছি যেন ভালো ফল বা শ্রেণিকক্ষে ভালো স্থান পেতে পারি। এই পর্যায়ে এসে আমরা এখন কীভাবে এই কারণ বিশ্লেষণ করব? কেন আমরা স্কুলে যাই, পড়াশোনা করি, পরীক্ষা দিই এমনকি বিজ্ঞান, বাণিজ্য বা মানবিক শাখা বেছে নেই? এসব বিষয় আমাদের নিজেদেরই চিন্তা করে আবিষ্কার করা দরকার।

আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ নেতা মার্টিন লুথার কিং বলেছেন, যার জীবনের লক্ষ্য নেই, তার বেঁচে থাকার অধিকারও নেই। প্রতিটি মানুষের জীবনে লক্ষ্য থাকা দরকার। সেই লক্ষ্য অনুসারে জীবন পথে এগিয়ে যাওয়া দরকার। যদি লক্ষ্য না থাকে তবে জীবন সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না। আবার জীবনের সঠিক সময়ে সঠিক লক্ষ্যটি নির্ধারণ করতে না পারলে জীবন হয় অর্থহীন। ফলে হতাশা এসে জীবনকে গ্রাস করবে।

তাই জীবনে লক্ষ্য থাকা এবং সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা প্রত্যেকের দরকার। নিজেকে প্রশ্ন করা দরকার, জীবন কী? জীবন কেন? আমি কে? আমি কার জন্য? আমি এখন কী করছি এবং ভবিষ্যতে কী করতে চাই? জীবন যদি সত্য হয়, তবে তার চেয়েও সত্য আর কী আছে? মৃত্যু কী? মৃত্যু কেন আসে? আমি চলে গেলে, পেছনে আমি কী রেখে যাব? মৃত্যুর পরে আমি কোথায় যাব? ইত্যাদি। এসব প্রশ্নের উত্তর যখন স্পষ্টভাবে চোখের সামনে ভেসে উঠবে তখনই সহজ হবে লক্ষ্য নির্ধারণ করে সেই মতো এগিয়ে চলা।

একটি ঘটনা

প্রকাশ সবে মাত্র কলেজ শেষ করেছে। সে খুব ভালো ছাত্র এবং খুব ভালো রেজাল্ট করেছে। জীবন পথের এই সন্ধিক্ষণে এসে সে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে। সে ভাবছে, এখন সে কোন্ দিকে যাবে? কোন্ বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করবে? তার ছোট বেলা থেকে ইচ্ছা ছিল, সে ডাক্তার হবে। অন্যদিকে তার বড় ভাই একজন ইঞ্জিনিয়ার। দাদার পেশাও প্রকাশের ভালো লাগে। সে এখন কী করবে, মনস্থির করতে পারছে না।

একদিন প্রকাশ খেলার মাঠে পায়চারী করছে এমন সময় পিছন থেকে এক ব্যক্তি তার কাঁধে হাত রাখল। ঘাড় ফিরিয়ে প্রকাশ দেখল, তার কলেজের অধ্যক্ষ। সে এই সুযোগটি গ্রহণ করল এবং তার মনের অস্থিরতা অধ্যক্ষকে জানালো। প্রকাশ শিক্ষকের পরামর্শ গ্রহণ করল এবং সেইভাবে কাজ করল। আজ প্রকাশ একটি বড় হাসপাতালের বড় ডাক্তার।

জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য মানুষ সময় ব্যয় করে, যেন যোগ্যতা ও দক্ষতাকে বৃদ্ধি করতে পারে। একইসাথে যেন চরিত্র ও বিবেককে গঠন করতে পারে। চরিত্র ও বিবেকের গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর জন্য জ্ঞানচর্চা এবং সাধনা ও অনুশীলন করতে হয়। লক্ষ্য পূরণের জন্য বা লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য যা ভালো, মানুষ তারই সন্ধান করে, এই সন্ধান করার কাজ যতই কঠিন হোক না কেন। তাই সবাই স্কুলে যায়, পড়াশুনা করে, জ্ঞানচর্চা করে, পরীক্ষা লিখে এবং অজানাকে জানার অনুসন্ধান করে।

এই অনুসন্ধানের পথে মানুষ যখন বাধার সম্মুখীন হয়, তখন যতক্ষণ এই বাধা উত্তরণের একটি সঠিক উত্তর খুঁজে না পায় ততক্ষণ তারা হতাশায় ভেঙে পড়ে। দিশাহারা হয়ে যায়। জীবনের অর্থ হারিয়ে ফেলে। তারা প্রয়োজনে অন্যের কাছে যায় যেন নির্দেশনা পায়। যারা আরও অভিজ্ঞ, যোগ্য, দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ তাদের কাছে যায়। এই যাওয়া হতে পারে পরিবারে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, কিংবা কোনো গুরু বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে। এমনিভাবে জীবনের অর্থবহ লক্ষ্যের সবাই সন্ধান করে।

কাজ: ১. তোমার নিজের আকাঙ্ক্ষা বা লক্ষ্য কী তা লেখ।
কাজ: ২. এমন কী আকাঙ্ক্ষা আছে যা পূরণের মাধ্যমে চিরস্থায়ী সুখ ও আনন্দ পাওয়া যায়?

পূর্ণতার সন্ধানে ব্যর্থতার কারণ

জীবনের অনেক ক্ষেত্রে সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। সকল অনুসন্ধান সার্থক হয় না। সকল সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় না। অনেক সময় ব্যর্থতা এসে সামনে দাঁড়ায়। ফলে লক্ষ্যে পৌঁছানো আর হয় না। ব্যক্তিগত জীবনে কিংবা পারিবারিক জীবনে এমন কি প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা রাষ্ট্রীয় জীবনেও পূর্ণতার সন্ধানে এরূপ ব্যর্থতা নেমে আসে। কোন একটি বিষয়ে যখন সাফল্য খুঁজে পাওয়া যায়, আমরা অনেক আনন্দ করি। মন তৃপ্তিতে ভরে যায়। পরক্ষণেই আরেকটি সাফল্যের চেষ্টা করি।

আবার অনেক সময় আমাদের মুখের হাসি বিলীন হয়ে যায়। চোখে জল নেমে আসে। মন ভালো লাগে না। হতাশা নিরাশা দানা বাঁধে। পূর্ণতার সন্ধান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফলে জীবন নিরর্থক হয়। এই ব্যর্থতার কারণগুলো হয়তো সহজভাবে বোঝা যায় না। কারণগুলো খোঁজার জন্য এই প্রশ্নগুলো করতে পারি: আমাদের জীবনের কি সঠিক লক্ষ্য ছিল? সেই লক্ষ্যমতে আমরা কি চলেছি? আমাদের চরিত্র ও বিবেকের

গঠন কি যথাযথ হয়েছে? আমরা কি বিবেকের কথা শুনে চলেছি? আমরা কি সঠিক সময়ে সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলাম? সর্বোপরি, আমরা কি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করেছিলাম? না কি নিজের শক্তির ওপরই নির্ভর করে চলেছিলাম?

পবিত্র বাইবেলে আমরা দেখি,

যীশু যুবকটিকে বললেন, "যদি পূর্ণতা লাভ করতে চাও, তাহলে এখন যাও; তোমার যা-কিছু আছে, সবই বিক্রি করে দাও; আর সেই টাকাটা গরিবদের দিয়ে দাও; তাহলে স্বর্গে তোমার জন্য প্রচুর মহাসম্পদ সঞ্চিত থাকবে। তারপর আমার কাছে এসো আর আমার সঙ্গে সঙ্গে চল। এই কথা শুনে যুবকটি কেমন যেন বিষণ্ন হয়েই ফিরে গেল; কেন না তার নিজের প্রচুর সম্পত্তি ছিল" (মথি ১৯:২১-২২)। যীশু যাদেরকে পূর্ণতা লাভের জন্য আহ্বান জানান, তাদের কাছ থেকে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ চান। কিন্তু মঙ্গলসমাচারের এই যুবকটির পূর্ণতার পথের বাধা ছিল তার নিজস্ব ধনসম্পদের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ। দ্বিতীয়ত, সমাজে ধনী হিসেবে তার একটা সামাজিক মর্যাদা ছিল। সম্পদ হারালে তার আর সেই মর্যাদা থাকবে না। এই আশংকা তার পথের বাধা হয়ে দাঁড়াল। যুবকটি যীশুর পরামর্শ চাইল ঠিকই, কিন্তু সেই পরামর্শ অনুসারে চলার মানসিকতা তার ছিল না। কাজেই পূর্ণতার পথে বাধা হতে পারে মানুষের স্বার্থপরতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা।

আমরা জানি, স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক মানুষ তার স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নানাবিধ অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। এ ধরনের কাজের ফলে এই লোকদের জীবনে ব্যর্থতা অবশ্যই নেমে আসে। পূর্ণতার সন্ধানে তারা আর বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে না। জীবনের সঠিক দিকনির্দেশনা খুঁজে পায় না।

কাজঃ কোনো আকাঙ্ক্ষা-পূরণ ইতিবাচক সুখের জন্ম দেয় ও কোনো রকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না এবং কোনো আকাঙ্ক্ষা-পূরণ নেতিবাচক সুখ অর্থাৎ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী সুখের জন্ম দেয় তা দুইটি সারণিতে লেখ।

খ্রীষ্টের দেখানো পথ

পূর্ণতা লাভের জন্য খ্রীষ্টের দেখানো পথই হলো সর্বোত্তম।

একবার দুইজন মেয়ের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল। তাদের একজন ছিল গার্মেন্টস কারখানার শ্রমিক ও অন্যজন ছিল কলেজ ছাত্রী। দুইজনকে পৃথকভাবে একই প্রশ্ন করা হয়েছিল। প্রশ্নটি ছিলঃ "ঈশ্বর যে আছেন তুমি কি তা বিশ্বাস কর"? দুইজনই উত্তর দিয়েছিলঃ "হ্যাঁ"। তাদের কাছে দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল "সৃষ্টিকর্তা দেখতে কেমন"? শ্রমিক মেয়েটির মনে তেমন উৎসাহের ভাব ছিল না। সেই মনোভাব নিয়েই সে উত্তর দিল, "আপনি হয়তো আমার উত্তরে সুখী হবেন না, কিন্তু আমি মনে করি ঈশ্বর মানুষকে খেলার সামগ্রী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।" আর কলেজ পড়ুয়া মেয়েটি একটু সময় নিয়ে উত্তর দিলো। সে বলল, "আমার মনে হয় ঈশ্বর খুবই মহৎ, তিনি এই পৃথিবী ও মানুষকে অতি সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন।"

শ্রমিক মেয়েটি ছিল একটি ভগ্ন পরিবারের সন্তান। তার বাবা ও মা আলাদা হয়ে গিয়েছিল। আর কলেজ পড়ুয়া মেয়েটি বড় হয়েছে একটি ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে তার পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব ও শিক্ষকদের ভালোবাসার পরিমণ্ডলে। এই দুইজন মেয়ের দেওয়া উত্তরের মধ্যে পার্থক্যের কারণ কী? এর কারণ হলো, আমরা সবাই আমাদের পারিপার্শ্বিক বাস্তব অবস্থা দ্বারা পরিচালিত। আমরা যে যেই

পরিবার ও পরিবেশে বড় হই, সে সেই পরিস্থিতি দ্বারা গঠিত, পরিচালিত কিংবা সংক্রমিত হই। আমাদের চিন্তা, বুদ্ধি ও দর্শন অনেক সময় সেই পরিবেশের আলোকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এই দুইজন মেয়ের মতো আমরাও কখনো কখনো নিজেদের হতাশার অনুভূতিতে আবার কখনো কখনো সুখের অনুভূতিতে সবকিছু দেখে থাকি। কারণ এই অনুভূতিগুলো আমাদের মধ্যে এতই প্রবল যে, সেগুলো আমাদের চিন্তার সাথে রং মিশিয়ে দিতে পারে এবং দৃষ্টিভঙ্গিও প্রভাবিত করতে পারে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা শুধুমাত্র আমাদের অনুভূতি দ্বারা নিজেদেরকে পরিচালিত হতে দিতে পারি না। কারণ বাস্তব জগতে আমরা দেখি: এমন কোন ব্যবসায়ী নেই যিনি কোন একটি প্রতিষ্ঠানকে শুধু ভালো লাগে বলেই সেই প্রতিষ্ঠানে তার নিজের মূল্যবান টাকাপয়সা বিনিয়োগ করবেন। তেমনিভাবে এমন কোন ডাক্তার নেই যিনি এই মুহূর্তে তার অনুভূতি ভালো আছে বলেই একজন রোগীর দেহে অপারেশন করতে চাইবেন।

সত্যিকার অর্থে আমাদের প্রত্যেককেই বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালিত হতে হয়। শুধু মনের ভাবুকতা আর অনুভূতির দ্বারা আমাদের পরিচালিত হওয়া ঠিক নয়। উপরে উল্লিখিত ব্যবসা-বাণিজ্য, চিকিৎসা বা অন্য কোনো পেশার বেলায় যা প্রযোজ্য অন্যান্য সবকিছুর বেলায়ও সেই একই বিষয় প্রযোজ্য। অর্থাৎ ব্যবসায়ী ও চিকিৎসকের মতো করে আমাদেরও অনুভূতির দ্বারা পরিচালিত না হয়ে বাস্তব অবস্থার ওপর নির্ভর করতে হবে।

আসলে আমরা জীবনে সফল ও সুখী হতে এবং পূর্ণতা লাভ করতে পারবো না, যদি আমরা ঘটনার সত্যতা ও বাস্তবতা খুঁজে না পাই। আমাদের সকল সফলতা ও ব্যর্থতা, উন্নতি ও অবনতি, উজ্জ্বল ও অন্ধকার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে আমাদেরই ওপর। আমরা যে যেভাবে সত্যকে খুঁজি সে সেভাবেই পরিচালিত হই বাস্তবতা ও বিবেকের প্রয়োজনে।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে মনোবিজ্ঞানী কার্ল ইয়ুং বলেছিলেন, "আমি আমার জীবনে যত মানুষের চিকিৎসা করেছি, তাদের মধ্যে একজনকেও খুঁজে পাইনি যার সব সমস্যার গোড়ায় ধর্মীয় সমস্যা ছিল না। ...কাজেই তাদের চিকিৎসাও আমাকে ধর্মীয়ভাবেই করতে হয়েছে।"

এই খ্যাতনামা মনোচিকিৎসক কেন ধর্মকে স্বাস্থ্যলাভের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছেন? কারণটা খুবই স্পষ্ট। প্রতিটি ব্যক্তির জীবনের গভীরতম তলদেশে অবস্থিত যেসব সমস্যা, সেগুলো হচ্ছে তার জীবন, মৃত্যু, তার ভালো ও মন্দ অভিজ্ঞতা, ভালোবাসা ও ঘৃণা, কষ্টভোগ কেন্দ্রিক সমস্যা। এসব সমস্যার অর্থপূর্ণ উত্তর পাওয়া যায় ধর্ম থেকে। মানসিকভাবে সুস্থ থাকার লক্ষ্যে যেসব সমস্যার উৎপত্তি হয় সেগুলোর যথাযথ উত্তর শুধু মনোচিকিৎসাবিদ্যার বেলায় সম্ভব নয়। এসবের উত্তর পাওয়ার জন্য মানুষকে আরও গভীরে প্রবেশ করতে হবে। অর্থাৎ তার অন্তরাত্মায় প্রবেশ করে সেখানে ধর্মীয় দিক থেকে উত্তর সংগ্রহ করতে হবে।

ধর্ম আমাদেরকে একটি বিষয় বোঝার জ্ঞান দিয়ে থাকে যে, আমাদের চারপাশের পরিবর্তনশীল অবস্থাগুলো হচ্ছে বিভিন্ন চিহ্ন। এই চিহ্নগুলো আমাদেরকে 'কেন' এবং 'কীভাবে' প্রশ্নের উত্তর পেতে সাহায্য করে। এগুলো আমাদের কাছে ঈশ্বরের উপস্থিতি আর পরিকল্পনার কথা বলতে চায়।

বিশ্বের আরও একজন খ্যাতনামা মনোবিজ্ঞানীর নাম হলো ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কল। তিনি ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানদের হাতে বন্দি হয়ে নাৎসী কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বহু কষ্টকর জীবন কাটিয়েছিলেন। তাঁর মতে ঐ বন্দি অবস্থা তাঁর জন্য ছিল পৃথিবীতে একটা জীবন্ত নরক। কারণ ওখানে বন্দিদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হতো, তাদেরকে দিনের পর দিন না খাইয়ে রাখা হতো। এভাবে তাদের স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়ে গেলে একদিন তাদেরকে নিয়ে গ্যাসের চুলায় ঢুকিয়ে দেওয়া হতো। সেই জ্বলন্ত চুলার ভিতরেই ঐ অসহায় লোকগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কল্ বলেছেন, ঐ ক্যাম্পে যারা দৈহিকভাবে সুস্থ ছিল তারাই যে এই ভয়ানক যন্ত্রণাময় অবস্থা থেকে রেহাই পেত, তা নয়। বরং যাদের মনে বেঁচে থাকার কোন একটা উদ্দেশ্য থাকত, তারাই বেঁচে থাকতে পারত– সহজে রোগা হতো না আর তাদেরকে চুলার মধ্যে ঢুকিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হতো না। তাঁর এই ধারণা থেকেই তিনি পরবর্তীতে মানসিক চিকিৎসার জন্য একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। এই পদ্ধতিটির নাম ছিল লোগোথেরাপি। এর মাধ্যমে মানসিক সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে সাহায্য করার মাধ্যমে তাদের মানসিক রোগের চিকিৎসা করা হতো। তিনি বলতেন, যদি তোমার জীবনে 'কেন' কথার উত্তর পাও, তবে নিশ্চয়ই 'কীভাবে' প্রশ্নেরও উত্তর খুঁজে পাবে।

সব জীবন ও সত্যের গভীরতম বাস্তবতা ও ভিত্তি হলেন স্বয়ং ঈশ্বর। তিনি আমাদেরকে সাহায্য করতে চান আমরা যেন সবকিছুর বাস্তব অবস্থা খুঁজে বের করতে পারি। তিনি এর জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করছেন। প্রতিদিন আমরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করি আর যা কিছু দেখি সেগুলো শুধু জাগতিক অভিজ্ঞতাই নয়, বরং সেগুলো আমাদেরকে স্বয়ং ঈশ্বরের উপস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সবচেয়ে বড় চিহ্ন হলেন যীশুখ্রীষ্ট যিনি পৃথিবীতে এসে আমাদের কাছে প্রতিদিনকার এসব চিহ্নের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। এভাবে আমাদেরকে তিনি পথ দেখিয়ে ও পরিচালনা করে পিতার কাছে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন।

খ্রীষ্টানুসারী হিসেবে আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্য বিষয়টি হলো এই যে, ঈশ্বর আমাদের প্রেমময় পিতা। আমাদেরকে তিনি আহ্বান করেছেন তাঁর সন্তান হতে। যখন আমরা খাঁটি অন্তরে এই আহ্বানে সাড়া দেই তখন আমরা জীবনের গভীরতম অর্থেরও সন্ধান পেতে পারি। পিতাকে আমরা কীভাবে জানতে পারি? তাঁকে না জেনে তো আমরা তাঁকে ভালোবাসতে পারি না।

ঈশ্বর আমাদের পিতৃপুরুষদের মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে আমাদের কাছে জীবন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সত্য প্রকাশ করেছেন: "প্রাচীনকালে পরমেশ্বর আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে বহুবার বহুরূপে কথা বলেছিলেন প্রবক্তাদের মুখ দিয়ে, কিন্তু শেষ যুগের এই দিনগুলোতে আমাদের কাছে তিনি কথা বললেন আপন পুত্রেরই মুখ দিয়ে, সেই তাঁরই মুখ দিয়ে, যাঁকে তিনি দিয়েছেন নিখিল বিশ্বের ওপর তাঁর আপন অধিকার। তাঁর দ্বারাই তিনি রচনা করেছেন বিশ্বচরাচর" (হিব্রু ১:১-২)।

যীশু বলেন, "আমিই পথ, সত্য ও জীবন" (যোহন ১৪:৬)। আমাদের মনে যত রকমের প্রশ্ন জাগে, সেসবের উত্তর লাভ করে পিতার কাছে যাবার পথ আমাদের দেখান যীশু নিজে। তিনি এর প্রমাণ দিয়েছেন তাঁরই নিজ জীবনে। এই পথ হলো ভালোবাসার পথ, ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবাসার পথ। যীশুখ্রীষ্ট নিজে এই পথ অবলম্বন করেছেন। তিনি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে পুনরুত্থান করেছেন, মানুষ হিসাবে তিনি পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন, পিতার যোগ্য পুত্র হয়েছেন। তাঁকে অনুসরণ করলেই আমরা যেকোন পথের মোড়ে এসে সঠিক পথের দিকনির্দেশনা পেতে পারব। কারণ তিনিই সত্যিকারের পথ ও জীবন।

কাজ ১: জীবনকেন্দ্রিক যেসব প্রশ্নের উত্তর তুমি ধর্ম বিশ্বাস ও শিক্ষা থেকে পাও, সেগুলো তোমার জন্য কতখানি অর্থপূর্ণ হয় তা দলে সহভাগিতা করো।

কাজ ২: একটি ছেলে স্কুল বাদ দিয়ে সিগারেট খায় ও এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করে। তাকে আবার স্কুলে ফিরিয়ে আনার জন্য দলের সকলে মিলে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. যারা লক্ষ্যে পৌছাতে পারে না তাদের জীবন কেমন হয়?

ক. অপূর্ণ খ. সার্থক

গ. বিশৃঙ্খল ঘ. অর্থহীন

২. পূর্ণতার পথে বাধা হতে পারে–

i. স্বার্থপরতা

ii. ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা

iii. দরিদ্রতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

সজল ও রঞ্জন একই গ্রামে পাশাপাশি বসবাস করেন। সজল অবস্থাপন্ন, রঞ্জন তুলনামূলকভাবে অসচ্ছল। সজল জোর করে রঞ্জনের জায়গা দখল করে সেখানে ঘর তৈরি করেছেন। রঞ্জন গ্রামের চেয়ারম্যানের কাছে সুবিচার পাওয়ার জন্য বিচার দিলেন। এদিকে সজল ব্যাপারটা জানতে পেরে চেয়ারম্যানকে খুশি করার জন্য উপহার পাঠালেন। চেয়ারম্যান বিচারে সুকৌশলে সজলের পক্ষে কথা বললেন।

৩. চেয়ারম্যানের আচরণে কী প্রকাশ পায়?

ক. সততা খ. স্বার্থপরতা

গ. দুর্নীতি ঘ. স্বজনপ্রীতি

৪. চেয়ারম্যানের এরূপ আচরণের ফলে সমাজের পরিণতি কী হতে পারে?

i. সম্পর্কের উন্নতি

ii. অরাজকতা

iii. বিশৃঙ্খলা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. লক্ষ্য পূরণের জন্য মানুষ কী করে?

২. খ্রীষ্টভক্ত হিসেবে আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য কী হওয়া উচিত? ব্যাখ্যা করো।

৩. খ্রীষ্টের দেখানো পথই আমাদের পথ—বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।

৪. সবসময় অর্থপূর্ণ জীবনের সন্ধান না পাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো।

৫. তুমি কীভাবে খ্রিষ্টের দেখানো পথে চলবে? লেখ।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সীমা লেখাপড়া করছে। তার বাবা-মায়ের ইচ্ছা মেয়ে ডাক্তার হবে। কিন্তু সীমা লেখাপড়ায় মোটেও মনোযোগী নয়। বাবা-মা তাকে সবসময় বলেন মন দিয়ে লেখাপড়া করতে। ভালো রেজাল্ট করতে হলে এখন থেকেই মনোযোগী হয়ে পরিশ্রম করে পড়তে হবে। কিন্তু সীমা লেখাপড়ার ব্যাপারে একেবারে উদাসীন। ফলে তার রেজাল্টও খুব একটা ভালো হলো না। রেজাল্ট ভালো না হওয়ার কারণে সে মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারল না। এমনকি পরবর্তীতে সে ভালো কোনো প্রতিষ্ঠানেও ভর্তি হতে পারল না।

ক. পূর্ণতা লাভের জন্য কোন পথ সর্বোত্তম?

খ. 'লোগোথেরাপি' বলতে কী বুঝ?

গ. সীমার জীবনের ব্যর্থতার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. জীবনে সফলতা লাভের জন্য সীমাকে কী কী করতে হবে তা বিশ্লেষণ করো।

পরিশিষ্ট

এই পুস্তকে ব্যবহৃত বিভিন্ন ব্যক্তি ও স্থানের নামের প্রতিশব্দ

কাথলিক মণ্ডলীর অনুবাদ	প্রোটেস্ট্যান্ট মণ্ডলীর অনুবাদ	কাথলিকমণ্ডলীর অনুবাদ	প্রোটেস্ট্যান্ট মণ্ডলীর অনুবাদ
এদেন	এদন	যুদা / যুদাস	যিহুদা
লাজার	লাসার	ইহুদি	যিহুদী / যিহুদি
মারীয়া	মরিয়ম	সিলাস	সীল
মাগ্দালিনী	মগ্দলিনী	বার্ণাবাস	বার্ণবা
এথেন্স	আথীনী	জেবেদ	সিবদিয়
নাজারেথ	নাসরৎ	যোসেফ	যোষেফ
খ্রীষ্টপ্রসাদ / খ্রীষ্টযোগ	প্রভুর ভোজ	সামারীয়া	শমরীয়
সংস্কার	সাক্রামেন্ত / সাক্রামেন্ট	দাউদ	দায়ূদ
মঙ্গলসমাচার	সুসমাচার	প্রাবক্তিক বাণী	ভাববাণী
প্রবক্তা	ভাববাদী	উড়	ঊর
বাবিলন	বাবিল	আব্রাহাম	আব্রাহাম
সিলিসিয়া	কিলিকিয়া	সামসংগীত (সাম)	গীতসংহিতা (গীত)
তার্সাস	তার্ষ	ক্ষমা প্রার্থনা	পাপস্বীকার
পল	পৌল	হিসোপ	এসোব
সৌল	শৌল	সমরীয়	শমরীয় / শমরিয়া
গামালীয়েল	গমলীয়েল	নোয়া	নোহ্
স্তেফান	স্তিফান	এফিসীয়/ এফেসীয়	ইফিষীয়
দামাস্কাস	দম্মেশক	সলোমন	শলোমন
আনানিয়াস	অননিয়	এফেসাস	ইফিষ
হিব্রু	ইব্রীয়	যোব	ইয়োব
সাইপ্রাস	কুপ্র	নাবোথ	নাবোত
পামফিলিয়া	পাম্ফুলিয়া	ইকোনিয়াম	ইকনিয়
পিসিদিয়া	পিষিদিয়া	লিস্ত্রা	লুস্ত্রা
লিকাউনিয়া	লুকায়নিয়া	দর্বী	দর্ব্বী
আন্তিয়োক	আন্তিয়খিয়া	ফিলিপ্পী	ফিলিপী
থেসালোনিকা	থিষলনীকী	বেরেয়া	বিরয়া
'বেনা সিরা' রোমান কাথলিক বাইবেলে পুরাতন নিয়মে যে সাতটি বই বেশি আছে তার একটি বই।	প্রোটেস্ট্যান্ট বাইবেলে এই বইটি নেই	সিজারিয়া	কৈসরিয়া
যেরুসালেম	যিরূশালেম	বেঞ্জামিন	বিন্যামীন

সমাপ্ত